সুনাগরিক গঠনে সূরা আল হুজুরাত এর প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোঃ মনিরুজ্জামান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৫৯/২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে ২০১৮

এম.ফিল থিসিস

সুনাগরিক গঠনে সূরা আল হুজুরাত এর প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ মনিরুজ্জামান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৮

সুনাগরিক গঠনে সূরা আল হুজুরাত এর প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোঃ মনিরুজ্জামান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৫৯/২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে ২০১৮

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- গবেষণার পদ্ধতি
- গবেষণা কর্মের পরিধি
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস
- গবেষণার সময়কাল
- সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাতের প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা
- উপসংহার

গবেষণা প্রস্তাবনা (Introduction)

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য যার অপার কৃপায় আমাকে দ্বীনের কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি তাঁর দরবারে শত-কোটি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আল কুরআনকে তাঁর পক্ষ থেকে বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ হিসেবে সর্বশেষ ঐশী বাণীরূপে প্রেরণ করেছেন। এটা মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর এক অসীম ও অফুরন্ত অনুকম্পা। এ মহাগ্রন্থে রয়েছে সঠিক পথের নির্দেশনা। কুরআন সম্বন্ধে মহান আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা, هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ 'বিশ্ব মানবতার দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।'[১] মানবতার জন্য এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই যা এতে আলোচিত হয়নি। এটা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ 'আর আমি কুরআনে কোন কিছুর বর্ণনা উল্লেখ করতে বাদ রাখিনি।'[২] মুসলিম জাতির হৃদয়ের স্পন্দন পবিত্রতম ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন মানব জাতির হিদায়াতের সামগ্রিক পথ প্রদর্শক। এটা একটা বৈচিত্রময় ও অত্যাশ্চর্য ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন মাজিদ বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে অনুপম ও অতুলনীয়। এ কিতাবের মাধুর্যে বিশ্ববিবেক মুগ্ধ। তাই অন্য ধর্মের অনুসারী হয়েও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের উচ্চসিত প্রশংসা বাণী, 'Quran is a glorious testimony go the vanity of God.'[৩] 'কুরআন আল্লাহ তা'আলার অদ্বিতীয়তার এক অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।' এ গ্রন্থের অনুসারী ও ইসলাম ধর্মে অনুপ্রাণিত ও আত্মসমর্পণকারী মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, অনুসন্ধান, শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নিজেদের যোগ্যতম ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ, আল কুরআন তার পথ নির্দেশক। পবিত্র কুরআনে এসেছে, إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ 'এটা তো বিশ্বজগতের জন্য স্মারক গ্রন্থ।'[৪] তাই বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে ইসলাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুসলিম জাতির জীবন ধারা, কর্মপদ্ধতি, আদর্শ, এ জাতির প্রেরণা, কর্মচাঞ্চল্য, ত্যাগ, সাধনা ও সাফল্য 'ইসলাম' শব্দে বিধৃত হয়েছে। 'ইসলাম' শব্দটা তাই গভীর তাৎপর্যবহ, ব্যাপক ব্যঞ্জনাময়।[৫] ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, যাতে মানুষের মানবিক বৃত্তিসমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব কল্যাণের ধর্ম। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও মানব কল্যাণে মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ উন্মেষ ও বিকাশে মুসলিম জাতির অবদান তাই অবিস্বরণীয়। কুরআন

---

১. আল কুরআন, ২ : ১৮৫
২. আল কুরআন, ৬ : ৩৮
৩. ড. মোঃ রহিম উল্যাহ, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : লেকচার পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ১১
৪. আল কুরআন, ৩৮ : ৮৭
৫. ড. এ আর এম আলী হায়দার ও অন্যান্য, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : অক্ষরপত্র প্রকাশনী, ৩য় সং., জুন ২০১৬), পাঠ-১, পৃ. ২

মাজিদ নিজের বক্তব্য মতেই বিজ্ঞানময়। এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। তাই একে وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ 'মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআন'[৬] বলা হয়। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বয়ং এ গ্রন্থের সংরক্ষক। মহান আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে ইরশাদ করেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।'[৭] আল্লাহ আরও বলেছেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَه 'নিশ্চয়ই এ (কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।'[৮] কুরআনের নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনে নিরলস পরিশ্রমকারী অমুসলিম মনীষী, কুরআন গবেষক ড. মরিস বুকাইলির স্বীকারোক্তি, 'কোরআনে এমন একটা বক্তব্যও নাই– যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে।'[৯] মানুষের জীবনের সকল দিকই ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এ ইসলামি জীবনব্যবস্থা আল্লাহপ্রদত্ত ঐশী কিতাবের মূলমন্ত্রে আবদ্ধ। আল কুরআনের আদর্শে ইসলাম সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। সাম্য, ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইসলামের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবতার মুক্তি ও প্রতিষ্ঠাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ইসলাম যতদূর সফলতা লাভ করেছে জগতের অন্য কোন ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা ততদূর সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। কুরআন মাজিদ আল্লাহ তা'আলার শ্বাশত বাণী।

পবিত্র কুরআনে এসেছে, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন।'[১০] ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান হওয়ায় বিশ্ববাসীর জন্য এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয়, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শ্রম, চিকিৎসা, শিক্ষা-দীক্ষা, তাহযিব-তামাদ্দুন প্রভৃতি দিক ও বিভাগের বিবরণ এতে বিধৃত হয়েছে। পরিবার থেকেই প্রতিটা কাজের সূচনা হয় এবং সমাজে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে। মানুষের ব্যক্তি জীবন, পরিবার তথা সমাজ বিনির্মাণ ও পরিচালনার জন্য কুরআনের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষ একাকী জন্ম গ্রহণ করলেও প্রতিটা মানুষকে সমাজেই বসবাস করতে হয়। তাই সমাজ মানুষের অতি প্রয়োজনীয় দিক ও বিষয়।

জীবন নির্বাহ করতে মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এককভাবে যে বিষয় বা কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, সমাজে বসবাসরত মানুষের পারিবারিক সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সম্পর্কের দ্বারা সেটা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। ব্যক্তি, পরিবার তথা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী, পেশা, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে, কিন্তু সকলের আকার-আকৃতি বা চেহারা, চলাফেরা,

---

৬. আল কুরআন, ৩৬ : ২
৭. আল কুরআন, ১৫ : ৯
৮. আল কুরআন, ৭৫ : ১৭
৯. ডঃ মরিস বুকাইলি, অনূ. আখ্‌তার-উল্-আলম, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*(ঢাকা : রংপুর পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮), পৃ. ১২
১০. আল কুরআন, ৩ : ১৯

গতিবিধি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়; কিছুটা প্রভেদ ও ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। তবে শিক্ষা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে মানুষ যদি সমাজে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তবে তাদের মধ্যে মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব বোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। ফলে একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। মূলত সমাজে যে বর্ণ, আকৃতি, পেশা ও স্তরের মানুষ থাকুক না কেন গোটা মানব জাতি আদি পিতা হযরত আদম আ. ও মাতা হযরত হাওয়া আ.-এর উত্তরসূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সে প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জীবন সঙ্গিনী (নারী) সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন (নর-নারী) থেকে বহু নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।'[১১] সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত; সে একাকী বসবাস করতে পারে না। সম্মিলিতভাবে বসবাস করাই তার বৈশিষ্ট্য। সামাজিক বন্ধন ছাড়া মানুষ বড়ই অসহায়। তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পরিবার বা সমাজ ছাড়া মানব জীবনের কল্পনা করা যায় না।[১২] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ط إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যেন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি।'[১৩] পৃথিবীর সকল মানুষের মূল এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে সকলেই পরস্পর ভাই-ভাই সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। এক আদমের সন্তান হিসেবে সকলেই সমান, এক ও অভিন্ন। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো, মনিব-চাকর, প্রভূ-ভৃত্য, আশরাফ-আতরাফ, বাঙালি-অবাঙালি, আরব-আজম প্রভৃতি বর্ণ ও স্তর ভেদে সকলেই মানুষ, এক আদম সন্তান, তারই সুযোগ্য উত্তরসূরী।

মহানবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব। তিনি ছিলেন মানব জাতির সুমহান শিক্ষক, সুনাগরিকের এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপকার। শিশু বয়স থেকে শুরু করে কৈশোর-যৌবন, নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং পরবর্তী সমস্ত জীবন সমগ্র মানব জাতির জন্য এক অনুপম, মোহনীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। একজন সুনাগরিক হিসেবে মানুষের অধিকার দেয়া ও নিজের অধিকার ভোগ করার এক

---

১১. আল কুরআন, ৪ : ১

১২. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮), খ.১৪, পৃ. ১২১

১৩. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। মহানবী সা. প্রদত্ত ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ' যা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কোন লিখিত সংবিধান; তার সুন্দর, গতিশীল ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের এক অতি উজ্জ্বল প্রেরণার উৎস। বস্তুত তার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী। পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসুল সা. বলেছেন, خير الناس قرني বা خير القرون قرني[১৪] 'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হল আমার যুগ বা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল আমার যুগের মানুষ।' সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠা ও সামাজিক বিধানাবলি পালন মানুষের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে জীবন ব্যবস্থায় ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন নেই, সে জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অনুপস্থিত; যেটা আজ বাস্তব প্রমাণিত।

সমাজ ও রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের জীবন তথা নাগরিক জীবনের অন্যতম একটা সংঘ। রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদানগুলোর মধ্যে নাগরিক হচ্ছে তার প্রাণ। রাষ্ট্রের সভ্য হিসেবে এ নাগরিক জীবনের শুরু। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার কল্পনা অবাস্তব। সমাজে বসবাসরত প্রতিটা মানুষ সুনাগরিকের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুই কুরআনের নির্দেশ ও রাসুল সা.-এর আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই ইসলামের দাবি ও সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য। আর সুনাগরিক হচ্ছে একটা জাতির গৌরব। সমাজ জীবনের কল্যাণ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সুনাগরিক একান্ত অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য গুণাবলি যে নাগরিকের মধ্যে বিদ্যমান তাকেই সুনাগরিক বলে। অন্য কথায়, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলা হয়। রাষ্ট্রের কল্যাণে সুনাগরিক একান্ত অপরিহার্য উপাদন। রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন সুনাগরিকের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একটা রাষ্ট্রের প্রতিটা নাগরিকই সুনাগরিক নয়। সাধারণত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে একজন নাগরিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে।

নাগরিকের মধ্যে এ সকল গুণাবলি শুধুমাত্র আইন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মন-মননশীলতা, ঐকান্তিক দায়িত্ববোধের ভিতর দিয়ে এবং সে সকল গুণাবলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। নাগরিকের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠা, অন্য মানুষের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধের স্পৃহা ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন ও রাসুল সা.-এর শিক্ষার মাধ্যমে ত্বরান্বিত হতে পারে। বর্তমান সমাজের সর্বত্র ইসলামের মৌলিক ও সামাজিক বিধানাবলি বাস্তবায়ন নেই। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, সর্বসাধারণের মধ্যে কুরআনের আলোকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার বিধান সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব এবং কুরআনের শিক্ষা থেকে বিমুখ হওয়া। এ প্রেক্ষাপটে সমাজে বসবাসরত সর্বসাধারণের মধ্যে কুরআনের আলোকে নাগরিকদের

---

১৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১), খ.৬, হাদিস নং ৩৩৮৯, পৃ. ২৩১; ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৬, হাদিস নং ৬২৪২, পৃ. ৭৩

সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য ইসলামি বিধানের দিক-নির্দেশনা প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সুরা আল হুজুরাত কুরআনের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য একটা সুরা। যার মধ্যে সুনাগরিক গঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমানে সুনাগরিক গঠনের বিষয়ে আরও সূদূর প্রসারী ও বাস্তবমুখী জোরালো পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক। আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের যেমন অধিকার দান করেছে, তেমনি তাদের নিকট কিছু কিছু কর্তব্য পালনও দাবি করে। বস্তুত নাগরিকবৃন্দকে কর্তব্য সম্পাদনের শর্তে অধিকার ভোগ করতে হয়। সুতরাং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই সচেতন ও কর্তব্য পরায়ণ হতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের প্রতিটা সদস্যের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং তারা পরস্পর পরস্পরের কল্যাণকামী। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, أَلا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তত্ত্বাবধায়ক, তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[১৫] এ প্রেক্ষিতে ইসলামি আদর্শ একজন নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ব্যাপারে কতখানি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তা গবেষণা ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার দাবি রাখে। ইসলাম একটা বিশ্বজনীন ধর্ম; যেটা সর্বজন স্বীকৃত। যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসুল ইসলামের আলোকে সকল রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করেছেন। সুনাগরিক গঠনে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুরা আল হুজুরাতে যে সকল দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার বিশ্লেষণাত্বক বিবরণ তুলে ধরা জরুরি।

আমার জানা মতে, এ বিষয়ে বাংলাদেশে তেমন কোন গবেষণামূলক কাজ কিংবা গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই সুরা হুজুরাতের আলোকে ইসলামের বিধানাবলি সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা, সমাজে তার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে একটা সুখী-সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য শিরোনামে গবেষণাকর্ম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাই **সুনাগরিক গঠনে সূরা আল হুজুরাত এর প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক গবেষণা কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সুরা আল হুজুরাতের আলোকে ইসলামের বিধানাবলি ও সামাজিক বিধি-বিধান সম্পর্কে নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। ভূমিকায় অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর উপর সাধারণ আলোচনা ও অত্র অভিসন্দর্ভের অনুসৃত নীতিমালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সুরা আল হুজুরাত আল কুরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সুরা। কাজেই এ সুরার বিষয়বস্তুর আলোচনা ও আল কুরআনের পরিচয় তুলে ধরার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সে প্রেক্ষিতে আল কুরআনের পরিচয় ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে কুরআনের অর্থ ও পরিভাষা, নামকরণ, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন ও

---

১৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৬), খ.২, হাদিস নং ৮৪৯, পৃ. ১৭৬; ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ), অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৪ হাদিস নং ৪৫৭৩, পৃ. ৩৭৪

হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল এবং বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মরমী আয়াতসমূহ, ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এবং বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and importance of the study)

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেসব উল্লেখযোগ্য কারণে আলোচ্য বিষয়টা গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল :

- বর্তমান সময়ে মানুষ নানাবিধ সামাজিক অনাচারে প্রতিনিয়ত অতিষ্ট, নিস্পেষিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, এ অনাচার থেকে উত্তরণের উপায় উদ্ভাবনে সাধারণ নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা।
- পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে গোটা সমাজব্যবস্থা কলুষিত হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সকলকে সচেতন করা।
- কুরআন মাজিদ মুসলিম তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ একে ভয়ের চোখে দেখে কুরআনের শিক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকছে এবং অজ্ঞতা বশত যারা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তাদের সম্মুখে কুরআনের শিক্ষা সহজ করে উপস্থাপন করা।
- দেশের সকল শিক্ষার্থী ও পাঠক যাতে কুরআনের এ সুরার নির্দেশনাগুলো সহজে বুঝতে পারে এবং একে অন্যকে উৎসাহিত করে নিজেরা সঠিকভাবে যার যার দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিশেষভাবে গোটা জাতিকে উপকৃত করা।
- দেশের সচেতন ও শিক্ষিত সকল মানুষের কাছে সুরা আল হুজুরাতের আহ্বান নতুনভাবে পৌঁছে দিয়ে একটা সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করা এবং সুনাগরিক হিসেবে দেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।
- নাগরিক কর্তৃক ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে না দেখে, দেশ ও জনগণের সেবায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা। নিজের অধিকার ভোগ করার সাথে সাথে অন্যের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকার আহ্বান পৌঁছে দেয়া। দেশ ও জনগণের উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে দেশকে অগ্রগতির পথে আরও বহুদুর এগিয়ে নেয়া।
- সর্বোপরি, মানুষে মানুষে সকল ভেদাভেদ ভুলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলেই ভাই-ভাই হিসেবে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করা। যেন একটা আধুনিক, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ আগামী প্রজন্মের জন্য প্রস্তুত ও বিদ্যমান থাকে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে সুনাগরিক গঠনে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং সুনাগরিক গঠনে পবিত্র কুরআনে কী ধরনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা

হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা এ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হল :

- নাগরিক ও সুনাগরিকের পরিচয় তুলে ধরা।
- সুনাগরিকের গুণাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।
- বাংলাদেশের আইনে সুনাগরিক গঠনের দিক-নির্দেশনাগুলো উপস্থাপন করা।
- ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সুনাগরিক গঠনের দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
- বাংলাদেশে সুনাগরিক গঠনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ তুলে ধরা ও তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা।
- সর্বোপরি সুনাগরিক গঠনে পবিত্র কুরআনের সুরা আল হুজুরাতের প্রভাব আলোচনা করা ও তা থেকে জ্ঞান লাভ করা এ গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণা হল সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়ে থাকে। গবেষণা বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে নতুন কিছুকে সংযোজন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ঠিক রেখে আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে গবেষণার নক্সা তৈরি, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আদর্শ ও যথাযথ সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে।

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি, আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ নির্বাচন করে তার সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন, হাদিস, তাফসির ও ফিকাহ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সরল অনুবাদ আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বাংলা ভাষায় রচিত একটা মৌলিক গবেষণা কর্ম।

গবেষণা কর্মের পরিধি (Scope of Research)

নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রের কোন মূল্য নেই; তা হয় বিরান মরুভূমি। কিন্তু শুধু নাগরিক দিয়ে সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের। বাংলাদেশ নানা ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার নাগরিকের সমন্বয়ে গঠিত একটা রাষ্ট্র। তবে এদেশের বেশির ভাগ মানুষ ধর্মপ্রাণ মুসলিম। তারা কুরআনের অনুশাসন মেনে চলেন; কুরআনকে ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন। এ কুরআনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সুরা রয়েছে সুরা আল হুজুরাত। এ সুরাতে রয়েছে সুনাগরিক গঠনের বেশ কিছু উপাদান। তাই পবিত্র কুরআন, সুরা আল হুজুরাত, বাংলাদেশ, বিশেষ করে সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাতের ভূমিকা গবেষণা পরিধির আওতাভুক্ত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পবিত্র

কুরআনের সুরা আল হুজুরাতের বিধি-বিধান সমাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কিভাবে সুনাগরিক গঠন করা যায় তার উপায় বিশ্লেষণ করে এর প্রায়োগিক সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান এবং এতদবিষয়ে কতিপয় সুপারিশ গবেষণা কর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Sources of Data)

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে– নাগরিক, সমাজ, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, প্রতিবেদন, সাময়িকী, প্রকাশনা, বিবরণী, পুস্তিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ইত্যাদি গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source)

দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে কুরআন, হাদিস, তাফসির, ইসলামি রাষ্ট্র, মানবাধিকার ও নাগরিক বিষয়ক গ্রন্থাদি। এছাড়া আরো রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত রাষ্ট্র ও নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ। বিশেষত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন তাফসির বিষয়ক গ্রন্থাবলী এ গবেষণা কর্মের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণার সময়কাল (Research Time Frame)

এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে প্রায় দুই বছর সময় লেগেছে। এ সময়কালকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, এতদ্সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পবিত্র কুরআনের তাফসির, বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ, রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ যাছাই-বাছাই করে গবেষণা কর্মের মানদণ্ড বজায় রেখে কার্য সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ড্রাফটিং, পুনঃসম্পাদনা এবং চূড়ান্ত প্রুফসহ সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর।

সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাতের প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review)

বাংলাদেশ, বাংলাদেশে মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম, মৌলিক মানবাধিকার, সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাতের প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ের উপর যৎসামান্য প্রকাশিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হল নিম্নরূপ–

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. কর্তৃক প্রণীত, অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক কর্তৃক অনুদিত *তাফসীরে ইবনে কাছীর* (৩য় সংস্করণ ২০১৪), ১০ম খণ্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের ৩৭৩ থেকে ৪০৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সুরা হুজুরাত অংশে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন– আল্লাহর রাসুলের সাথে আচরণের ধরন। কোন পাপাচারী কর্তৃক প্রচারিত বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করে সত্যতা যাচাই করে নেয়া। পরস্পর দ্বন্দ্বরত দুই দলের মাঝে মীমাংসা করে দেয়ার পদ্ধতি। মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত আলোচনা। কাউকে উপহাস করা, দোষারোপ করা, মন্দ নামে ডাকা, অনুমান নির্ভর অহেতুক অপবাদ পরিহার করা, গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান না করা, কারো পশ্চাতে নিন্দা না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সাইয়িদ মাহমুদ আল আলসি রহ. কর্তৃক প্রণীত, *তাফসির রুহুল মা'আনি* (বৈরুত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি, তা.বি.), ২৬তম খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠার এ তাফসির গ্রন্থের ১৩১-১৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সুরা হুজুরাত প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থখানাতে গ্রন্থকার সুরা হুজুরাতের ব্যাখ্যামূলক শব্দগুলোকে অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন* (ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, সং. ১২, ২০১১), ১৯তম খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের ১৫৩-১৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সুরা আল হুজুরাতের তাফসির সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে সুরা আল হুজুরাতের অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও শেষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন* (ঢাকা : আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১০), ২৬তম খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানার মধ্যে ২৬৫ থেকে ৩১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সুরা হুজুরাত অংশে সমাজে বসবাসরত নাগরিকদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মত কিছু সামাজিক বিধি-বিধান চমৎকার রূপে বর্ণিত হয়েছে।

ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী, ডঃ এ.বি.এম. মাহমুদ ও ডঃ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত ৪৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত '*বাংলাদেশের ইতিহাস*' (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১২শ সং., ২০০৬) নামক গ্রন্থখানা তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব (প্রাচীন যুগ), দ্বিতীয় পর্ব (বাংলাদেশে মুসলমান শাসন) ও তৃতীয় পর্ব (আধুনিক যুগ)। প্রথম পর্বের আলোচিত বিষয়গুলো হলো– বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উৎস, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে গুপ্ত শাসন, পাল সাম্রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহ, সেন রাজবংশ ও প্রাচীন বাংলার শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বের আলোচিত বিষয়গুলো হলো– বাংলাদেশে মুসলমান আগমন, খলজি মালিকদের অধীনে বাংলাদেশ, বাংলাদেশে তুর্কি শাসন, বাংলাদেশে বলবনি শাসন, বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহি শাসন, সুলতানি যুগের শাসন ব্যবস্থা, বাংলায় আফগান শাসন, বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠা, মুগল আমলে বাংলা শাসন, বাংলায় পর্তুগিজ জাতি প্রভৃতি। তৃতীয় পর্বের আলোচিত বিষয়গুলো হলো– ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার, দিওয়ানি, দ্বৈত শাসন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, জমিদার ও প্রজা, সংস্কার আন্দোলন, জাতীয়তাবাদের বিকাশ, বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫-১১ ও তৎকালীন রাজনীতি; হিন্দু-মুসলিম প্রতিক্রিয়া ও স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গোত্তরকালে বাংলার রাজনীতি, দেশবিভাগ, বৃটিশ শাসনের প্রভাব ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ইত্যাদি।

সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ* (ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩), ১ম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানায় প্রাচীন বাংলাদেশ, বৌদ্ধপাল আমলে বাংলা, আর্য ভারতীয় সেন আমলে বাংলা এবং বাংলায় ইসলাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

সালাহউদ্দীন, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল বাশার আখন্দ, *মৌলিক মানবাধিকার* (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সং., ২০০৭) ২৭৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থখানা মানবাধিকারের উপর রচিত একটা চমৎকার গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মৌলিক মানবাধিকারের অর্থ, পাশ্চাত্যে অধিকারের ধারণা, অধিকারের সমাজতান্ত্রিক ধারণা, মৌলিক অধিকারের ইসলামি ধারণা, ইসলামে মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টিসমূহ, ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, মুসলিমদের বিশেষ অধিকার ও যিম্মিদের বিশেষ অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. মোঃ আবদুল খালেক, *ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সং., ১৯৯৯) ২১৬ পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ। এ গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ, ইসলামি সমাজের বৈশিষ্ট্য, ইসলামি জীবন বিধান, ইলাহি শারি'আতের সীমারেখা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

শামসুল আলম রচিত *ইসলামী রাষ্ট্র* (ঢাকা : ইফাবা, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৫) নামক ২২৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানায় যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তাহল– ইসলামি রাষ্ট্রসাধক, ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা ও ইসলামি আন্দোলন।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ থেকে তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণার চাহিদা অনুযায়ী নতুনভাবে সুন্দর জ্ঞান-সমৃদ্ধ অভিসন্দর্ভটি প্রণীত করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Study)

গবেষণাকর্মের সুবিধার জন্য **'সুনাগরিক গঠনে সূরা আল হুজুরাত এর প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'** শিরোনামে এ এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায় ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি করে পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোকপাত করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম ও পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় : প্রস্তাবনা : ভূমিকায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রধানতম হলো– গবেষণার গুরুত্ব, এ শিরোনাম নির্ধারণের যৌক্তিকতা, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, গবেষণার সময়কাল নিয়ে আলোচনা, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনার আলোকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চূড়ান্ত প্রয়াস।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নাগরিক ও সুনাগরিকের পরিচিতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়কে চারটা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নাগরিকের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ, প্রজা, নাগরিক ও দেশবাসী, নাগরিক ও বিদেশীদের পার্থক্য, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ও নাগরিকের মর্যাদার ভিন্নতা, দ্বৈত নাগরিক, নাগরিকতার বিলোপ ও নাগরিকের রাষ্ট্রহীনতা এবং বাংলাদেশের নাগরিকতা-

সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুনাগরিকের গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদার বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনুল কারিমের পরিচয় ও নাযিলের ইতিবৃত্ত। এ অধ্যায়ের অধীনে পাঁচটা পরিচ্ছেদ বিন্যাস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আল কুরআনের শব্দগত পরিচয়, আভিধানিক, উৎপত্তিগত ও পারিভাষিক পরিচয়সহ সুরা ও আয়াতের পরিচয়, শানে নুযুল এবং কুরআন অবতরণ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুরআন নাযিলের পূর্বাপর সূত্র, কেন কুরআন নাযিলের প্রয়োজন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমনের পূর্বাবস্থা, বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ও অরাজকতা, তাঁর জন্ম থেকে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পবিত্র কুরআনের কাঠামোগত পরিচয় ও বিষয়বস্তুসহ কুরআনের নামকরণ, অন্যান্য নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আকারে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম পরিচ্ছেদে আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা, অহি নাযিলের বিরতিকাল এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ অহি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে সুরা আল হুজুরাতের পরিচয়, বিষয়বস্তু ও সামাজিক বিধিবিধান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের অধীনে পাঁচটা পরিচ্ছেদ সাজানো হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সুরা আল হুজুরাতের নামকরণ ও সারসংক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুরা আল হুজুরাত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সুরা আল হুজুরাতের আলোকে সামাজিক বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সুরা হুজুরাতের দৃষ্টিতে সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম পরিচ্ছেদে সুরা হুজুরাতে বর্ণিত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ পরিচিতি শিরোনামে। আলোচ্য অধ্যায়কেও পাঁচটা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক পরিচয়ের মধ্যে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভৌগোলিক পরিচয় ও প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের নামকরণসহ বর্তমান পরিচিতি, বাঙালির নৃত্বাত্তিক গঠন, বৈশিষ্ট্য, বাংলা ভাষা ও এর বিবর্তনধারার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেশ ও জনগোষ্ঠীর পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের নামকরণ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাত। এ অধ্যায়ের অধীনে পাঁচটা পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সংবিধানের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিক বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সুনাগরিক গঠনে ব্যক্তিগত করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সুনাগরিক গঠনে সুরা হুজুরাতের প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুনাগরিক গঠন প্রক্রিয়া ও সমগ্র অভিসন্দর্ভের সার-নির্যাস সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপনাসহ মূল আলোচনার ধারাবাহিকতা থেকে লব্ধ জ্ঞানের সারাংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেন সমাজ তথা রাষ্ট্রের সুনাগরিক গঠনে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন-কানুনকে বাস্তবধর্মী করা যায়। এখানে গবেষণার ফলাফলের গুরুত্ব ও পাঠের উপকারিতা এবং পাঠকগণ যে বিষয় দ্বারা উপকৃত হন সে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আলোচনা শেষে প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় স্থানে তথ্য ও উপাত্তের আলোকে উদ্ধৃতি এবং পাদটীকা উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে একটা গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে যা পাঠক, জন-সাধারণ, শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দের জন্য দিক নির্দেশক হিসেবে কাজে আসবে বলে আশা করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাগরিক ও সুনাগরিকের পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : নাগরিকের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুনাগরিকের গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাগরিক ও সুনাগরিকের পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাগরিকের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

মানুষ সামাজিক জীব। নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। বলা হয়ে থাকে– Man can not live alone. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও স্নেহ, প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। রাষ্ট্রে বসবাসরত এ মানুষই নাগরিক নামে পরিচিত। প্রাচীন গ্রিসে এক একটা নগর ছিল এক একটা রাষ্ট্র। গ্রিসের এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি নগর–রাষ্ট্রগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা ছিল সীমিত। নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে যারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত বা রাষ্ট্র পরিচানায় অংশগ্রহণ করত শুধু তাদেরই 'নাগরিক' বলা হত।[১] আধুনিক রাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসকারী এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন এমন সকল সদস্যই নাগরিক। নাগরিকের উত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি বা উদ্ভব হয়েছে। সুনাগরিকের দায়িত্ববোধ, সচেতনতা, বিবেক, আত্মসংযম, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলি রাষ্ট্রকে মহীয়ান করে তোলে। এসব গুণাবলি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশাত্ববোধ ও মানবতাবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং মানুষের মনের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার দূর করে এক সুস্থ মানবিক বোধের উন্মেষ ঘটায়।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সঙ্গ প্রবণ। ভাব বিনিময় ও চাহিদা পূরণে একে অপরের সম্পূরক। সে জন্য মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে আল্লাহর ঘোষণা, إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَلِيْفَةً 'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে এক খলিফা বানাতে চাই।'[২] খিলাফতের মহান দায়িত্ব নিয়ে মানবজাতির আবির্ভাব। সেহেতু সমাজ জীবন ও নগর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তিরই অংশ। তাইতো এরিস্টটল মানুষকে 'রাজনৈতিক জীব' বলেছেন।[৩] নগর রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। এরিস্টটলের মতে, 'Man is by nature a political being; it is his nature to live in a polis where in alone he could attain his highest moral nature.' 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব, একটা রাজনৈতিক পরিবেশে বাস করা তার প্রকৃতি; কেবলমাত্র যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার সর্বোচ্চ নৈতিক বিকাশ ঘটাতে পারে।'[৪] বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এ বিষয়ে সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে। রাষ্ট্র চিন্তার ক্রমবিকাশের সাথে সংজ্ঞারও বিকাশ ঘটেছে। নিচে নাগরিকের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

---

১. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*(ঢাকা : হাসান বুক হাউস, আগষ্ট ১৯৯৯), পৃ. ১৪৯

২. আল কুরআন, ২ : ৩০

৩. এরিস্টটল, অনূ. সরদার ফজলুল করিম, *দ্যা পলিটিক্স*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৩), পৃ. ৩৮

৪. এরিষ্টটল, অনূ. জে এ সিনক্লেয়ার, *দ্যা পলিটিক্স*(লন্ডন : পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৯২), পৃ. ২৮

নাগরিক এর পরিচয়

সংস্কৃত ভাষায় নগরকে 'পুর' বা 'পুরী' এবং নগরের অধিবাসীদেরকে বলা হয় 'পুরবাসী'। এ জন্যই নাগরিক জীবনের অপর নাম 'পৌর জীবন' এবং নাগরিক জীবন সম্পর্কিত বিদ্যার নাম পৌরবিদ্যা। রাষ্ট্র গঠনের ৪টা মৌলিক উপাদানের মধ্যে নাগরিক অন্যতম। নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। নাগরিক বিহীন রাষ্ট্র প্রাণহীন অসার দেহের সমান। অন্য কথায় নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার্থেই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র ও নাগরিক একে অপরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মূলত রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য নাগরিককে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হয়। নাগরিকদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা নির্ভর করে।

আভিধানিক অর্থ : শব্দগত অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলে। নাগরিক শব্দটার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Citizen' এ শব্দটা মূলত ল্যাটিন শব্দ 'Civics' এবং 'Civitas' থেকে উদ্ভূত। এটা নগরের লোক, পৌরবাসী, ভোট দানে অধিকারপ্রাপ্ত, দেশবাসী ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৫] 'Civic' শব্দের আভিধানিক অর্থ নগর, নগরের অধিবাসী বা নাগরিক। আর 'Civitas' হল নগর রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় নাগরিক বলতে রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা, কর প্রদান এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারসমুহ ভোগকারীকে বুঝায়।

আরবিতে বলা হয়, الْمديني : أحد سكان الْمدن। 'নগর বা শহরে বসবাসরত ব্যক্তি।'[৬] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল বলেন, 'A citizen must be an active member of a city state.' অর্থাৎ, শুধুমাত্র তারাই রাষ্ট্রের নাগরিক যারা নগর রাষ্ট্রের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।[৭] সমাজের বাকি সদস্য যেমন– শিশু, বৃদ্ধ, শ্রমিক, ক্রীতদাস যেহেতু সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম তাই তারা নাগরিক নয়। কিন্তু আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় নাগরিকের এ পরিচয় সম্পূর্ণ অচল। বর্তমানে নাগরিক শব্দটা ভিন্ন ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে সকল জনগণের পক্ষে এখন আর প্রত্যক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। আধুনিক রাষ্ট্রে তাই নাগরিক শব্দটার অর্থও ব্যাপক হয়েছে। নাগরিক বা শহুরে হল শহরের কোন অধিবাসী। আল মাওরিদ গ্রন্থে 'নাগরিক' অর্থে বলা হয়েছে,

(١) الْمديني : أحد سكان الْمدن، (٢) الْمواطن : عضو في دولة بالولاية أو بالاختبار، (٣) الْمدني : من ليس بشرطي أو جندي الخ.

বর্তমানে দেশের সকলেই নাগরিক। তবে অনুমোদন সূত্রে নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে ৬ টা পদ্ধতি রয়েছে।[৮]

নাগরিকের পারিভাষিক অর্থ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পথিকৃত এরিস্টটল এর সংজ্ঞা নির্ধারণ কষ্টকর বলেছেন। তবে তিনি বেশ কিছু সংজ্ঞা দিয়েছেন–

---

৫. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড, জুন ২০১৫), পৃ. ২৩৪

৬. ড. মোঃ মোশাররাফ হোসাইন, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : ওয়াল্ডার ওয়ার্ল্ড, এপ্রিল ২০১৬), পৃ. ২৫২

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, সং.৮, ১৯৮৫),পৃ. ৩৮৫-৩৮৬

(ক) বিচারালয়ে যাদের অধিকার আছে এবং আইনগত অভিযোগ আনতে পারে এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে তারা নাগরিক।[৯]

(খ) আইনগত, রাজনৈতিক এবং শাসনগত সামাজিক ক্ষমতার অধিকারই নাগরিকের বৈশিষ্ট্য।[১০] সংজ্ঞানুসারে বাসস্থান, জন্মগত অধিকার, বৈধ অধিকার ভোগে নাগরিক হয় না। এগুলোকে সূচক ধরলে বিদেশী, দাস, নারী, শ্রমজীবি এবং কৃষক সকলেই নাগরিক। কিন্তু এরিস্টটল বলেন, এরা নাগরিক নয়। তিনি আরও বলেন, 'সংবিধান ভেদে নাগরিকের রকমফের হতে পারে। তার মতে কারিগর বা শ্রমজীবি নাগরিক নয়। আবার অপ্রাপ্তবয়স্ক, প্রবীণ এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথার্থ নাগরিক নয়।

(গ) নাগরিক যারা ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে।[১১] বিচারক, জুরি, সাংসদ এবং ভোটার। এরিস্টটলের সময় গ্রিস ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর সমষ্টি। এথেন্স ছিল নগর রাষ্ট্র। অধিকাংশ দাস ছাড়া যারা ছিল সকলেই (town meeting) এর সদস্য ছিল। তারা নগরের রাজনৈতিক কাজে অংশ নিত।

(ঘ) যার কাজের সুবিধা ভোগে আধিকার আছে এমন ব্যক্তিই যথার্থ নাগরিক।[১২]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভ্যাটেল (Vattel) বলেন, 'নাগরিক সে ব্যক্তিগণ যারা কতগুলো কর্তব্য ও দায়িত্বের বন্ধনে রাষ্ট্রের সাথে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রের আনুগত্যের মাধ্যমে এর সুবিধার ক্ষেত্রে সমভাবে অংশীদার।'

অধ্যাপক লাস্কির মতে, 'কোন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকেই নাগরিক বলে।'[১৩]

অধ্যাপক গ্যাটেলের মতে, 'নাগরিক হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজের সদস্য যারা উক্ত সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে এবং সে সমাজ থেকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী হয়।'[১৪]

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছে বর্তমানে এটাকে সর্বোত্তম সংজ্ঞা বলা হয়–

> 'The citizens are members of the political community to which they belong. They are the people who compose the state and who in their associated capacity have established or subjected themselves to the dominion of a government for the protection of their individual as well as their collective rights.'[১৫]

'Citizen' in British English এ বলা হয়েছে–

> 'A Person who is a member of a particular country and who has rights because of being born there or because of being given rights, or a person who lives in a particular town or city.'[১৬]

'Citizen' in Business Dictionary এ বলা হয়েছে–

---

৯. এরিষ্টটল, অনূ. জে এ সিনক্লেয়ার, *দ্যা পলিটিক্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১৩. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

১৪. ড. এ আর এম আলী হায়দার ও অন্যান্য, *ইসলাম শিক্ষা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

১৫. ড. মোঃ মোশাররাফ হোসাইন, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

১৬. www.dictionary.cambridge.org, visited on 13.12.2017

> 'Person who is entitled to enjoy all the legal rights and privileges granted by a state to the people comprising its constituency, and is obligated to obey its laws and to fulfill his or duties as called upon. Also called national. See also domicile and resident.'[১৭]

'Citizen' in Amirican English এ বলা হয়েছে–

'A Person Who was born in a particular country and has certain rights or has been given certain rights because of heaving lived there.'[১৮]

নাগরিকেরা রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা সে জনসমষ্টি যারা সংগঠন করেন এবং সকলে মিলে মিশে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণ করেন অথবা সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেন। সুতরাং নাগরিক হলো–

এক. রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী; দুই. রাষ্ট্রের সাথে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ; তিন. তারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অধিকার ভোগ করেন; চার. তারা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে বাধ্য ও পাঁচ. কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের বশ্যতা স্বীকার করেন। বর্তমানে যে ব্যক্তি একটা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং সে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাকেই নাগরিক বলা হয়। সুতরাং নাগরিকের সংজ্ঞা থেকে চারটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :

(ক) রাষ্ট্রের সদস্য হতে হয়, (খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়, (গ) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয় এবং (ঘ) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে হয়।

নাগরিকের শ্রেণিবিভাগ

প্রাচীনকালে গ্রিক রাষ্ট্রসমূহে জনসংখ্যা ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা– (১) Citizen বা মূল নাগরিক; (২) Metics/Resident Foreigner বিদেশী (নাগরিক নয়) ও (৩) Salve বা দাস (নাগরিক নয়)।[১৯]

প্লেটো যোগ্যতা অনুসারে নাগরিকদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা– (১) শাসক– বিশুদ্ধ অভিভাবক; (২) সৈনিক ও (৩) উৎপাদক-শ্রমজীবি।

এরিষ্টটল নাগরিকদের পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা– (১) জমি কর্ষণকারী; (২) বানাউসিক-উচ্চতর স্বাচ্ছন্দ ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে; (৩) ব্যবসায়ী; (৪) মজুর ও (৫) সৈনিক।[২০]

ইসলামের আলোকে নাগরিক দুই প্রকার। যথা– (১) মুসলিম ও (২) অমুসলিম (যারা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের নিরাপত্তা পাওয়ার বিনিময় স্বরূপ রাষ্ট্রকে জিযিয়া কর দেয়)।[২১]

নগর ও নগর রাষ্ট্র : নগর বা শহর (Urban) বলতে সাধারণত উল্লেখযোগ্য মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের শিল্প এবং বাণিজ্য কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ জনপদকে বুঝিয়ে থাকে। এরূপ জনপদে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট

---

১৭. www.business dictionary.com, visited on 20.01.2018

১৮. www.business dictionary.com, visited on 20.01.2018

১৯. ড. আব্দুল লতিফ মাসুম, *গ্রিক রাষ্ট্রদর্শন*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৬), পৃ. ২০

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২১. এরিস্টটল, অনূ. সরদার ফজলুল করিম, *দ্যা পলিটিক্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যেমন পৌরসভা বা প্রকাশ্য এলাকাগত সত্ত্বা থাকতে হবে।[২২] আধুনিক বিশ্বে নগর-এর ক্ষেত্রে অবস্থানের গুরুত্ব বুঝেছিলেন স্ট্রাকে 'Geography' পুস্তকে পরে প্রতিস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গির পুরোধা জার্মান ভূবিদ কার্ল হ্যাসার্ট ১৯০৭ খ্রি.। নতুন পরিবহণ মাধ্যম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নগরবিন্যাস ব্যাখ্যায় নতুন মাত্রা যোগ করে।[২৩] আধুনিক বিশ্বে 'রাষ্ট্র' বলতে আমরা যা বুঝি বা যাকে 'নগর' বলি প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলো তার কোনটাই ছিল না। বার্কারের ভাষায়, 'The city was not a city.' আল্লাহপাক খিলাফতের উদ্দেশ্যে মানুষ তৈরি করলেও শুরুতে উন্নত সভ্যতা পদ্ধতি ছিল না। বলা হয়, Allah made the village, Man made the town. মক্কা নগরিকে 'উম্মুল কুরা' তথা জনপদসমূহের জননী[২৪] বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ 'আমি এ নগরির শপথ করছি।'[২৫] অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى 'শহরের এক প্রান্ত থেকে একজন লোক দৌড়ে আসল।'[২৬] মূলত নগর বা শহর কখনও সমর্থক কিন্তু শহর অপেক্ষা নগর প্রশাসন ও শিল্প-বাণিজ্যে পূর্ণ।

নাগরিকতার অর্থ (Meaning of Citizenship) : একটা সভ্য রাজনৈতিক সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে তাকেই নাগরিকতা বলে। নাগরিকতা হচ্ছে ব্যক্তির গুণ ও মর্যাদার উপলব্দি এবং বাস্তব প্রয়োগ। মূলত নাগরিকতা হল ব্যক্তির স্ট্যাটাস বা পদমর্যাদা।[২৭]

State of being a citizen of a state, by birth or naturalization. Also called Nationality.[২৮] অধ্যাপক লাস্কির মতে, 'Citizenship is the Contribution of one's instructed Judgment to Public good.' অর্থাৎ, সার্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির লব্ধ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই নাগরিকতা। কেলসন বলেন, 'Citizenship is the status of an individual.' অর্থাৎ নাগরিকতা হচ্ছে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির স্ট্যাটাস বা মর্যাদা।[২৯] 'Citizenship is the status of a person recognized under the custom or law as being a legal member of a sovereign state. A person may have multiple citizenships and a person who does not have citizenship of any state is said to be stateless.'[৩০]

নাগরিক ও প্রজা (Citizen and Subject) : একজন ফরাসি লেখক বলেছেন, রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সকল সদস্য নাগরিক নয়। তাদের মতে, 'নাগরিক' হলেন তিনি, যিনি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য

---

২২. ড. কে মওদুদ এলাহী ও অন্যান্য, *নগর ভূগোল সাম্প্রতিক ধারা*(ঢাকা : ডেল্টা বুকস, ১ম সং., ২০০৫), পৃ. ১৫-১৬; *Mandal R. B. Urban Geography*(New Delhi : Concept Publication, 1990), p. 23

২৩. Sir Patrick Geddes, *Cities in evolution*(London : Williams & Norgate, 1915), p. 125

২৪. আল কুরআন, ৬ : ৯১

২৫. আল কুরআন, ৯০ : ১

২৬. আল কুরআন, ৩৬ : ২০

২৭. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*(ঢাকা : হাসান বুক হাউস, আগস্ট ১৯৯৯), পৃ. ১৪৯

২৮. www.businessdictionary.com, visited on 21.01.2018

২৯. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৩০. www.citizenshipwikipedia.com, visited on 22.02.2018

স্বীকার করেন, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। অপরদিকে 'প্রজা' হল তারা, যারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার এবং সামাজিক অধিকার ভোগ করলেও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না। অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, পাগল এবং ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ হচ্ছে প্রজা। ফ্রান্সে নাগরিক ও প্রজার মধ্যে এ পার্থক্য স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।[৩১]

নাগরিক ও দেশবাসী (Citizen and National) : আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রে যেসব লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন এবং রাষ্ট্রে প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন, তারা হলেন নাগরিক। কিন্তু আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের সকল লোকই রাষ্ট্র প্রদত্ত সব রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন না। রাষ্ট্রে বসবাস করার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে রাষ্ট্রের সাহায্য লাভের অধিকার প্রভৃতি ভোগ করলেও সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত বয়স সীমার কম বয়সের হওয়ায় অনেকেই ভোটদানের অধিকার বা প্রার্থী হওয়ার অধিকার ভোগ করেন না। এদেরকে বলা হয় দেশবাসী।

নাগরিক ও বিদেশী (Citizen & Alien) : একটি রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, লেখাপড়া ও কূটনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কোন ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বসবাস করলে তাকে বিদেশী বলে। বিদেশীরা বসবাসকারী রাষ্ট্রের সামাজিক অধিকার ভোগ করে। কিন্তু রাজনৈতিক সব অধিকার ভোগ করতে পারে না। বসবাসকারী রাষ্ট্র তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দান, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা দান করে থাকে। কিন্তু কোন বিদেশী বসবাসকারী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। যেমন, বাংলাদেশের কোন নাগরিক যদি জাপান বা কুয়েতে কোন কাজ উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে তাহলে বাংলাদেশের ঐ নাগরিক জাপান বা কুয়েতে বিদেশী বলে পরিগণিত হবে।

নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Citizen & Alien) :

- একজন নাগরিক তার নিজ রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা ও রাষ্ট্রের একজন সদস্য। কিন্তু একজন বিদেশী বসবাসকারী রাষ্ট্রের অস্থায়ী বাসিন্দা এবং সে রাষ্ট্রের সদস্য নয়। যেমন, কোন ফরাসি কাজ উপলক্ষে বাংলাদেশে বসবাস করলে সে বাংলাদেশের নাগরিক হবে না। বাংলাদেশে বসবাসকারী সে একজন বিদেশী।
- নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু একজন বিদেশী শুধু বসবাসকারী রাষ্ট্রের আইনকানুন মেনে চলে; কিন্তু আনুগত্য স্বীকার করে না। সে শুধু নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। বাংলাদেশে অনেক বিদেশী বসবাস করেন। তারা বাংলাদেশের আইনকানুন মেনে চলেন। কিন্তু তারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন না। তারা নিজ দেশের প্রতি অনুগত।
- নাগরিক নিজ রাষ্ট্র প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে। কিন্তু একজন বিদেশী শুধুমাত্র সামাজিক অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে। একজন বিদেশী কোন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার উপভোগ করতে পারে না।

---

৩১. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

- একজন নাগরিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য ও নিরাপত্তা দাবি করতে পারে। কিন্তু একজন বিদেশী শুধু বসবাসকারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা ও আশ্রয় লাভ করতে পারে। কোন বাংলাদেশী ইংল্যান্ডে গিয়ে বিপদে পড়লে সে তখন বাংলাদেশের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে।
- বিদেশীদের গতিবিধি ও অধিকার নিয়ন্ত্রিত। প্রয়োজনবোধে যে কোন সরকার রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিদেশীদের উপর বিভিন্ন প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারে।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি : নাগরিকতা অর্জনের স্বাভাবিক পদ্ধতি দুটো, যথা– (১) জন্মসূত্রে এবং (২) অনুমোদন সূত্রে। জন্মসূত্রে এবং অনুমোদন সূত্রে নাগরিকদের মধ্যে সাধারণত কোন প্রকার পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে এ উভয় প্রকার নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। নাগরিকতা অর্জনের প্রকারভেদ নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন : জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটো মূলনীতি রয়েছে। (ক) জন্মনীতি (Jus Sanguinis) (খ) জন্মস্থান নীতি (Jus Soli)।

(ক) জন্মনীতি (Jus Sanguinis) : জন্মনীতি অনুযায়ী সন্তান যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পিতামাতার নাগরিকত্বের দ্বারা সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয়। পিতামাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সন্তানও সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হয়। এ নীতি অনুযায়ী রক্তের সম্বন্ধই নাগরিকতা নির্ধারণ করে থাকে। যেমন, বাংলাদেশী নাগরিক দম্পতির কোন সন্তান জাপানে জন্মগ্রহণ করলেও সে এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশী নাগরিক হবে। চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র এ নীতি অনুসরণ করে।

(খ) জন্মস্থান নীতি (Jus Soli) : এ নীতি অনুসারে জন্মস্থানের ভিত্তিতে সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারণ করা হয়। পিতামাতা যে দেশের নাগরিকই হোক না কেন সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব সে লাভ করবে। জন্মস্থান নীতি অনুসারে পিতামাতার নাগরিকতা অনুযায়ী সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয় না। যেমন, ব্রিটিশ নাগরিকের সন্তান আমেরিকায় অথবা আমেরিকার পতাকাবাহী কোন জাহাজে জন্মগ্রহণ করলে সে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করবে।[৩২]

(২) অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জন (অভিবাসন প্রক্রিয়া) : কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। এসব শর্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রূপ হয়। এ ধরনের নাগরিকতাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা বলা হয়। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে হলে নিম্নলিখিত কতগুলো শর্ত পালন করতে হয়। যেমন– (ক) যে রাষ্ট্রের নাগরিক হতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রে বিবাহ করতে হয়, (খ) দীর্ঘদিন ধরে কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়, (গ) সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হয়। (ঘ) ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয় (ঙ) সরকারি চাকুরি লাভ করতে হয় (চ) বৈধকরণ করতে হয় (ছ) ভাষা জানতে হয় (জ) সচ্চরিত্রবান হতে হয় এবং (ঝ) জমি বা অনুরূপ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা অর্জন করতে হয়। এসব শর্তসাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন করতে

---

৩২. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

পারে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন সহজতর। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন তুলনামূলকভাবে কঠিন। অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে কোন বিদেশীকে উক্ত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ সাপেক্ষ্যে রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হয়। আবেদন অনুমোদন হলে আবেদনকারী ব্যক্তি সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য হয়। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভেদে শর্তের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যা। যেমন– যুক্তরাজ্যে পাঁচ বছর, সুইজারল্যান্ড, মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনায় দুই বছর এবং ফ্রান্সে দশ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করলে উক্ত রাষ্ট্রসমূহ যে কোন আবেদনকারী ব্যক্তিকে তাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে আবেদনকারী ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রবানও হতে হয়।

যুদ্ধের পরিণতিতে এবং চুক্তিবলে নাগরিকতা অর্জন : জন্মসূত্রে ও অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন ব্যতীত অনেক সময় যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও চুক্তির মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন করা যায়। যেমন,

(ক) কোন বিজয়ী রাষ্ট্র বিজিত রাষ্ট্রের কোন অঞ্চল দখল করলে এবং ঐ অঞ্চল রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করলে তখন বিজিত রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ বিজয়ী রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য হবে।

(খ) রাষ্ট্রে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন করা যায়। চুক্তি মুতাবিক কোন রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকা পুনর্বন্টন করা হলে এবং সে এলাকায় জনবসতি থাকলে ঐ অধিবাসীগণের পূর্বে নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হবে এবং নতুন নাগরিকত্ব লাভ করবে। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের নাগরিকতা লাভের নজির কম। তবে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনগণের মধ্যে এরূপ নাগরিকতা অর্জনের স্বাধীনতা (চুক্তি অনুযায়ী) প্রদান করা হয়।

রাজনৈতিক আশ্রয়ের মাধ্যমে নাগরিকতা : মানবিক কারণে রাজনৈতিক আশ্রয়দানের ফলেও অনেকে নাগরিকতা অর্জন করে থাকেন। কোন রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত কিংবা বিতাড়িত বা নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে কেউ অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় লাভ করে। সে আশ্রয় লাভকারী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে।

জন্মসূত্রে ও অনুমোদনসূত্রে নাগরিকের মর্যাদার ভিন্নতা : জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা প্রায় সকল রাষ্ট্রে সমান। উভয় ধরনের নাগরিকগণই সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমানভবে উপভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও আনুগত্য প্রকাশ করে। অবশ্য কোন কোন রাষ্ট্রে এর কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

দ্বি-নাগরিকত্ব বা দ্বৈত নাগরিকতা (Double Citizenship) : নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র শুধু জন্মনীতি অনুসরণ করে, কোন রাষ্ট্র জন্মস্থান-নীতি অনুসরণ করে, কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকে। এ উভয় নীতির প্রচলন থাকায় অনেক সময় দ্বি-নাগরিকত্বের সৃষ্টি হয়। যেমন– ফরাসি দম্পতির কোন সন্তান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী কোন জাহাজে জন্মগ্রহণ করলে জন্মনীতি অনুযায়ী সে ফ্রান্সের নাগরিকত্ব পাবে, কেননা ফ্রান্সে জন্মনীতি অনুসরণ করা হয়। আবার জন্মস্থাননীতি অনুযায়ী সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বও লাভ করবে। কেননা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করা হয়। এভাবে একটা সন্তানের একই সাথে দুই রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বি-নাগরিকত্ব বলে।[৩৩]

---

৩৩. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

নাগরিকতার বিলোপ (Loss of Citizenship) : নাগরিকতা অর্জনের যেমন কতকগুলো শর্ত রয়েছে তেমনি কতকগুলো বিশেষ কারণে নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটতে পারে।[৩৪] কারণসমূহ নিম্নরূপ :

- কোন নাগরিক যদি স্বেচ্ছায় নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাহলে তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লোপ পায়।
- কোন নাগরিক যদি দীর্ঘদিন নিজ রাষ্ট্রে অনুপস্থিত থেকে অন্য কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাহলে রাষ্ট্রে সে ব্যক্তির নাগরিকতার বিলোপ সাধন করতে পারে।
- কোন স্ত্রীলোক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করলে সে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারায় এবং স্বামীর নাগরিকত্ব লাভ করে। অবশ্য কোন বিদেশী নাগরিক জাপানি মহিলা বিবাহ করলে সে ব্যক্তিকে জাপানি নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হয়।
- রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অপরাধ করলে রাষ্ট্র তার নাগরিকত্ব বাতিল করে দিতে পারে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়।
- জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি অনুযায়ী কোন দম্পতির সন্তান দ্বি-নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হলে সে একটা রাষ্ট্রের নাগরিকতা বর্জন বা প্রত্যাহার করলে সে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লোপ পায়।
- গুরুতর অপরাধের জন্য কোন নাগরিককে রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করলে সে ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারায়।
- কোন বিজয়ী রাষ্ট্রে বিজিত রাষ্ট্রের দখলকৃত অঞ্চলের নাগরিকদের নিজ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে গণ্য করলে সে নাগরিকগণের পূর্বের রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের বিলুপ্তি ঘটবে।

নাগরিকের রাষ্ট্রহীনতা (Citizen Statelessness) : কোন ব্যক্তি যদি কোন রাষ্ট্রের নাগরিক না হয় তখন তাকে রাষ্ট্রহীনতা বুঝায়। রাষ্ট্রহীনতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন–

- কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে নিজ রাষ্ট্র থেকে অনুপস্থিত থাকলে এবং সে অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করলে রাষ্ট্রহীনতা ঘটবে।
- কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ না করা পর্যন্ত সময়টাকে রাষ্ট্রহীনতা বলে।
- গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্র যদি কোন নাগরিককে তার নিজ রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করে তবে তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রহীনতা দেখা দিবে।

উপরের আলোচনা এ কথা স্পষ্ট হলো যে, যে ব্যক্তি একটা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে তারাই নাগরিক। ইসলামের দৃষ্টিতে নাগরিক প্রধানত দুই শ্রেণির– মুসলিম নাগরিক ও অমুসলিম নাগরিক।

---

৩৪. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুনাগরিকের গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৯৫১ সালের আইন এবং বাংলাদেশ সংবিধানের নাগরিকত্ব আইনের ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী এ দেশের নাগরিকতা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ সংবিধানের বর্ণিত আইন অনুযায়ী জন্মসূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে, অন্য দেশ থেকে বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে, বিবাহ এবং অনুমোদনসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়।[৩৫] বাংলাদেশের সংবিধানিক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পাক হানাদার বাহিনীর ভয়ে অথবা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য যারা দেশত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিল তারা যদি স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরে আসে তবে তারা বাংলাদেশের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে। কোন রাষ্ট্র থেকে আগমন করে অন্তত পক্ষে একবছর ছয়মাস বাস করে কেউ নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করলে সরকার তাকে নাগরিকত্ব দান করতে পারে। কোন ব্যক্তি, তার পিতামাতা অথবা তার পিতামহ বাংলাদেশের অন্তর্গত কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করলে এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর অন্য কোন রাষ্ট্রের বাসিন্দা না হলে সে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি, তার পিতামাতা অথবা তার পিতামহ ১৯৩৭ সালের ৩১ মার্চ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করলে এবং বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হবে। বাংলাদেশী দম্পতির কোন সন্তান বাংলাদেশের অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে জন্মনীতি অনুযায়ী সে সন্তান বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভ করবে। বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশী কোন মহিলাকে বিবাহ করলে এবং বাংলাদেশে দুই বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সে মহিলা বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করতে পারে এবং রাষ্ট্র তার আবেদন গ্রহণ করলে সে মহিলা বাংলাদেশী নাগরিক বলে বিবেচিত হবে। কোন বিদেশী ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশে সম্পত্তি লাভ করে এবং সে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাহলে তার আবেদনের মাধ্যমে অনুমোদন সূত্রে সে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে। কোন বিদেশী বাংলাদেশে পাঁচ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সে বাংলাদেশ সরকারের নিকট নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করতে পারে। কর্তৃপক্ষ যদি সে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রবান মনে করে তাহলে তাকে নাগরিকত্ব দান করতে পারবে। নিচে সুনাগরিকের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

সুনাগরিকের গুণাবলি

সুনাগরিক একটা জাতির গৌরব। সমাজজীবনের কল্যাণ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সুনাগরিক একান্ত অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অপরিহার্য গুণাবলি যে নাগরিকের মধ্যে আছে তাকেই সুনাগরিক বলা হয়। অনেকে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক হোয়াইট-এর মতে, 'সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা এ তিনটা সুনাগরিকের গুণ।'[৩৬] সি.ডি.

---

৩৫. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

বার্নস-এর মতে, 'নাগরিককে সংবেদনশীল ও বলিষ্ঠ স্বাধীন চিত্তের লোক হতে হবে।' সুনাগরিকের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন লর্ড ব্রাইস। তার মতে, 'সুনাগরিকের তিনটা গুণ থাকা অত্যাবশ্যক, যথা– (১) বুদ্ধি, (২) আত্মসংযম ও (৩) বিবেক।'[৩৭]

(১) বুদ্ধি (Intelligence) : বুদ্ধি সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। বুদ্ধিমান নাগরিক যেকোন রাষ্ট্রের বড় সম্পদ। আধুনিক রাষ্ট্রের জটিল সমস্যাবলি অনুধাবন করে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বুদ্ধিমান নাগরিক অবশ্যই অপরিহার্য। সৎ ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন এবং সুষ্ঠু জনমত গঠন করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান নাগরিক অবশ্যই প্রয়োজন। নাগরিক বুদ্ধিমান না হলে যথাযথ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা নির্ভর করে নাগরিকের বুদ্ধিমত্তার উপর।

(২) আত্মসংযম (Self control) : আত্মসংযম সুনাগরিকের একটি বড় ও মহৎ গুণ। আত্মসংযম ব্যতীত কেউ সুনাগরিক হতে পারে না। এ মহৎ গুণ নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দেয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। কারণ গ্রহণ ও শ্রদ্ধার শিক্ষাই আত্মসংযম। একটা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের অন্য দলের মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনা সহ্য করার মত শিক্ষা ও সংযমবোধ ও শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। জাতীয় নির্বাচনে জয় ও পরাজয়কে মেনে নিয়ে সমবেতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাজ করার মানসিকতা সব রাজনৈতিক দলের থাকতে হবে।

(৩) বিবেক : সুনাগরিকের জাগ্রত আত্মশক্তি হল বিবেক। বিবেক সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। বিবেক অন্যায়কে বর্জন ও ন্যায়কে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়। ভালমন্দ ও উচিত অনুচিতের ধারণা ব্যক্তি তার বিবেক শক্তি দিয়েই বুঝতে পারে। সমাজ ও জাতির কল্যাণ সাধনে বিবেক ব্যক্তিকে উৎসাহ দান করে। বিবেক বোধ ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত করে। দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার জন্য বিবেক নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের জন্ম দেয়। বিবেক পথ প্রদর্শকের ন্যায় ব্যক্তির জীবনকে সত্য, ন্যায়, আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

(৪) অন্যান্য গুণাবলি (Others Qualities) : লর্ড ব্রাইস বর্ণিত তিনটা গুণ ব্যতীত সুনাগরিকের আরও কতকগুলো বিষয় সম্পর্ক মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যেমন– (ক) সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা, (খ) নিজ সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও সংবিধান সম্পর্কে পরিচিতি ও সচেতন থাকা, (গ) উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, (ঘ) দেশের সংস্কৃতি রক্ষা করা, (ঙ) রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, (চ) সময়ানুবর্তী ও নিয়মানুবর্তী হওয়া, (ছ) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা, (জ) সহানুভূতি ও সংবেদনশীল মনের অধিকারী হওয়া, (ঝ) বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতাবোধ থাকা, (ঞ) সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করা এবং (ট) অধিকার ভোগের সাথে সাথে যথাযথ কর্তব্য পালনে তৎপর থাকা ইত্যাদি।

---

৩৭. ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান ও অন্যান্য, *পৌরনীতি*(ঢাকা : নান্দনিক প্রিন্টার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১২৫

সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতাসমূহ : একটা রাষ্ট্রে বিদেশী ব্যতীত সকল সদস্যই নাগরিক কিন্তু সকলেই সুনাগরিক নয়। কতকগুলো প্রতিবন্ধকতা একজন নাগরিককে সুনাগরিক হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, সুনাগরিকতা অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে তিনটা, যথা– (১) নির্লিপ্ততা, (২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও (৩) দলীয় মনোভাব।[৩৮] এছাড়া আরো কতকগুলো অন্তরায় রয়েছে।

(১) নির্লিপ্ততা (Indolence) : নির্লিপ্ততার অর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বের প্রতি ঔদাসীন্য বা উদাসীনতা। নির্লিপ্ততার জন্য ব্যক্তি সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয় এবং নিজেকে রাষ্ট্রের কাজকর্মে অংশগ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। রাজনৈতিক উদাসীনতা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হুমকি স্বরূপ। কারণ স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হচ্ছে নাগরিকের সতর্কতা ও সচেতনতা, শিক্ষার অভাব, অলস স্বভাব। সুতরাং নির্লিপ্ততা নাগরিকের এক ধরনের নৈতিক অপরাধ।

(২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা : ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সুনাগরিকতা অর্জনের পথে বড় বাধাস্বরূপ। একজন স্বার্থপর নাগরিক রাষ্ট্রের বৃহত্তম স্বার্থের জন্য নিজের ক্ষুদ্র-স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে না।

স্বার্থপর নাগরিক লোভের বশবর্তী হয়ে উৎকোচ গ্রহণ করে এবং সমাজে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রশ্রয় দেয়। অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে না দেখে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। এভাবে নিজ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে সমাজজীবনকে কলুষিত করে। স্বার্থপর ব্যক্তি সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক সময় নিজের বিবেক বুদ্ধিকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নাগরিকতাকে বিকৃত করে তোলে।

(৩) দলীয় মনোভাব (Party spirit) : গণতন্ত্রের বিকাশ ও সফলতার জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। কিন্তু দল প্রথা সবসময় ত্রুটিমুক্ত নয়। রাজনৈতিক দল অনেক সময় নেতৃত্বের কোন্দলে অথবা উচ্চাভিলাষের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দলীয় কর্মীগণ জাতীয় স্বার্থ অবহেলা করে নিজ দলীয় স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসসে দলীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দলীয়করণ শুরু করে। ফলে অনেক সময় যোগ্য ব্যক্তিরা বঞ্চিত ও উপেক্ষিত হয়। সুতরাং দলীয় মনোভাব সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

(৪) অর্থনৈতিক অসাম্য (Economic Disparity) : অর্থনৈতিক অসাম্য সুনাগরিকতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক অসাম্য ধনী ও দরিদ্র দুটো শ্রেণির সৃষ্টি করে থাকে। ধনী শ্রেণি কর্তৃক দরিদ্র শ্রেণির শোষণের ফলে শ্রেণিবৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় দরিদ্র শ্রেণি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অর্থনৈতিক অসাম্যের দরুন রাষ্ট্রের সকল শ্রেণির নাগরিক স্বাধীনতার সুফল সমানভাবে ভোগ করতে পারে না।

(৫) অজ্ঞতা (Ignorance) : অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক। অজ্ঞতা বশত নাগরিকগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলি সহজে অনুধাবন করতে পারে না। ফলে নাগরিকগণ তাদের অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি দিয়ে ভালমন্দ বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। অজ্ঞতা একটা জাতির জন্য অভিশাপ স্বরূপ।

---

৩৮. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৮

(৬) **দাম্ভিকতা :** দাম্ভিকতা সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক। দাম্ভিকতা বা অহঙ্কার পতনের মূল। দাম্ভিক ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না। ফলে দুর্দিনে সে কারও সাহায্য পায় না। দাম্ভিক নাগরিক নিজেকেই বড় মনে করে। অন্যদের সে অশ্রদ্ধা ও ঈর্ষা করে। দাম্ভিক ব্যক্তি সর্বদা নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ ধরনের দাম্ভিক ব্যক্তি সমাজের উন্নতি ও প্রগতিকে ব্যাহত করে।

(৭) **আত্মম্ভরিতা (Self Complance) :** আত্মম্ভরিতা সুনাগরিকতা অর্জনের আরেকটা প্রতিবন্ধক। আত্মম্ভরী ব্যক্তিরা আত্মত্যাগ করতে পারে না। আত্মম্ভরিতা নাগরিকের ত্যাগের আদর্শ নষ্ট করে ও ব্যক্তি স্বার্থকে জাগিয়ে তোলে। সে নিজেকে ছাড়া অন্যকে বড় বা মহৎ ভাবতে পারে না।

(৮) **ধর্মান্ধতা (Fanaticism) :** ধর্মান্ধ লোকেরা মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী হতে পারে না। ধর্মান্ধতা জাতীয় অগ্রগতি, উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে। অন্ধ ধর্মভক্তি এক সম্প্রদায়ের লোকের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি চরম অসহিষ্ণু করে তোলে। এর ফলে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে। সুতরাং ধর্মান্ধতা সুনাগরিকতা অর্জনের পথে একটা বড় প্রতিবন্ধক।

(৯) **সাম্প্রদায়িকতা (Communalism) :** সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণ মনোভাবের জন্ম দেয়। এটা সুন্দর ও সৃষ্টিধর্মী চিন্তার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং জাতিকে ধ্বংস ও হতাশায় নিমজ্জিত করে। এটা মানুষের মানবীয় গুণাবলি যেমন– সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়। ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও ভাষার জন্য সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতা সুনাগরিকতা অর্জনের পথে বিরাট বাঁধা। এটা সামাজিক শৃঙ্খলাকে চরমভাবে ব্যাহত করে।

(৯) **আলস্য (Idleness) :** অলসতা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অভিশাপস্বরূপ। যে জাতি অলস তাদের উন্নতি ও কল্যাণ কোনভাবেই সম্ভব নয়। এ ব্যক্তি সুনাগরিক নয়। অলস ব্যক্তি শুধু রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনেই ব্যর্থ হয় না, নিজের অধিকার আদায়েও সামর্থ হয় না। অলস ব্যক্তি রাষ্ট্রের বোঝা স্বরূপ।

সুনাগরিকের অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় : লর্ড ব্রাইস সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার জন্য দুটো পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যথা– (ক) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও (খ) নৈতিক প্রতিকার। এ ছাড়া অনেকে অর্থনৈতিক প্রতিকারের কথাও বলেছেন।[৩৯]

(ক) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা : সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলো দূর করতে হলে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক আইন-কানুনকে বাস্তবধর্মী করতে হবে। এর ফলে জনগণ শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) **সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব :** রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ থাকতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমভাবে প্রতিনিধিত্ব লাভের সুযোগ পেলে সকলেই রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনে উৎসাহবোধ করবে।

(২) **বাধ্যতামূলক ভোট দান :** নাগরিকদের বাধ্যতামূলকভাবে ভোটদানের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বাধ্যতামূলক ভোটদান নাগরিকদের উদাসীনতা দূর এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

---

৩৯. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

(৩) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পদ্ধতি : গণ উদ্যোগ, গণভোট ও পদচ্যুতির মত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তন করলে নাগরিকগণ সরাসরি আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

(খ) নৈতিক প্রতিকার : সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য নাগরিক চরিত্রের নৈতিক মান বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নত নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমেই নাগরিকগণ দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারে। নাগরিকদের নৈতিক চরিত্র উন্নত না হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল সম্ভব নয়। নৈতিক প্রতিকারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(১) শিক্ষা : শিক্ষা মানুষের অজ্ঞতা দূর করে। শিক্ষা নাগরিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে সাহায্য করে। সুশিক্ষা মানুষের মনের সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং অলসতা ও উদাসীনতা দূর করে। শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও কর্মে গতিশীলতা দান করে। তাই সুনাগরিকতা অর্জনের জন্য সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(২) ধর্মচর্চা : ধর্ম মানুষের নৈতিক গুণাবলি জাগ্রত ও সুদৃঢ় করে। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে সততা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতা, সংযম ও সহমর্মিতা শিক্ষা দেয়। ধর্ম মানুষকে অন্যায় ও সমাজ বিরোধী কাজ করা থেকে বিরত রাখে। ধর্মের শিক্ষায় মানুষ সুনাগরিক হয়ে উঠে।

(গ) অর্থনৈতিক প্রতিকার : অর্থনৈতিক সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। নাগরিকগণ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল না হলে রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করে না। প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা চালু, ব্যাপক কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি, ও নিরাপত্তামূলক কার্যাবলির মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করতে পারে। সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকগণ তাদের কর্তব্য পালনে উৎসাহী হবে। সুতরাং এটা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে নাগরিকগণকে সাহায্য করে। কুরআন মাজিদ এবং হাদিসে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নাগরিকগণকে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যাকাত, উশর, জিযিয়া, খারাজ, ফাই ও গনিমত ছাড়াও আছে সাদাকাতুল ফিতর এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত আয়ের অন্যান্য ব্যবস্থা। যার প্রকৃত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিক তথা রাষ্ট্রের গতি প্রকৃতি ও উন্নতি নির্ভর করে। নৈতিক চরিত্রে বলিয়ান না হলে নাগরিকগণ যেমন কর দিতে উৎসাহী হবে না তেমনি সঠিক হিসেবে কর প্রদান না করলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।

বস্তুত নাগরিকগণকে আগে কুরআনের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তবেই কাঙ্খিত ফলাফল আশা করা যাবে, নতুবা আশা করা যাবে না। আর আলোচ্য সুরা আল হুজুরাতে অনুরূপ সামাজিক বিধি-বিধান পালনে বারবার নির্দেশনা ও নৈতিক চরিত্রে বলিয়ান হয়ে সুনাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে।[৪০]

৪০. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

নাগরিকের অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণত ব্যক্তির ইচ্ছামত কোন কাজ করার ক্ষমতাকে অধিকার বলে। এ অর্থে অধিকার হচ্ছে যথেচ্ছাচার। কিন্তু এরূপ যথেচ্ছাচারকে অধিকার বলে না। প্রকৃত অর্থে অধিকার বলতে বুঝায় সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। অধিকার ব্যতীত ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাই অধিকার। এ অধিকার সমাজের সকলের জন্য। সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের পারস্পরিক স্বীকৃত দাবিই অধিকার। সমাজজীবন থেকে অধিকারের উদ্ভব হয়। সুতরাং সমাজেই অধিকারের জন্ম এবং সমাজই এর রক্ষক। এজন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন যে, 'অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অধিকার সমাজভিত্তিক।' তিনি আরও বলেন, 'অধিকার হচ্ছে সমাজজীবনের সে সকল শর্তাবলি যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না।' 'Rights are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best.'[৪১]

টি.এইচ. গ্রিন বলেছেন, 'অধিকার হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে।'[৪২] 'The Outer conditions essential for man's inner development.' স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তন এবং সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে অধিকারের সংজ্ঞারও পরিবর্তন হচ্ছে। আদিম যুগে মানুষের একমাত্র অধিকার ছিল বেঁচে থাকার অধিকার। বর্তমানে জীবন ও সম্পত্তি ভোগ করা ছাড়াও মানুষের জীবন সুন্দর, সার্থক, উন্নত ও কল্যাণকামী করার জন্য বহুবিধ অধিকার রয়েছে। সুতরাং অধিকার হচ্ছে এমন কতকগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা যা সকলের জন্য আবশ্যক। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। অধিকার ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের ধারণা মানুষের সামাজিক চেতনাবোধ থেকে উদ্ভূত। সমাজেই এর সৃষ্টি এবং সমাজেই এর বিকাশ ঘটে থাকে। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে অধিকারও পরিবর্তিত হয়। অধিকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। অধিকার ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়। অধিকার নাগরিক ও নৈতিক গুণাবলিকে জাগ্রত করে। নিচে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করা হল :

নাগরিকের অধিকারসমূহ

নাগরিকের অধিকারকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) নৈতিক অধিকার ও (২) আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) সামাজিক অধিকার, (খ) রাজনৈতিক অধিকার ও (গ) অর্থনৈতিক অধিকার। নিম্নে অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হল :[৪৩]

---

৪১. ড. আবদুল লতিফ মাসুম, *পৌরনীতি ও সুশাসন*(ঢাকা : সোনালী সোপান, মার্চ ২০১৬), পৃ. ১৩১

৪২. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

(১) নৈতিক অধিকার (Moral Rights) : নৈতিক অধিকার বলতে সে সব অধিকারকে বুঝায় যা নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। সমাজের নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে নৈতিক অধিকারের উদ্ভব। যেমন– দরিদ্রের সাহায্য পাওয়ার অধিকার, দুঃস্থের সাহায্য পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি। নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত নয়। এ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন রয়েছে। কোন ব্যক্তি এ অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজে তার তীব্র সমালোচনা হতে পারে। সার্থক ও সুন্দর সামাজিক জীবনের জন্য নৈতিক অধিকার অত্যাবশ্যক। নৈতিক অধিকার ব্যক্তি ও সমাজভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

(২) আইনগত অধিকার (Legal Rights) : আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সে অধিকারকে বুঝায় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। আইনগত অধিকারের পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব। আইনগত অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যায়। যেমন– জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চাকুরির অধিকার ইত্যাদি আইনগত অধিকারের পর্যায়ভূক্ত। আইনগত অধিকারের উৎস হচ্ছে রাষ্ট্র। আইনগত অধিকারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন– (ক) সামাজিক অধিকার (Civil Rights) (খ) রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) ও (গ) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) । এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

(ক) সামাজিক অধিকার (Civil Right) : যে সকল অধিকার নাগরিকের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য তাকেই সামাজিক অধিকার বলে। জীবনধারনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি সামাজিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত।

(খ) রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) : নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকে তাকেই রাজনৈতিক অধিকার বলে। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

(গ) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) : যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করে তাকেই অর্থনৈতিক অধিকার বলে। অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ হচ্ছে কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার ইত্যাদি। অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত না হলে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

(ঘ) সাংস্কৃতিক অধিকার (Cultural Rights) : সংস্কৃতি হচ্ছে নাগরিকের আত্মপরিচয়ের বাহন। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নাগরিক তার ইচ্ছা ও অভিব্যক্তিকে অপরের নিকট প্রকাশ করে। নাগরিকের ব্যক্তিসত্তা ও জাতীয় সত্তাকে তুলে ধরতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের সংস্কৃতি চর্চার অধিকার থাকা উচিত।

(ঙ) ধর্মীয় অধিকার (Religions Rights) : ধর্মীয় অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছামত ধর্মমত গ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ও ধর্মীয় মতামত প্রকাশ সংক্রান্ত অধিকার বুঝায়। নাগরিকের

ধর্মীয় অধিকারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেন কারও ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ বা আঘাত করতে না পারে তা দেখা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(চ) **ব্যক্তিগত অধিকার (Personal Rights) :** ব্যক্তিগত অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সুযোগ-সুবিধাকে বুঝায়। বাক-স্বাধীনতার অধিকার, চলাফেরার অধিকার, পরিবার সংগঠনের অধিকার, খ্যাতি লাভের অধিকার ইত্যাদি হচ্ছে ব্যক্তিগত অধিকার। ব্যক্তিগত অধিকার ব্যতীত কোন নাগরিক তার নিজ সত্তাকে বিকশিত করতে পারে না।

নাগরিকের সামাজিক অধিকারসমুহ (Civil Rights of a Citizen) : সুসভ্য সমাজজীবন গড়ে তোলার জন্য আধুনিক বিশ্বের প্রায় প্রতিটা রাষ্ট্রই নাগরিকের জন্য কতকগুলো সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ করে।[৪৪] নিম্নে এসব সামাজিক অধিকারের বর্ণনা দেয়া হল :

(১) **জীবন ধারণের অধিকার :** জীবনধারণের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। স্বদেশ অথবা বিদেশে ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। কাউকে হত্যা করা বা আত্মহত্যার চেষ্টা করা দণ্ডনীয় অপরাধ। জীবনকে নিরাপদ করতে না পারলে সমস্ত অধিকারই মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

(২) **ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (Right to I. Liberty) :** ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের অর্থ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের অধিকার। এজন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কোন প্রকার দমনমূলক ও স্বেচ্ছাচারী নীতি দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেফতার বা বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা যাবে না। আইনের অনুশাসন ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের রক্ষাকবচ।

(৩) **চলাফেরার অধিকার (Right to Movement) :** রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে চলাফেরার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। তবে জরুরি অবস্থায়, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও যুদ্ধকালীন সময় ব্যক্তিগত গতিবিধির আংশিক বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

(৪) **সম্পত্তি ভোগের অধিকার (Right to property) :** সম্পত্তির অধিকার বলতে আইনগতভাবে সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকারকে বুঝায়। ব্যক্তি মালিকানা যদি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় তবে রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেকে যেন তাদের সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা গহণ করা।

(৫) **চুক্তি করার অধিকার (Right to Contract) :** ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা বিষয়-সম্পত্তির হস্তান্তর ইত্যাদি ব্যাপারে নাগরিকদের পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতাকে চুক্তি করার অধিকার বুঝায়। রাষ্ট্রবিরোধী নয় এরূপ যেকোন চুক্তিতে রাষ্ট্রের বাধা দেয়া উচিত নয়। চুক্তির গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৬) **মতামত প্রকাশের অধিকার :** মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার। ব্যক্তি যদি স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল মত প্রকাশের অধিকার। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মত

---

৪৪. ড. আবদুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩

প্রকাশের অধিকার এবং ধ্বংসাত্মক ও অরুচিকর চিন্তা ও মতামত প্রকাশের অধিকার কোন নাগরিকের নেই। যুদ্ধ বা জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র ব্যক্তির মত প্রকাশের অধিকার সংকুচিত বা খর্ব করতে পারে।

(৭) **সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার :** সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার বলতে বুঝায় স্বাধীন, নির্ভীক ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত খবরাখবর প্রকাশের স্বাধীনতাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকে। সরকার রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ও কর্মসূচি সংবাদপত্রে প্রকাশ করে। জনগণকে রাষ্ট্রের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুস্থ জনমত গঠনে সাহায্য করে। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সংবাপত্রের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক।

(৮) **আইনের চোখে সমানাধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইনের চোখে সমানাধিকার নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। আইনের চোখে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পদ ও মর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই সমান।

(৯) **ধর্ম সংক্রান্ত অধিকার (Right to Religion) :** এ অধিকার দ্বারা ব্যক্তি যে কোন ধর্ম গ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, ধর্মীয় মতামত প্রচার, ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি প্রকাশ ও বিতরণ করতে পারে। ধর্ম নাগরিকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় এবং গ্রহণযোগ্যও নয়।

(১০) **জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষালাভের অধিকার :** স্বাস্থ্য ও শিক্ষালাভের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। সরকারের প্রধান কর্তব্য প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য রক্ষা করা। কেননা স্বাস্থ্যবান ও সুস্থ নাগরিক জাতির সম্পদ। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতির অর্থ আলোকিত ও সমৃদ্ধ জাতি। এ কারণে রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকের জন্য গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি দেয়া।

(১১) **পরিবার গঠনের অধিকার (Right to Organise Family) :** পরিবার গঠনের অধিকার নাগরিকের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। পরিবার গঠনের অধিকার বলতে বিবাহের অধিকার, সন্তান ধারণের অধিকার, উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের অধিকার ইত্যাদি বুঝায়।

(১২) **ভাষা ও কৃষ্টি সংরক্ষণের অধিকার :** ভাষা ও কৃষ্টি একটা জাতির আত্মোপলব্ধির বাহন। একটা রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী, সাহিত্য ও কৃষ্টির অধিকারী শ্রেণি বা সম্প্রদায় থাকতে পারে। রাষ্ট্রের উচিত প্রত্যেক শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার অধিকার প্রদান করা।

নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ (Political Rights of a Citizen) : রাজনৈতিক অধিকার গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। এজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের কতগুলো রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। এ সব অধিকার দ্বারা নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। নাগরিকের এ অধিকারগুলো নিচে আলোচনা করা হল :

(১) **বসবাস করার অধিকার :** যে কোন নাগরিক রাষ্ট্রের যে কোন এলাকায় বসাবাস করতে পারে। তবে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকার এ অধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(২) **ভোটের অধিকার (Right to Vote) :** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ভোটদানের অধিকার নাগরিকের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদানের অধিকার রয়েছে। ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিকগণ যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করে। এ অধিকার প্রয়োগ করে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

(৩) **নির্বাচিত হওয়ার অধিকার (Right to be Elected) :** নির্বাচিত হওয়ার অধিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিক আইন মুতাবিক নাগরিকদের নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হলে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হয়।

(৪) **সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার :** যোগ্যতানুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রভেদে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করা উচিত নয়।

(৫) **আবেদন করার অধিকার :** এ অধিকারের ভিত্তিতে যে কোন নাগরিক তার অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে এবং প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

(৬) **বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার :** এ অধিকার বলে বিদেশে অবস্থানকালে কোন নাগরিক কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে সে তার নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য দাবি করতে পারে।

(৭) **সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার (Right to Government) :** প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি কার্যকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। সরকার যদি জনস্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করে তা সমালোচনা করার অধিকার নাগরিকের রয়েছে।

নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার[৪৫] **(Economic Right of a Citizen) :** সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সাথে সাথে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক অধিকার প্রবর্তন করা হয়েছে :

(১) **কর্মের অধিকার (Right to Work) :** প্রত্যেক নাগরিকের কর্মের অধিকার রয়েছে। অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থান লাভের অধিকার, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে।

(২) **ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার (Right to Reasonable Wages) :** শ্রমিকদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার রয়েছে। শ্রমের মান, পরিমাণ ও প্রয়োজনবোধে সবকিছুর উপর ভিত্তি করে শ্রমের যথার্থ মূল্য পাওয়ার অধিকার নাগরিকের রয়েছে।

(৩) **অবকাশ লাভের অধিকার (Right to Rest) :** অবকাশ লাভের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার। কর্মক্লান্তি দূর করে পুনরায় কর্মশক্তি অর্জনের জন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম বা অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

(৪) **শিল্প কল-কারখানা পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার :** এ অধিকার বলতে বুঝায় শিল্প কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারী প্রতিনিধিদের দ্বারা শিল্প কল-কারখানা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

---

৪৫. ড. আবদুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

সংক্রান্ত অধিকার। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাধারণত শ্রমিকদের এ অধিকার নেই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কল-কারখানা শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

(৫) শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার (Right to Form Rrade Union) : শ্রমিকদের কর্মের নিরাপত্তা ও ন্যায্য মজুরি লাভ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শ্রমিক সংঘ গঠন করার অধিকার প্রদান করতে হবে। সকল আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক সংঘঠনের অধিকার রয়েছে।

নৈতিক ও আইনগত অধিকারের সম্পর্ক : নৈতিক অধিকারের উৎস হচ্ছে নীতিবোধ ও বিবেক বুদ্ধি। আইনগত অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত। আইনগত অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র অপরাধীকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র কোন প্রকার শাস্তি দিতে পারে না। এটা ভঙ্গ করলে সমাজে এর তীব্র সমালোচনা হতে পারে। নৈতিক ও আইনগত অধিকার পৃথক হলেও উৎস ও তাৎপর্যের দিক থেকে অভিন্ন নাগরিকের সমস্ত ধারণাটা সামাজিক ধারণা থেকে উদ্ভূত। সকল অধিকারই নৈতিক ও আইনগত শর্ত দ্বারা পুষ্ট।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক : সুসভ্য জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেক নাগরিক কতগুলো সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকে। অপরদিকে রাজনৈতিক অধিকার হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শাসন কাজে অংশগ্রহণ করার অধিকার। সামাজিক অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র নাগরিকের জন্য কতগুলো রাজনৈতিক অধিকার প্রবর্তন করে থাকে। উভয় অধিকারই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত। উভয় প্রকার অধিকার ভঙ্গকারীকেই রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে। বাক-স্বাধীনতার অধিকার, সংগঠন করার অধিকার একদিকে যেমন সামাজিক, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক। নাগরিকের সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক অধিকারকে উপভোগ ও অর্থপূর্ণ করতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পরস্পর পরিপূরক হিসেবে সার্থক নাগরিক জীবন গড়ে তোলে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উভয়ই সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও বলবৎকৃত।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক : অভাব, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্তি এবং ভালভাবে খেয়েপরে বাঁচার অধিকার ও কর্মনিয়োগ ও ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। অপর দিকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রে বসবাস করার অধিকার, সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার হল রাজনৈতিক অধিকার। 'রবসন' এজন্যই বলেছেন যে, 'গণতন্ত্র বলতে নূন্যতম মৌলিক আর্থিক কল্যাণকে বুঝায়; কারণ অভুক্ত, গৃহহীন, রোগাক্রান্ত ও বস্ত্রহীনদের নিকট রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন।' আর্থিক সচ্ছলতা মানুষকে রাজনৈতিক অধিকার ভোগে তথা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। আবার রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্টিত না হলে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয় না। সুতরাং উভয় অধিকার পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক : কোন ব্যক্তির স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করাকে ধর্মীয় অধিকার বলে। পৃথিবীতে প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ধর্ম পালনের অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্র ও সরকার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও অধিকারকে নিশ্চিত করে। ধর্মীয় অধিকার অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকারের

উৎসে পরিণত হয়। অনেক দেশেই ধর্মীয় বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রাজনৈতিক অধিকার সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উভয় প্রকার অধিকারের মধ্যে সূক্ষ্ম ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

অধিকারের রক্ষাকবচ (Safeguard of Rights) : বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সুসভ্য সমাজ জীবনের জন্য অধিকার অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রই নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রবর্তন ও তা সংরক্ষণ করে থাকে। গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের শর্তগুলোকে 'অধিকারের রক্ষাকবচ' বলে। এগুলো নিম্নরূপ :

(১) আইন : আইন হচ্ছে অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে অধিকার নিশ্চিত হয়। আইন হচ্ছে অধিকার ভোগের আবশ্যকীয় শর্ত বা রক্ষাকবচ।[৪৬]

(২) গণতন্ত্র : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকগণ নিজেরাই তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়।

(৩) সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা : নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রাষ্ট্রের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে তা সংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

(৪) আইনের অনুশাসন : নাগরিক অধিকার নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে হলে যথার্থ আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের চোখে ধনী, দরিদ্র, বর্ণ, গোত্র সবাই সমান। আইনের শাসন বলবৎ থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারমূলহ গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারে না।

(৫) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : নাগরিক অধিকার রক্ষা করতে হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ। স্বাধীন বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

(৬) জনগণের সজাগ দৃষ্টি : জনগণের সজাগ দৃষ্টি নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। প্রত্যেক নাগরিককে নিজের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হলে কোন শক্তিই নাগরিকের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে, 'জনগণের সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টিই স্বাধীনতা বা অধিকারের সতর্ক প্রহরী।'

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of Citizens)

রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কোন কিছু করার দায়িত্বকে বুঝায়, যেমন– আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা, সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত। অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত রয়েছে। এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ : কর্তব্য দুই প্রকার। (ক) নৈতিক কর্তব্য ও (খ) আইনগত কর্তব্য।[৪৭]

(ক) নৈতিক কর্তব্য : ব্যক্তি ও সমাজের নীতিবোধ থেকে যে কর্তব্য জন্ম নেয় এবং যা নাগরিক স্বেচ্ছায় পালন করে থাকে তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন– ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া, দরিদ্রকে সাহায্য করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, দুর্যোগ মুকাবিলার জন্য রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করা ইত্যাদি।

---

৪৬. ড. আবদুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

(খ) আইনগত কর্তব্য : যে কর্তব্য রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত এবং রাষ্ট্রিয় আইন দ্বারা কার্যকরী করা হয় তাকে আইনগত কর্তব্য বলে। আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য এবং নাগরিকের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক। নিয়মিত কর দেয়া, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, সততার সাথে ভোট প্রদান করা ইত্যাদি হল আইনগত কর্তব্য। আইনগত কর্তব্যকে আবার বেশ কয়েকটা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন– সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তব্য। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) সামাজিক কর্তব্য : মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজেই জন্মগ্রহণ করে, সমাজেই লালিত-পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যু বরণ করে। সমাজ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য মানুষের তাই কর্তব্যও রয়েছে। সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা, সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা একজন নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব।

(২) রাজনৈতিক কর্তব্য : মানুষ শুধু সামাজিক জীবই নয়, সে রাজনৈতিক জীবও। তাই মানুষের রয়েছে বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্তব্য। এগুলো হল– রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্রপ্রণীত আইন মেনে চলা, সততা ও সতর্কতার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের ডাকে সাড়া দেয়া এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা প্রভৃতি।

(৩) অর্থনৈতিক কর্তব্য : নাগরিকের বেশকিছু অর্থনৈতিক দায়িত্বও রয়েছে। কর্মক্ষম সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা, নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান করা প্রভৃতি হল একজন নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য।

নৈতিক কর্তব্য ও আইনগত কর্তব্যের সম্বন্ধ : নৈতিক কর্তব্য ব্যক্তি ও সমাজের নীতিবোধের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তি নৈতিক কর্তব্য পালন না করলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারে না। তবে এজন্য তাকে সামাজিক ভর্ৎসনা ও সমাজ কর্তৃক নিন্দনীয় হতে হয়। যেমন– বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতাকে প্রতিপালন করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য। দেশ ভেদে আইনগত কর্তব্য ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভোটদান আইনগত কর্তব্য হলেও অধিকাংশ রাষ্ট্রে এটা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়। কোন আইন যদি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারের পরিপন্থী হয় তাহলে নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে উক্ত আইনের বিরোধিতা করা।

প্রত্যেক নাগরিককে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কতগুলো কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিক জীবন সংহত ও উন্নত হয়। অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের যেমন সচেতন থাকতে হবে তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। নিচে নাগরিকদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :[৪৮]

(১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য : রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সকল নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উপর নাগরিকের অধিকার নির্ভরশীল।

---

৪৮. ড. আবদুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

এজন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

(২) **আইন মান্য করা :** রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন তৈরি হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নততর সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য। আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আইন শুধু নিজে মানলেই চলবেনা অন্যেরাও যাতে আইন মেনে চলে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৩) **সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা :** ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সততা ও বিজ্ঞতার সাথে ভোট প্রদান করা উচিত। যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ভোটাধিকার একটা পবিত্র আমানত। সুতরাং কোন সচেতন নাগরিকের পক্ষে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

(৪) **নিয়মিত কর প্রদান :** রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের উপর বিভিন্ন কর আরোপ করে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। কাজেই নিয়মিত কর প্রদান করা উচিত। নাগরিকগণ যদি স্বেচ্ছায় যথাসময়ে কর প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনায় ব্যাহত হবে। নিয়মিত কর প্রদান না করলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যাবে।

(৫) **রাষ্ট্রের সেবা করা :** রাষ্ট্রের সেবা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি কোন নাগরিককে অবৈতনিক বিচারক বা জুরির দায়িত্ব প্রদান করে কিংবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সমন পাঠায় তখন তার উক্ত দায়িত্ব পালন করা উচিত। এছাড়া স্থানীয় সমস্যাবলির সমাধান ও স্থানীয় উন্নতির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করাও একান্ত কর্তব্য।

(৬) **সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা :** শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা নাগরিককে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেতন করে। উপযুক্ত শিক্ষা নাগরিককে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা নাগরিকের জরুরি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(৭) **অন্যান্য কর্তব্য :** রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়াও নাগরিককে পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় :

(ক) **পরিবারের প্রতি দায়িত্ব :** সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষাদান এবং পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রুষা করাও সন্তানের পবিত্র কর্তব্য।

(খ) **সমাজের প্রতি কর্তব্য :** সমাজ মানুষকে নিরাপদ ও সুসভ্য জীবন দান করে থাকে। সুতরাং সমাজকে সুন্দর ও উন্নত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নাগরিকের। এজন্য কর্তব্য হল পারস্পরিক সহযোগিতা ও

সহমর্মিতা বজায় রাখা। সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাও নাগরিকের কর্তব্য।

(গ) **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য :** আধুনিক বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই একা চলতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে বিশ্বের মানুষ আজ পরস্পর বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং বিশ্বশান্তি ও প্রগতির জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিশ্ব সমাজের সকল নাগরিকের।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক : অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের উৎসই সমাজ। উভয়ের রক্ষকও সমাজ। নাগরিকগণ নিজ নিজ অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার উপভোগ করা যায়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, 'The right of one is related to the duty of other. It one has the right, the other has the duty related to the right.'[৪৯] এক জনের অধিকার অন্যের কর্তব্যের সাথে জড়িত। যদি এক জনের অধিকার থাকে, ঐ অধিকার সম্পর্কে অন্যের কর্তব্য রয়েছে। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

(১) অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দুটো দিক : অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। অধিকার ভোগের জন্য যে সকল কাজ সম্পাদন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, 'As there is a close relationship between the body and soul, so there is a relationship between the rights and duties.' যেমন, ভোটদানের অধিকার বলতে ভোটাধিকার প্রয়োগের দায়িত্বকে বুঝায়।

(২) একজনের অধিকার অন্যজনের কর্তব্য : আমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তেমনি আমার কর্তব্য হল অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে অধিকার ভোগ করতে হলে আমার কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে। যেমন, আমার সম্পত্তি ভোগের অধিকার আছে। হব হাউস বলেছেন, 'ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে তাহলে আমার কর্তব্য হল আমার পথ ছেড়ে দেয়া।'[৫০] অতএব, অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত।

(৩) অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই সমাজবোধ থেকে উদ্ভুত : অধিকার ভোগের মাধ্যমে সমাজজীবন সজীব হয় ও সচেতনতা লাভ করে। অপরদিকে কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা সমাজজীবন সুসংহত ও উন্নত হয়। নাগরিকের যা অধিকার, রাষ্ট্রের তা কর্তব্য। অপর দিকে রাষ্ট্রের যা অধিকার, নাগরিকের তা কর্তব্য। একটা অপরটার উপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। এজন্যই বলা হয় যে, 'Rights imply duties.'

বাংলাদেশ সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য : সংবিধানের তৃতীয়ভাগে ২৬ নম্বর হতে ৪৭(ক) নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিকের বিভিন্ন অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকগণ নিম্নলিখিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকে :

---

৪৯. ড. আবদুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকগণ জীবনধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষালাভের অধিকার, ধর্ম চর্চার অধিকার, চুক্তি করার অধিকার ইত্যাদি সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকে।

(খ) এদেশের নাগরিকগণ ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, সভা-সমিতি করার অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকে।

(গ) বাংলাদেশের নাগরিকগণ যে সব অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে তা হচ্ছে চাকুরি লাভের অধিকার, কর্মের অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার ইত্যাদি। বাংলাদেশের নাগরিকগণ সংবিধানের ২০ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে সব কর্তব্য পালন করে তাহল– (১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, (২) সংবিধান ও আইন মেনে চলা, (৩) নিয়মিত কর প্রদান করা, (৪) ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, (৫) রাষ্ট্র ও সমাজের সেবা করা, (৬) পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, (৭) সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার অর্জনে বাঁধাসমূহ : পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের সংবিধানেই নাগরিক অধিকারের উল্লেখ এবং সেগুলো কার্যকর করার বিধান রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপীয় উন্নত দেশগুলোর জনগণ যেমন অধিকার সচেতন তেমনি কর্তব্য পালনেও তৎপর। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই সংবিধানে নাগরিক অধিকারের কথা লেখা থাকলেও সেগুলো সব সময় জনগণ ভোগ করতে পারে না।[৫১] এর জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ি :

(১) শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতা : শিক্ষা নাগরিক বুদ্ধির বিকাশ সাধন করে। ফলে জনগণ তাদের অধিকার কি, কিভাবে তা ভোগ করতে হয়, কিভাবে সমস্যা দূর করতে হয় তা জানে না। অজ্ঞতার কারণে নাগরিকগণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হতে পারে না।

(২) নাগরিক সচেতনতার অভাব : বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে নাগরিক সচেতনতারও অভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীরও অনেকেই নাগরিক সচেতন নয়। ফলে অধিকার ও কর্তব্য ভোগের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে রয়েছে।

(৩) ক্ষমতাসীন দলের হস্তক্ষেপ : বাংলাদেশে যে দলই ক্ষমতায় যায় তারাই অনেক সময় বিশেষ আইন, কালাকানুন পাস করে নাগরিক অধিকার ভোগে বাঁধার সৃষ্টি করে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের একাংশের হস্তক্ষেপের ফলে নাগরিক অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ে।

(৪) প্রচার মাধ্যমসমূহের নিরপেক্ষতার অভাব : বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকার প্রায় সব সময়ই প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর তাদের একাধিপত্য সৃষ্টি করে। সরকারের হস্তক্ষেপে আলোচনার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় সংবাদপত্রের উপরও সেন্সরশিপ আরোপ করে নাগরিক অধিকার সংকুচিত করা হয়। দলীয় মুখপাত্র স্বরূপ যেসব সংবাদপত্র রয়েছে সেগুলো একপেশে, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করে নাগরিক অধিকার আদায়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

(৫) মানবাধিকার রক্ষা সংগঠনের অভাব ও দুর্বলতা : নাগরিক অধিকার আদায়ের জন্য পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর মত আমাদের দেশে পর্যাপ্ত ও সুসংগঠিত মানবাধিকার সংস্থা নেই। ফলে বাংলাদেশের জনগণ অধিকার ভোগে বাঁধাগ্রস্ত হয়।

---

৫১. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

(৬) **আইনের শাসন ও স্বাধীন বিচার বিভাগের অনুপস্থিতি :** বাংলাদেশে কাগজে কলমে আইন রয়েছে, সংবিধান রয়েছে এবং এতে নাগরিক অধিকারের উল্লেখও রয়েছে। কিন্তু এগুলোর বাস্তব প্রয়োগ নেই বললেই চলে। অনেক সময় বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয় এবং বিচার কার্যে হস্তক্ষেপ করা হয়। ফলে জনগণ অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা হারিয়ে ফেলে।

(৭) **পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও বাড়াবাড়ি :** নাগরিক অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশে পুলিশের ভূমিকা অনেকটা নিষ্ক্রীয় বলা চলে। অভিযোগ রয়েছে যে, একশ্রেণির দূর্নীতি পরায়ণ পুলিশ জনগণের অধিকার রক্ষার পরিবর্তে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অঙ্গুলি হেলনে নিরীহ সাধারণ জনগণের উপর হয়রানি চালায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থে পুলিশ জনগণের বন্ধু না হয়ে বরং জনগণের অধিকার হরণের কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে অধিকার অর্জনে বাঁধাসমূহ দূরীকরণের উপায় : অধিকার হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা। অধিকার মানুষের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তিশীল। নাগরিক অধিকার আপনা-আপনি ভোগ করার প্রশ্ন উঠে না। নাগরিক অধিকার অর্জন করার বিষয়। অনেক সময় অধিকার বিপন্ন হলে বা কেউ অধিকার সংকুচিত করতে চাইলে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তা আদায় করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার অর্জনে বাঁধাসমূহ দূর করতে হলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে হবে :

(১) **শিক্ষার প্রসার :** বাংলাদেশের জনগণ অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। এজন্য গণশিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদেরকে শিক্ষিত ও অধিকার সচেতন করে তুলতে হবে।

(২) **নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি :** শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নাগরিকদের অধিকার সচেতনও করে তুলতে হবে। এজন্য আলোচনা অনুষ্ঠান ও সভা-সমিতিও করতে হবে।

(৩) **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধকরণ :** সংবিধানে এমন বিধান থাকতে হবে যেন ক্ষমতাসীন সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনগণের অধিকার সংকোচন করার কোন সুযোগ না পায়।

(৪) **স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রচার মাধ্যম :** রেডিও-টেলিভিশনের মত গণমাধ্যমগুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং এগুলোর উপর সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সংবাদগুলোকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে হবে। তাহলে এসব প্রতিষ্ঠান নাগরিক অধিকার রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

(৫) **স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা :** নাগরিক অধিকার রক্ষায় যেন বিচার বিভাগ অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে, সৎ ও দক্ষ লোককে বিচারক নিযুক্ত করতে হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভবপর নয়।

(৬) **পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি :** পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজাতে হবে। তাদেরকে নিরপেক্ষভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা লোভ-লালসার উর্ধে উঠে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতে পারে।

(৭) **মানবাধিকার সংগঠনকে শক্তিশালী করা :** বাংলাদেশে প্রায়ই মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়। এসব যেন না হয় তার প্রতিকারের জন্য মানবাধিকার সংগঠনকে শক্তিশালী ও ব্যাপক করতে হবে।

মানবাধিকারের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও স্বরূপ

সব মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন। রুশো বলেছেন যে, 'Man is born free।' শুধু তাই নয় মানুষ জন্মগতভাবে সমঅধিকার ও সমমর্যাদা সম্পন্ন। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়। মৌলিক মানবিক অধিকারের বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এমন কতগুলো অধিকার মানুষের ভোগ করা উচিত যা তার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। এসব অধিকারই মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসংঘের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, মানবাধিকার ভোগের বেলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব যে ধরনের নাগরিকই হোক না কেন, তারা রাজনৈতিক মতামত ও পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, সে যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করা হবে না। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সম্পর্ক : মৌলিক অধিকার হল নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য সে সমস্ত অপরিহার্য শর্তাবলি যা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধান হতে প্রাপ্ত এবং যা সরকারের নিকট অলংঘনীয়। একমাত্র রাষ্ট্র ঘোষিত জরুরি অবস্থার সময় কিংবা সংবিধান স্থগিত ও সংশোধন করা ব্যতীত কোন সরকারই মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না। মৌলিক অধিকার সংবিধানে গৃহীত হওয়ায় তা সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এসব অধিকার ভোগে বাঁধা দিতে পারে না। অপরদিকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, এমন কি রাজনৈতিক মতামত ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত অধিকারগুলোই হচ্ছে মানবাধিকার। জাতিসংঘ সনদের ৩ নম্বর ধারা থেকে ৩০ নম্বর ধারা পর্যন্ত প্রায় ২৮ টা গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য খুবই কম। অনেক মৌলিক অধিকারই জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারে স্থান পেয়েছে। কিন্তু মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কেননা, একটা রাষ্ট্রের সংবিধানে সাধারণত এগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলোর রক্ষকও রাষ্ট্র এবং সংবিধান। অপরদিকে মানবাধিকারের রক্ষক হল জাতিসংঘ।[৫২]

এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু জাতিসংঘভুক্ত সব রাষ্ট্রই একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য।

মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক সাম্য : জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, দলমত নির্বিশেষে যখন মানুষ কতগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমানভাবে উপভোগ করে, যা তাদের সুস্থ নাগরিক, সামাজিক জীবনকে উন্নত ও সম্মানিত করে, তাকে জাতিসংঘ মানবাধিকার বলে ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এসব মানবাধিকার বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, দলমত নির্বিশেষে যখন প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা অনুসায়ী সমানভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহ উপভোগ করতে পারে, তখন তাকে আর্থ-সামাজিক সাম্য বলে।

---

৫২. ড. আবদুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক সাম্য পরস্পর পরিপূরক। আর্থ-সামাজিক সাম্য ব্যতীত মানবাধিকার অসম্পূর্ণ ও অর্থহীন। আর্থ সামাজিক সাম্য সমাজে ধনী-গরীব, অভিজাত ও সাধারণ সব মানুষই সমান অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে যত বেশি আর্থ-সামাজিক সাম্য বিরাজ করে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তত বেশি মানবাধিকার ভোগের উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করে। আবার জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে থাকে। জাতিসংঘের সদস্য হওয়ায় বাধ্য হয়ে রাষ্ট্র মানবাধিকার ভোগের পরিবেশ বজায় রাখতে বাধ্য হয়। সুতরাং, জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক সাম্যের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ; উভয়ই একে অপরের পরিপূরক।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্র : মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানবাধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, দল মত নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার ভোগের সুযোগ প্রদান করে। অপরদিকে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। গণতন্ত্রে সকল মানুষই শাসন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। মানবাধিকার সকল মানুষকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দান করে। মানবাধিকার মতামত প্রকাশের এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশও গড়ে তোলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকে। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের প্রতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পোষণ করে। এর ফলে কোন রাষ্ট্রই জনগণের অধিকার নস্যাৎ করার কোন অশুভ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না।

জাতিসংঘ স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার : ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়। তার পর থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতি বছর এ দিনটাকে 'মানবাধিকার দিবস' হিসেবে উদযাপন করে থাকে।[৫৩]

জাতিসংঘ সনদের ১ নম্বর ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও ভাষা নির্বিশেষে সর্বদা উন্নত ও সম্মানিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই মানবিক মৌলিক অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার ধারাসমূহ হল :

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার থাকবে।

(২) কাউকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস প্রথা ও ব্যবসা নিষিদ্ধ।

(৩) কোন ব্যক্তির প্রতি অমানুষিক নির্যাতন, অত্যাচার, উৎপীড়ন, মর্যাদা হানিকর ব্যবহার ও কোন প্রকার শাস্তি দান করা চলবে না।

(৪) সকলেই আইনের চোখে সমান মর্যাদা পাবে।

(৫) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং সকলেই আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী।

(৬) কারো মৌলিক অধিকার খর্ব হলে উক্ত ব্যক্তি বিচারালয়ে যথার্থ বিচার পাওয়ার অধিকারী।

(৭) কাউকে বিনা কারণে গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

(৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ সুবিচার পাওয়ার অধিকারী হবে।

---

৫৩. ড. আবদুল লতিফ মাসুম সম্পাদিত, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

(৯) যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করতে পারবে। কেউ দোষী প্রমাণিত না হলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

(১০) গৃহের নিরাপত্তা ও যোগাযোগের গোপনীয়তার অধিকার সকলের থাকবে। কোন গৃহে বেআইনিভাবে হামলা করা যাবে না এবং কারো গোপন যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

(১১) প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ দেশের সব এলাকায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করতে পারবে এবং নিজ দেশ বা অন্য যে কোন দেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন করার অধিকার থাকবে।

(১২) নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে কোন ব্যক্তির নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার আছে।

(১৩) প্রত্যেক ব্যক্তিরই জাতীয় অধিকার আছে। কাউকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(১৪) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করতে পারবে। বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার থাকবে।

(১৫) প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার থাকবে। কাউকে জোরপূর্বক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(১৬) প্রত্যেকের মুক্ত চিন্তা, ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেকেই নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

(১৭) প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন মতামত পোষণ ও প্রকাশ করতে পারবে।

(১৮) প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মিলিত হওয়ার এবং সংঘ গঠন করার অধিকার থাকবে। কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোন পেশাভিত্তিক সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

(১৯) আইন শাসনতন্ত্র থেকে প্রাপ্ত কারো মৌলিক অধিকার খর্ব করলে উক্ত ব্যক্তি বিচারালয়ের মাধ্যমে যথার্থ প্রতিকারের ব্যবস্থার অধিকার লাভ করবে।

(২০) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেকের নিজ রাষ্ট্রের সরকার গঠনের অধিকার থাকবে। প্রত্যেকেই সরকারি চাকুরি গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে।

(২১) প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের সদস্য হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।

(২২) প্রত্যেকেরই কর্মজীবনে বিশ্রাম ও অবকাশ এবং কার্য থেকে অবসর এবং বেতনসহ ছুটি ভোগের অধিকার থাকবে। প্রত্যেককে অধিকার ভোগের সাথে কর্তব্য পালন করতে হবে।

(২৩) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার উপযোগী খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা লাভের অধিকার থাকবে। এ ছাড়া বেকারত্ব, অসুস্থতা, বিধবা, বৃদ্ধ বয়সে কিংবা দৈব-দুর্বিপাকে পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা এবং মা ও শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকার থাকবে।

(২৪) প্রত্যেকের শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও কাজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের উচ্চ শিক্ষার অধিকার সকলেই সমভাবে ভোগ করবে।

(২৫) প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রত্যেক ব্যক্তি শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশে সুবিধা লাভের পূর্ণ অধিকার সমভাবে ভোগ করবে।

(২৬) সন্ত্রাস, অশান্ত ও কলহপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ সব সময় উপভোগ করা সম্ভব নয় বলে সকলের জন্য সামাজিক ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার অধিকার থাকবে।

(২৭) জাতিসংঘের ঘোষিত অধিকার ও স্বাধীনতা ধ্বংসকারী কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তির প্রতি এ ঘোষণা আরোপ করা চলবে না।

মানবাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ নীতিসমূহ : জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ নীতিসমূহ নিম্নরূপ :

(১) পৃথিবীর সকল মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা সম্পন্ন। সকল মানুষ পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ করবে।

(২) সকল অধিকার ও স্বাধীনতা সকলের সমানভাবে উপভোগের অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে জাতি ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন, দলমতের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন তারতম্য করা হবে না।

(৩) পৃথিবীর সকল স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন বা স্বায়ত্তশাসিত যে-কোন রাষ্ট্রের নাগরিককে তার দেশের রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা হবে না।

বাংলাদেশ সংবিধান : মৌলিক নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার : বাংলাদেশ স্বাধীন ও উন্নয়নশীল একটা রাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে এগুলো সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রায় সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার রক্ষার ঘোষণা কার্যকরী করতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ অনুচ্ছেদ হতে ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এসব অধিকার জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশ সংবিধানের জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার গুলোকে আরো উন্নত ও সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮ থেকে ৩০ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সাম্যের যে অধিকারগুলো সন্নিবেশিত আছে তা জাতিসংঘ মানবাধিকারের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশ সংবিধানর ৩১ থেকে ৩৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৫৪]

জাতিসংঘ সনদের ৩ নম্বর ধারা থেকে ২১ নম্বর ধারা পর্যন্ত ধারাগুলোকে মানবাধিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের এসব ধারায় যেভাবে ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে– ঠিক তারই প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ থেকে ৩৫ নম্বর ধারায়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৬ থেকে ৪১ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিকের চলাফেরার অধিকার, সমাবেশের অধিকার, সংগঠন করার অধিকার, বাক স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ ও ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ রয়েছে। জাতিসংঘ সনদের ৩ নম্বর থেকে ২১ নংম্বর ধারায় এসবের উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের তালিকায় জাতিসংঘ সনদের ২২ নম্বর থেকে ২৭ নম্বর ধারারও অনেকটা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বলা

---

৫৪. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

যায় যে, বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ঘটিয়ে বরং জাতিসংঘ সনদে উল্লিখিত মানবাধিকারের প্রতিই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। আর এ সকল বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে অধিকার ও কর্তব্য একটা অপরটার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। জোর করে অধিকার আদায় করা যায় না; কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকারের দাবি করা যেতে পারে। প্রত্যেক নাগরিককে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিক জীবন সংহত ও উন্নত হয়। অপরপক্ষে যিনি কর্তব্য পালন করাবেন তাকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কেউ তার যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তাহলেই সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তির সুবাতাস সদা প্রবাহমান থাকবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

ইসলামি রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য অনেক। ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে নাগরিকগণ যেমন অধিকার ভোগ করেন তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও তাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে (Rights imply duties)। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। একটাকে বাদ দিয়ে অপরটার আলোচনা চলে না। বস্তুত অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত আছে। অধিকার ভোগ ব্যতীত যেমন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করলেও নাগরিক জীবন সংহত হয় না। মূলত রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের প্রতি নাগরিকদের ঐকান্তিক কর্তব্য পালনের উপর ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভরশীল। ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of citizens in Islamic State) মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্যেই ইসলামি রাষ্ট্রে দায়িত্বশীলদের যে মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে তা বহুবিধ। এ অধিকার যাতে কেউ হরণ করতে না পারে সে জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা একান্ত অপরিহার্য। ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার

(১) **বেঁচে থাকার অধিকার :** ইসলামি রাষ্ট্রে সকল নাগরিকদের বাঁচার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত। কোন ব্যক্তি, সংঘ, সংগঠন, বহিঃশক্তি অথবা স্বয়ং রাষ্ট্র কোন নাগরিককে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হলে ইসলামি রাষ্ট্র তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। ইসলামি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করে। মহানবী সা. তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান তোমাদের পরস্পরের কাছে পূত-পবিত্র।' মুসলিম মণীষীদের মত হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার কারণে কারও মৃত্যু হলে তাকে হত্যা হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং দায় রাষ্ট্র প্রধানের উপর বর্তাবে। কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে অর্থাৎ কোন ক্রমেই হত্যা করা গর্হিত অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ 'কোন মানুষকে তোমরা হত্যা কর না, এটা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন– ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া।'[৫৫]

(২) **বস্ত্রের অধিকার :** বস্ত্র দ্বারা মানুষ তার ইজ্জত রক্ষা করে। ইসলামি রাষ্ট্রে সরকার তার নাগরিকদের এ মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বস্ত্র, পশু ও মানুষের মধ্যে ভেদ রেখা টেনে দেয়। এ উপরকণটা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য।

---

৫৫. আল কুরআন, ১৭ : ৩৩

(৩) **বাসস্থানের অধিকার :** বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজনগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইসলামি রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের নিরাপদে আপন আপন বাসস্থানে বসবাস করার অধিকার সংরক্ষিত। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হওয়ার শর্তে দেশের যে কোন স্থানে বসবাস করার অধিকার রাখে।

(৪) **শিক্ষার অধিকার :** ইসলাম বিদ্যা-শিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয করে দিয়েছে। শিক্ষা ছাড়া যেমন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়া যায় না অনুরূপভাবে কোন উন্নতিও সাধন করা যায় না। ইসলামের দর্শনকে বুঝতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজন। সুশিক্ষা ব্যতীত একজন নাগরিকের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা সুলভ করবে যাতে ব্যাপক শিক্ষিত নাগরিক ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শকে অনুধাবন করতে পারে। ফলে দেশ ও জাতির ভীত মজবুত হবে। ইসলামের প্রথম বাণী 'ইকরা' 'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।'[৫৬]

(৫) **সম্পদ সঞ্চয় ও ভোগ করার অধিকার :** মুসলিম রাষ্ট্রের বা ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ ভোগ ও সংরক্ষণ করার অধিকার রাখে। সম্পদ উপার্জন-ব্যয় ও আল্লাহর বিধান মেনে যে কোন পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করা যায়। নাগরিকের এ বৈধ সম্পদ ভোগ ও সঞ্চয় কোন ব্যক্তি, সংঘ, সংগঠন অথবা অন্য কোন শক্তি বাঁধা সৃষ্টি করলে অথবা হরণের চেষ্টা করলে তা রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের প্রতিটা নাগরিকের মালিকানা স্বত্বের পূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে। কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 'এবং তোমরা একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস না।'[৫৭]

(৬) **সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাঁধাদানের অধিকার :** আল্লাহপাক মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তোমরাই সর্বশ্রেষ্ট উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে, আর তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখবে।'[৫৮]

(৭) **সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার :** ব্যক্তির জীবন ও সম্পদ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নয়। সে সঙ্গে মান-মর্যাদা রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মুসলিম মানেই সম্মানিত। কেননা, পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে– 'মান-ইজ্জত সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. এবং সকল মু'মিনদের জন্য।' অতএব, কেউ অপমানিত হোক ইসলামি রাষ্ট্র তা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'একদল যেন অপর দলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করে।' আরও এসেছে, 'তোমরা একে অপরকে দোষারোপ কর না, একে অন্যকে মন্দ নামে ডেক না। আর একে অন্যের

---

৫৬. আল কুরআন, ৯৬ : ১
৫৭. আল কুরআন, ২ : ১৮৮
৫৮. আল কুরআন, ৩ : ১১০

গিবত কর না।'[৫৯] যার যার অবস্থান থেকে প্রতিটা নাগরিক যথাযথভাবে সম্মান পাওয়ার অধিকারী। এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا.

'কোন দল যেন কোন দলের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। তোমরা একে অন্যের উপর দোষারোপ কর না, একে অন্যকে বিকৃত নামে ডেকো না। ... আর তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে।'[৬০]

(৮) ঘরোয়া জীবনের নিরাপত্তা : ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্থাৎ প্রতিটা নাগরিকের স্বাভাবিক জীবন যাপনের নিরাপত্তা ইসলামে নির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا ۖ 'তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ কর না, যতক্ষণ না তোমরা ঘরের বাসিন্দাদের অনুমতি লাভ করবে এবং তাদের প্রতি সালাম দিবে।'[৬১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, وَّلَا تَجَسَّسُوْا 'এবং তোমরা মানুষের ছিদ্রান্বেষণ কর না।'[৬২]

(৯) যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার : সমাজে বসবাস, জীবনযাপন ও চলাফেরায় মানুষদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কথা ও কাজে, ব্যবহারে, আচার-আচরণে কারও প্রতি যুলুম করা যাবে না। আল্লাহ বলেছেন, لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ 'আল্লাহ মন্দ কথার প্রচারণা পছন্দ করেন না, তবে যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র।'[৬৩]

(১০) বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার : জনগণের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ বা বৈষম্য সৃষ্টি করে আশরাফ-আতরাফ, উঁচু-নিচু, সুবিধাভোগী-সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিতে পরিণত করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। সকল নাগরিককে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং সমান সুযোগ-সুবিধা দান করাই রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য। ফিরআউনের স্বৈরশাসনের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّه كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ.

---

৫৯. আল কুরআন, ৪৯ : ১১-১২
৬০. আল কুরআন, ৪৯ : ১১-১২
৬১. আল কুরআন, ২৪ : ২৭
৬২. আল কুরআন, ৪৯ : ১২
৬৩. আল কুরআন, ৪ : ১৪৮

'ফিরআউন যমিনের বুকে ঔদ্ধত হয়ে উঠল এবং তার নাগরিকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে দিল। তাদের এক শ্রেণির লোকদেরকে তারা দূর্বল করে রাখত, পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'[৬৪]

(১১) ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার : ইসলামি রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে, তবে রাষ্ট্র বা অন্য কোন নাগরিকের কাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন স্বাধীনতা ইসলাম বৈধ মনে করে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা একটা ব্যাপক বিষয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে, নাগরিকদের স্বাধীন ও অবাধ চলাফেরা, শত্রুর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা, সম্পদ সংরক্ষণ, অকারণে অত্যাচারী না হওয়ার অধিকার ভোগ করা ইত্যাদি। ইসলামি রাষ্ট্রেও উপরিউক্ত অর্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় স্বীকৃত। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা হানি হয় কিনা সেদিকে বিশেষভাবে ইসলামি রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কেননা, কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, 'একজনের বোঝা অপরজন কখনও বহন করবে না।'[৬৫]

(১২) চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার : প্রতিটা নাগরিক মুক্ত মন নিয়ে কথাবার্তা, আলোচনা-সমালোচনা করতে পারবে; অন্য ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত দেয়া ব্যতীত। এ বিষয়ে কাউকে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ 'দীনের ক্ষেত্রে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।'[৬৬]

(১৩) স্ব-স্ব ধর্ম পালনের অধিকার : পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, ধর্মের মতভেদ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে; কিন্তু এমন সুন্দর পন্থায় হতে হবে যে, কারো মনে যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে। আল্লাহ বলেছেন, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ 'এরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যে সকল উপাস্যকে ডাকছে, তোমরা তাদেরকে গালি দিও না।'[৬৭]

(১৪) সংগঠনের অধিকার : যে সংগঠন ন্যায় ও সৎকাজের প্রচারের জন্য কাজ করবে এবং সমাজ জীবনে কোন বিভেদ বা মতানৈক্য সৃষ্টির কাজে লিপ্ত না হবে, বরং শোষণের বিরুদ্ধে ও শোষিতের পক্ষে কাজ করবে কেবলমাত্র সেরূপ সংগঠনেরই অধিকার থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

'এবং তোমাদের মধ্যে এমন দল থাকা প্রয়োজন, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে, তারা হল সফলকাম। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট হিদায়াত আসার পরেও তারা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এমন লোকদের জন্যই মহা শাস্তি রয়েছে।'[৬৮] আল্লাহপাক আরও

---

৬৪. আল কুরআন, ২৮ : ৪
৬৫. আল কুরআন, ৩৫ : ১৮
৬৬. আল কুরআন, ২ : ২৫৬
৬৭. আল কুরআন, ৬ : ১০৮
৬৮. আল কুরআন, ৩ : ১০৪-১০৫

বলেছেন, وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ ‘এবং তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করবে না, উত্তম পন্থা ব্যতীত।’[৬৯]

(১৫) অন্যের অপরাধে অপরাধী না হওয়ার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকই কেবল নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ি; অন্যের কাজের জন্য কাউকে কোন অবস্থাতেই শাস্তি দেয়া যাবে না। আল্লাহপাক বলেছেন, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى ۚ ‘এবং প্রত্যেকেই যা অর্জন করবে তার কুফল তাকেই ভোগ করতে হবে, কোন বোঝা বহনকারীই অন্য কারও বোঝা বহন করবে না।’[৭০]

(১৬) বিনা অপরাধে বন্দী ও শাস্তিপ্রাপ্ত না হওয়ার অধিকার : অপরাধের কোন প্রমাণ না থাকলে অথবা প্রকৃত ন্যায়-ইনসাফের দৃষ্টিতে যুক্তিসংগত কোন কারণ না থাকলে কাউকে দায়ি করা, কোন শাস্তি দেয়া কিংবা অন্য কোনরূপ পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। আল্লাহপাক বলেছেন, إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ‘যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে তোমরা কারো অসুবিধার সৃষ্টি করবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে।’[৭১]

(১৭) অভাবীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সামগ্রী লাভের অধিকার : রাষ্ট্রের পক্ষে থেকে সকল পথ উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও জীবন সংগ্রামে পশ্চাদপদ হয়ে যারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের এ অধিকার রয়েছে যে, অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত বাঁচার জন্য যা যা একান্ত প্রয়োজন, তা পূর্ণ করার দায়িত্ব স্বয়ং সরকারকেই বহন করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, وَفِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ‘এবং তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রয়েছে।’[৭২]

(১৮) আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার : ইসলামি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নজিরবিহীন সাম্যনীতি অনুসৃত হয়। কোন নাগরিক যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান তার ন্যায্য অধিকার বা বঞ্চিত করছে বা তার উপর যুলুম করছে, তবে সে এর প্রতিকারের জন্য আইনের আশ্রয় নিতে পারে। আদালত নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার প্রতিকার করতে বাধ্য। অভিযোগ যার বিরুদ্ধেই হোক না কেন আইন সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ, ‘তোমার বিচারে বসে যখন কথা বল, তখন ন্যায় কথাই বলবে; যদি বিচারাধীন ব্যক্তি তোমাদের নিকট আত্মীয়ও হয়।’[৭৩]

ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সম্পর্কিত বহু ঘটনা মহানবী সা., খুলাফায়ে রাশিদিন এবং পরবর্তী যুগের অনেক মুসলিম শাসকের জীবনে দেখা যায়। ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার উপরই শ্রেণি বৈষম্যহীন ইসলামি সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

---

৬৯. আল কুরআন, ২৯ : ৪৬
৭০. আল কুরআন, ৬ : ১৬৪
৭১. আল কুরআন, ৪৯ : ৬
৭২. আল কুরআন, ৫১ : ১৯
৭৩. আল কুরআন, ৬ : ১৫২

(১৯) বাক-স্বাধীনতার অধিকার : বাক-স্বাধীনতার অধিকারটা পৃথিবীর কোথাও নিঃর্শত ও নিরঙ্কুশ নয়। কারও কথা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম অথবা অন্য ব্যক্তির ন্যায্য অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার বাক-স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামি রাষ্ট্রে সত্য ও ন্যায্য কথা বলা নাগরিকের শুধু অধিকার নয়; কর্তব্যও বটে। মহানবী সা. এ মর্মে বাণী প্রদান করেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে পাপাচারে করে, আর যে পাপাচারে লিপ্ত হয় সে ধ্বংস হয়।'[৭৪] সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যক্তি তার ন্যায্য কথা, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করে।

(২০) সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার : কোন সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। পবিত্র কুরআনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাকিদ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না।'[৭৫] ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ পরস্পর ঐক্যবদ্ধভাবে সত্য ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করবে এটা মহান আল্লাহর ইচ্ছা। কাজেই আল্লাহর এ ইচ্ছাকে ইসলামি রাষ্ট্র বাস্তবে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

(২১) চলাফেরার অধিকার : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অধিকার ক্ষুণ্ন না করে ইসলামি রাষ্ট্রের যে কোন মুসলিম নাগরিক দেশের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে পারবে। এ চলাচলের অধিকার একটা অন্যতম সামাজিক অধিকার, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে সমাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। শুধু তাই নয় শারি'আহ এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'লোকেরা কি যমিনে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে না? এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি স্বচক্ষে দেখবে না?'[৭৬] তাছাড়া ব্যবসায়িক কাজে বিদেশ ভ্রমণের কথাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকের চলাফেরার অধিকার স্বীকৃত। তার এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর কর্তব্য।

(২২) মত প্রকাশের অধিকার : মত প্রকাশের অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার মুসলিম নাগরিকের অন্যতম অধিকার। হযরত আলি রা. বিষয়টা সম্পর্কে ইসলামি আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তার খিলাফত কালে খারিজি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিল। তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করত এবং অস্তিত্ব বিলোপের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। তবুও আলি রা. বলেন, 'তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের আক্রমণ করব না।'[৭৭] এটাই পবিত্র কুরআনের সুমহান শিক্ষা ও রাসুল সা.-এর নির্দেশিত পথ।

(২৩) ভোটদানের অধিকার : যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রকৃতির সেহেতু দেশের শাসন নির্বাচনে জনগণ ভোট দানের অধিকার ভোগ করে থাকে। খিলাফতের ভিত্তি রচিত হয়েছিল নাগরিকদের

---

৭৪. ইমাম বাইহাকি, *আস সুনান আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ.৩, হাদিস নং ৫৫৯৫, পৃ. ৩৯০

৭৫. আল কুরআন, ৩ : ১০৩

৭৬. আল কুরআন, ১২ : ১০৯

৭৭. ইমাম মুহাম্মদ আশ শাওকানি, *নাইলুল আউতার*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ দুওয়ালিয়া, ২০০৪), খ.৭, পৃ. ১৩৯

ভোটাধিকার, সমর্থন তথা অসমর্থনের ইচ্ছা ব্যক্ত করার মাধ্যমে। ইসলামি রাষ্ট্রে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটদানের অধিকার রাখে।

(২৪) নেতৃত্ব দানের অধিকার : ইসলামে নেতৃত্ব প্রার্থনা করার রেওয়াজ না থাকলেও যে কোন নাগরিক তার গুণাবলি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে জনগণের সমর্থন লাভ করে তাদের নেতৃত্ব দানের অধিকার রাখে। এ জন্য মহানবী সা. একজন ক্রীতদাসের নেতৃত্বও মেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

(২৫) রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার : দেশ ও জনগণের কল্যাণে নাগরিকগণ রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়, ন্যায্য সমালোচনা এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে দল গঠন করতে পারে। তবে যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ইসলামি বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রচিত হতে হবে। মানুষের মনগড়া রাজনৈতিক মতবাদ ইসলামি রাষ্ট্রে অচল।

(২৬) অভাবমুক্ত হওয়ার অধিকার : অভাবী এবং বঞ্চিত ব্যক্তিদের তাদের জীবন ধারণের অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক বা সমাজের ধনী ব্যক্তিরা তার এ অধিকার পূরণ করবে। আল্লাহর বাণী, 'এবং তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।'[৭৮]

ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের গুণাবলি

(১) চরিত্রবান হওয়া : ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকদের সচ্চরিত্রবান হতে হবে। কারণ সচ্চরিত্রই যে কোন জাতির উন্নতির মূল সোপান। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 'উন্নত চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।'[৭৯]

(২) মুত্তাকি হওয়া : ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মুত্তাকি তথা খোদাভীরু হতে হবে, যেহেতু ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়। আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকি, খোদাভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ।'[৮০]

(৩) বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া : ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যত বেশি দক্ষতা, উন্নত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে পারবে, ইসলামি সরকার ততই সফলতা অর্জন করবে। মহানবী সা. বলেছেন, انما بعثت معلما 'আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।'[৮১]

(৪) রাষ্ট্রের আনুগত্য করা : সরকারের আনুগত্য স্বীকার ও বিভিন্ন কর্ম এবং নীতিকে মান্য করার মনোভাব ব্যতীত কেউ সুনাগরিক হতে পারে না। তাছাড়া সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা, আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম নাগরিক জীবনের মহৎগুণ।

---

৭৮. আল কুরআন, ৫১ : ১৯

৭৯. ইমাম বাইহাকি, *আস সুনান আল কুবরা*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২০০৩), খ.১০, হাদিস নং ২০৭৮২, পৃ. ৩২৩

৮০. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

৮১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *সুনানু ইবন মাজাহ*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৬), খ.১, হাদিস নং ২২৯, পৃ. ১২২

(৫) **সুশিক্ষিত হওয়া :** ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুশিক্ষিত হতে হবে। 'Education is the backbone of a Nation.' 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।' শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। সুতরাং নাগরিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহপাক বলেছেন, هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ 'জ্ঞানী আর মুর্খরা কি কখনও সমান হতে পারে?'[৮২]

(৬) **বিবেকবান ও কর্তব্যবোধ সম্পন্ন হওয়া :** ইসলামি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে বিবেকবান ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হতে হবে। যা তাকে মানব কল্যাণ ও সমাজ-সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক শুধু অধিকারই ভোগ করে না। তাকে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের নিয়েই গঠিত হয়। অতএব, নাগরিকদের অধিকারের সাথে কর্তব্যও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। নিচে ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হল :

(১) **রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা :** নাগরিক হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। যে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয় সে নাগরিক হতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামের বিধি-বিধান মত শাসন পরিচালনা করলে নাগরিকগণ তার প্রতি অনুগত থেকে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করবে। পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহপাক ও তাঁর রাসুল সা. এবং তোমাদের মধ্যকার নেতার আনুগত্য কর।'[৮৩]

(২) **আইন মান্য করা :** নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা। ইসলামি রাষ্ট্রের আইন হচ্ছে ইসলামি শারি'আর নির্দেশ। এ নির্দেশ অমান্য করা পক্ষান্তরে ইসলামকে অমান্য করার শামিল। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের পূর্বশর্ত হচ্ছে আইন মেনে চলা। মহানবী সা. এ মর্মে বলেন, 'সুখে-দুঃখে ও আনন্দে-নিরানন্দে রাষ্ট্র প্রধানের হুকুম-আহকাম শ্রবণ করা ও তা মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।'

(৩) **রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত না হওয়া :** ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত না হওয়া। যে নাগরিক রাষ্ট্রে বসবাস করে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হয় সে সুনাগরিক নয়; বরং রাষ্ট্রদ্রোহী। আল্লাহপাক বলেছেন, 'শান্তি স্থাপনের পর তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না।'[৮৪] রাষ্ট্রদ্রোহীতা ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপাপ। এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা এসেছে, 'আল্লাহর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।'[৮৫] সরকারের যাবতীয় আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সেগুলো পুরোপুরি

---

৮২. আল কুরআন, ৩৯ : ৯
৮৩. আল কুরআন, ৪ : ৫৯
৮৪. আল কুরআন, ৭ : ৫৬
৮৫. আল কুরআন, ২৮ : ৭৭

মেনে চলতে হবে এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে-এমন কোন কাজে জনগণ কখনও শরিক হতে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ‘এবং তোমরা পৃথিবীর বুকে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর কোন বিপর্যয় সৃষ্টি কর না।’[৮৬]

(৪) সৎকাজে সহযোগিতা ও অসৎকাজে বাঁধাদান করা : মুসলিম হিসেবে সৎ ও কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করা এবং অসৎ ও অকল্যাণকর কাজে বাঁধা দেয়া প্রতিটা নাগরিকের নৈতিক ও আদর্শিক দায়িত্ব ও কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত শুভ উদ্যোগে সহযোগিতা করা, অসৎ ও অশুভ কাজে বাঁধা দান করা। কুরআনে বলা হয়েছে, ‘যে সৎ কাজ করল সে নিজের কল্যাণ সাধন করল।’[৮৭] জনগণকে সরকারের সকল কল্যাণকর কাজেই সহযোগিতা দান করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ‘এবং তোমরা সৎ ও তাকওয়ার যাবতীয় কাজে সহযোগিতা কর।’[৮৮]

(৫) দেশ রক্ষায় সর্বাত্মক সাহায্য করা : যে রাষ্ট্র স্থাপিত হয় শুধু আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, স্থাপিত হয় শুধু কল্যাণকামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীর সার্বিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, তার অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়, তখন সে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকদের সবকিছু নিয়েই অগ্রসর হতে হয়। প্রয়োজন হলে নর-নারী নির্বিশেষে সকলকেই সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। আল্লাহ বলেন,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

‘তোমরা অভিযানে অগ্রসর হও হালকা অথবা ভারি রণ-সম্ভারসহ এবং তোমাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।’[৮৯]

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা : রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে মহানবী সা. প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এ রাষ্ট্রটা ছিল মানব জাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণ মূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ধর্মসহ সকল ক্ষেত্রে অমুসলিমরা মদিনা রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। মদিনা রাষ্ট্রটা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতা বিকাশের এক নতুন সংস্থা। ইসলাম শ্রেণি, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা, সহিষ্ণুতা ও অধিকার সংরক্ষণেরই নামান্তর।

মদিনা রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা : মদিনা সনদের (The Character of Medina) মাধ্যমেই মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রটা ছিল একটা Multi Religious State ইসলামের সহনশীলতার মহান আদর্শ সকল যুগের সকল জাতির আদর্শকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। মদিনা রাষ্ট্র সহনশীলতার নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনা সনদে অমুসলিমদের যতটা অধিকার দেয়া হয়েছে, দুনিয়ার কোন জাতি তার সংখ্যালঘুকে তা দেয়নি।[৯০]

---

৮৬. আল কুরআন, ৭ : ৮৫

৮৭. আল কুরআন, ৪৫ : ১৫

৮৮. আল কুরআন, ৫ : ২

৮৯. আল কুরআন, ৯ : ৪১

৯০. শাহ আবদুল হান্নান, ওয়াল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটি আয়েজিত মদীনা দিবস উপলক্ষ্যে ২৪.০৯.১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ, *দৈনিক সংগ্রাম* ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৭

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নেই।'[৯১] আরও আছে, 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।'[৯২] তিনি সামান্য জিযিয়ার পরিবর্তে ইয়াহুদি এবং নাজরানের খ্রিস্টানদের যিম্মি গ্রহণ করেন এবং স্ব-স্ব ধর্ম ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করেন। ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়।[৯৩] মহানবী সা. বলেন, মনে রেখ, যদি কোন মুসলিম কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব।[৯৪] আল্লাহপাক বলেছেন, 'হে রাসুল! আপনি বলুন, আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তারই দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[৯৫]

অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে ইসলামি শারি'আর ভাষ্য : ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ তাদের সকল মানবাধিকার ভোগ করবে এবং তাদেরকে ইসলামি শারি'আহ অনুযায়ী আহালুয যিম্মাহ বা 'আল মুয়াহহিদুন' বলে অভিহিত করা হয়। 'যিম্মি' শব্দ 'যিম্মাহ' হতে উৎপন্ন। এর অর্থ আহদ, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি বা কওল করার। ড. লুকমান তাইব 'যিম্মি' শব্দের অর্থ লিখেছেন প্লেজ (Pledge), গ্যারান্টি ও নিরাপত্তা[৯৬] অমুসলিমদের যিম্মি' বলা হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের যে প্লেজ অব সিকিউরিটি এবং গ্যারান্টি দেয়া হয় তা রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয়তা (Political Nationality) প্রদানের মত। এ মুতাবিক যিম্মিরা হচ্ছে The people of the abode of Islam (Ahlal Daral Islam)[৯৭] এবং তারা ইসলামি জাতীয়তার ধারক (Al-jinsiyah al Islamiyyah).[৯৮] ইসলামি রাষ্ট্রীয় আইনে তাদের সদস্যপদ হচ্ছে নিরাপত্তা প্রদানের চুক্তি বা আকদ আল যিম্মা ভিত্তিক। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিকদের শারি'আহ প্রদত্ত অধিকারগুলো দিতে বাধ্য।

সায়্যিদ আমির আলি বলেন, 'By the laws of Islam, liberty of conscience and freedom of worship were allowed and guaranteed to the followers of every other creed under Moslem dominion.'[৯৯] একদল মুসলিম দার্শনিক অভিমত দিয়েছেন যে, তারা শুকরের মাংস, মদ এবং তাদের ধর্মে এ ধরনের যা কিছু বৈধ তা পান ও ভক্ষণ করতে পারবে। মুসলিম সরকার এগুলো

---

৯১. আল কুরআন, ২ : ২৫৬
৯২. আল কুরআন, ১০৯ : ৬
৯৩. ড. মুহাম্মদ আলী আজগর খান ও মোখলেছুর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*(রাজশাহী : বুক প্যাভিলিয়ন, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৪৩
৯৪. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, খ. ৩-৪, হাদিস নং ২২৫, পৃ. ২৩
৯৫. আল কুরআন, ৪২ : ১৫
৯৬. Dr. Lokman Taib, *Political System of Islam*(Kualalumpur : 1994), p. 95
৯৭. Dr. Abrur Rahman L Doy, *Shariah : The Islamic Law*(UK : Taha Publishers, 1982), vol.1, p. 426
৯৮. আবদুল কাদের আওদাহ, *আল তাশরী আল জানাই আল ইসলাম*(আলেকজান্দ্রিয়া : মানশাহ আল মা'আরিফ, ১৯৭৪), খ.১, পৃ. ৩০৭
৯৯. Syed Amer Ali, *The Spirit of Islam*(Delhi : Low Price Publications, 1990), p. 212

ভক্ষণ ও পান করতে বাঁধা দান করার অধিকারী নয়।[১০০] অমুসলিমদের নারী পুরুষ, শিশু, শ্রমিক, বৃদ্ধ, দূর্বল, রুগ্ন ও প্রতিবন্ধী মানুষ যারা মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকারক নয়, ইসলাম তাদের প্রতি মানবিক ও ন্যায় আচরণের অনুপ্রেরণা যোগায়। কুরআনে বলা হয়েছে,

لاَ يَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ ط إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

'যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।'[১০১] এ নির্দেশনা রাসুলুল্লাহ সা. ও তাঁর অনুসারীগণ পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। ভিন্নধর্মের কোন প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন এবং তার মাথার কাছে গিয়ে বসতেন।[১০২] এটাই ইসলামের মহানুভবতা, চরম বিস্ময়। মহানবী সা. মদিনায় হিজরতের পর সেখানে সামাজিক সংহতি স্থাপন ও তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, সে-ই আল্লাহর অধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারকে ভালবাসে।'[১০৩] তিনি আরও বলেছেন, 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাএয়র জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'[১০৪] ইসলাম দয়া-মায়া, ভালবাসা, কল্যাণ কামনা, সহমর্মিতা, মানবকল্যাণমুখী সব ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক সংহতির অনুপ্রেরণা যোগায়।

অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষায় ইসলামি রাষ্ট্র : অঙ্গীকার রক্ষা করা মুসলিমদের পক্ষে ধর্মীয় কর্তব্য বা ফরয। অতএব, কোন মুসলিম স্বীয় দীন ও ইমান বিসর্জন দিয়ে কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ হলো, 'নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে পরকালে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'[১০৫]

খুলাফায়ে রাশিদিনের আমলে দরিদ্র ও সহায়-সম্পদহীন অমুসলিমগণ বাইতুলমাল হতে নিয়মিত ভাতা ও সাহায্য পেতেন।[১০৬] উমাইয়া খলিফা মুআবিয়া রা. অমুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন। তার চিকিৎসক, অর্থ সচিব ও সভাকবি ছিল খ্রিস্টান। সমগ্র উমাইয়া সাম্রাজ্যে তারা মোটামুটি সুখ-সাচ্ছন্দে বসবাস করতেন।[১০৭] মোটকথা, তারা সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের ন্যায় সম-অধিকার লাভ করেছিলেন।

---

১০০. Abdel Wadoud Moustafa Moursi El-Seoudi, *Rights of Non-Muslims in the Muslims Society*(Malaysia : 2012), p. 793

১০১. আল-কুরআন, ৬০ : ৮

১০২. ইমাম আবূ দাউদ রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪. হাদিস নং ৩০৮২

১০৩. আল-মুত্তাকি আল হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), খ.৬, হাদিস নং ১৬১৭১, পৃ. ৩৮৪

১০৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), খ.১, হাদিস নং ১২, পৃ. ১৯

১০৫. আল কুরআন, ১৭ : ৩৪

১০৬. Dr. N. K. Singh, *Peace Through Non-Violent Action In Islam*(Delhi : Adam Publishers & Distributors, 1996), p. 77

১০৭. ইমাম কাযি আবু ইউসুফ রহ., *কিতাবুল খারাজ*(বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৯৭৯), পৃ. ১৪৪

নাগরিকদের অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন দেশে যা স্বীকৃত তা এরূপ, 'Citizen's Charter' in Business English : In the UK and other Countries, an official statement of the quality of service citizens should expect from their local and national governments.[১০৮] কিন্তু বাস্তবতা অধিকাংশ দেশে কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ। যেমন, ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান দুই অংশ নিয়ে স্বাধীন হলেও ধর্মের শিক্ষা ও আদর্শ তাদের ভিতর কানা-কড়িও ছিল না। তাই Khalid B. Sayeed লিখেছেন : Governor Monem Khan attempted durign the Ayub era to ban broadcast of Tagore's songs or Poems over Dacca radio and to Prevent the import of Bengali books from Calcutta.'[১০৯]

উপরের আলোচনা হতে একটা বিষয় প্রতিভাত হয় যে, মহান আল্লাহ নির্দেশিত ও মহানবী সা. প্রদর্শিত মত ও পথ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র সুখী, সমৃদ্ধশালী, ন্যায়নীতি ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যেটার বাস্তব চিত্র উপরে আলোচিত হয়েছে। আর এটাই সুরা আল-হুজুরাতের শিক্ষা। যার সামাজিক বিধি-বিধান ও নীতি নৈতিকতা অনুসরণের মাধ্যমে একজন সাধারণ নাগরিক সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে যোগ্য ও উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে, যা পবিত্র কুরআনের সুরাসমূহে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান যুগেও কুরআনের নির্দেশিত মত ও রাসুলুল্লাহ সা.-এর দেখানো জীবন বিধান অনুসরণের মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনকাল ও ইসলামের পঞ্চম খলিফা খ্যাত হযরত উমর ইবন আবদুল আযিযের শাসনামলের মত একটা ন্যায়নীতি ও ইনসাফভিত্তিক সুখী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর এটা একজন নাগরিকের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে এবং তার উপর প্রবর্তিত সার্বিক দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সম্ভব।

---

১০৮. www.businessenglishdictionary.org, visited on 12.03.2018

১০৯. Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan*(New York : Praeger Publishers, 1980), p. 67

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন পরিচতি ও নাযিলের ইতিবৃত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল কুরআন পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন নাযিলের পূর্বাপর সূত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পবিত্র কুরআনের অবতরণ, কাঠামোগত পরিচয় ও বিষয়বস্তু

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন পরিচিতি ও নাযিলের ইতিবৃত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল কুরআন পরিচিতি

মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় বিশ্বজাহানের একমাত্র অধিপতি মহান আল্লাহর সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থের মত গ্রন্থ নয়। এটা মহান আল্লাহর সুমহান ভাষণ। এটা বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, মহান শিক্ষক ও কাণ্ডারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি হযরত জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অবতারিত নির্ভুল গ্রন্থ। কুরআনে এসেছে, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ‘আল-কুরআন সেই কিতাব, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকিদের জন্য সঠিক পথের দিশা।’[১] বিশ্ব মানবের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর মৌলধারা এ কিতাবে আলোচিত হয়েছে। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি ও অনুশাসন বর্ণিত হয়েছে। এটাই মানব জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার একমাত্র সঠিক ও সার্বিক দিক-নির্দেশক। এ গ্রন্থ বিশ্ব মানবতার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মান সংরক্ষণ, প্রতিপালন এবং প্রশিক্ষণের একমাত্র উৎস। সৃষ্টির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধানে স্রষ্টার অনবদ্য অবদান। এটা আল্লাহপ্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম ও বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর একান্ত নিজস্ব। অতীতের সকল নবী-রাসুলের দা‘ওয়াত ও সকল আসমানি কিতাবের সার-নির্যাস এ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এতে পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহে বর্ণিত সকল তত্ত্ব ও তথ্যের বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটেছে। আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনকে সর্বকালের, সমগ্র বিশ্বের ও সর্বজনের জীবন বিধান এবং মুক্তির সনদ হিসেবে পাঠিয়েছেন। ফলে এরপর আর কোন আসমানি কিতাব নাযিল হয়নি, হবেও না এবং হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও নেই। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ أَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ.

‘এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া আর কারও রচনা নয়। এটা এর পূর্বে যে সব আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তার সত্যায়নকারী।’[২] তাই কুরআনের আবির্ভাব ও অবতরণের পর অন্য কোনো গ্রন্থের কার্যকারিতা আর অবশিষ্ট নেই। একাধারে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব রহিত হয়ে গেছে। এ কিতাব মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সাফল্যের ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দেয়। আর যারা একে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে উভয় জগতে দূর্ভাগ্য বরণের ভীতি প্রদর্শন করে।

---

১. আল কুরআন, ২ : ২
২. আল কুরআন, ১০ : ৩৭

আল্লাহ বলেছেন, 'মহান সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দার উপর সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী কুরআন নাযিল করেছেন, যেন তিনি এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে সতর্ক ও সাবধান করতে সক্ষম হন।'[৩] এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সফলতা লাভ করা যায়। এখন এ গ্রন্থই মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী। মহান আল্লাহ কুরআন সম্বন্ধে বলেছেন, هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ 'বিশ্ব মানবতার দিশারি এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।'[৪]

আল কুরআনের পরিচয়

আল কুরআন শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্র করা, সংগ্রহ করা, পাঠ করা, অধ্যয়ন করা ও আবৃত্তি করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কুরআন বলতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আসমান থেকে ফেরেশতা জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থকে বুঝায়।

আল কুরআনের শব্দগত পরিচয় : 'আল কুরআন' (اَلْقُرْاٰنُ) আরবি শব্দ। এ শব্দটা قَرَأَ–يَقْرَأُ ওজনে বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ এর মাসদার। শব্দটা قرن মাদ্দা বা মূলধাতু থেকে উৎকলিত। قَرْنٌ অর্থ হচ্ছে– পড়া, অধ্যয়ন করা, আবৃত্তি করা, পঠিত বা আবৃত্তি, একত্রিত করা, মিলিত হওয়া বা অন্তর্ভুক্ত করা, অধিক পঠিত ইত্যাদি।[৫]

আভিধানিক পরিচয় : قُرْاٰنٌ আরবি শব্দ। قَرَأَ–يَقْرَأُ ওজনে বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ বা قَرَأَ–يَقْرَأُ ওজনে বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। فُعْلَانٌ (ফু'লানুন)-এর ওজনে قُرْاٰنٌ শব্দটা পাঠ করা তথা مَقْرُوْءٌ (পঠিত) অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, كِتَابٌ (কিতাবুন) অর্থ مَكْتُوْبٌ (মাকতুবুন) লিখিত। এর আর একটা অর্থ কোন বিষয়কে অপর একটা বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ করার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, قَرْنٌ অর্থ সংযুক্ত। এটা مَقْرُوْنٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে সংযোজিত, এজন্য একে কুরআন বলা হয়। তাছাড়া একটা হরফ অপর একটা হরফের সাথে মিলিয়ে উচ্চারণ করা হলে তাকে قِرَاءَةٌ বলা হয়। এখানে قُرْاٰنٌ কে পঠিত অর্থে গঠন করা হয়েছে।[৬] আলোচ্য মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত।[৭]

---

৩. আল কুরআন, ২৫ : ১

৪. আল কুরআন, ২ : ১৮৫

৫. আবুল ফদল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মুকাররম ইবন মানযুর আল-আফরিকি, *লিসানুল আরব*(ইরান : নাশরু আদাবিল হাওদাহ, ১৪০৫ হি.), খ.১১, পৃ. ৭৮-৭৯; ড. ইবরাহিম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসিত*(দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, তা.বি.), পৃ. ৭২২; মান্না খলিল আল কাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*(লাহোর : ইসলামিয়া কুতুবখানা, ১৯৯৭), খ.১৫, পৃ. ১৫

৬. আল্লামা জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি রহ., *আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*(মদিনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪৩৬ হি.), খ.১, পৃ. ৬৮

৭. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ লিল মালাইন, ১৯৮৫), পৃ. ১৯; ড. মুহাম্মদ বিন লুতফি আস সাব্বাগ, *লুমহাত ফি উলুমিল কুরআন*(বৈরুত : আল মাকতাব আল ইসলামি,

অভিধান বিশেষজ্ঞ আল যাজ্জাজ ও আল লিহইয়ানি এবং আলিমগণের একটা বড় দল কুরআনকে হামযাসহ قُرْاٰنٌ পাঠ করেছেন। যাজ্জাজের মতে, قُرْاٰنٌ শব্দটি قُرَّاءٌ শব্দের সমওজনের। যেমন, اَلرُّجْحَانُ، اَلْكُفْرَانُ، اَلْغُفْرَانُ ইত্যাদি এবং এটা قَرْءٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ তিলাওয়াত করা। ইমাম শাফি'ই রহ. قِرَاءَةٌ শব্দটাকে হামযা বিশিষ্ট বলেছেন।[৮]

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবন কাছির রহ., ইমাম শাফি'ই রহ., আল ফাররা ও আবুল হাসান এবং একদল বিশেষজ্ঞের মতে, কুরআন শব্দটা কোন ক্রিয়ামূল বা ধাতু কিংবা অন্য কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়নি। এটা اسم غير مشتق বা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য। তারা কুরআন শব্দটা হামযাবিহীন পড়তেন। ইমাম শাফি'ই রহ. قُرْاٰنٌ (কুরআন) কোনো শব্দ থেকে গঠিত নয় বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৯] অপর এক বর্ণনা মতে, قُرْاٰنٌ (কুরআন) শব্দটা قَرْاَةٌ (কর্আতুন) বা قُرْاٰنٌ থেকে উদ্ভূত যা مَقْرُوْءٌ (মাকরুউন) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ পঠিত বিষয় (Recited)। কেননা, পবিত্র কুরআনই পৃথিবীতে সবচেয়ে অধিক পঠিত গ্রন্থ। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল লিখিত কিতাব; কিন্তু তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় পঠিত কিতাব। আর তা হলো, হযরত জিবরাইল আ. রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে প্রত্যাদেশ পড়ে শুনাতেন।[১০]

আল কুরআন শব্দের উৎপত্তিগত পরিচয় : আল কুরআন শব্দের মূল বা উৎপত্তি বিশ্লেষণের ব্যাপারে আরবি ভাষাতত্ত্ববিদ ও তাফসিরকারদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নিচে উল্লেখযোগ্য মতামত তুলে ধরা হল :

আবুল হাসান আল-আশ'আরি ও আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে, কুরআন শব্দটা সম্পর্কে আরবদের উক্তি– قَرَاْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ (কর'তুশ শাইআ বিশ শাইয়ি) থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ আমি একটা বস্তুকে অন্য একটা বস্তুর সাথে মিলিয়ে দিয়েছি। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন হরফ, আয়াত ও সুরার মধ্যেও এরূপ মিলন পরিলক্ষিত হয়।[১১]

আবু উবাইদ, যুজায, নাহবি ও অপর এক সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদের মতে, قُرْاٰنٌ (কুরআনুন) এ শব্দটা فُعْلَانٌ (ফু'লানুন) এর ওজনে সংগঠিত। এটা আরবদের উক্তি– قَرَاْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ (করা'তুল মাআ ফিল হাওদি) অর্থাৎ, 'আমি চৌবাচ্চায় পানি একত্রিত করেছি।' এটা قَرَأَ (করাআ) ধাতু থেকে নির্গত। কারণ, কুরআন মাজিদেও সুরাগুলোকে এভাবে একত্রিত করে মিলানো লক্ষ্য করা যায়।[১২]

সং.৩, ১৯৯০), পৃ. ২৫; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলুমুল কুরআন*(রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া), খ.১, পৃ. ১০

৮. বদরুদ্দিন যারকাশি, *আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*(কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৬), খ.১, পৃ. ৩৯৪; আল্লামা জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি রহ., প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬৭

৯. আহমদ ইবন আলি খতিব বাগদাদি, *তারিখু বাগদাদ*(বৈরুত : দারু কিতাবিল 'আরাবি, ১৯৮৬), খ.২, পৃ. ৬২

১০. মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন, *তাফসীর-ই না'ইমি*(ইলাহাবাদ : মাকতাবাতুল হাবিব জামি'আ হাবিবিয়া, তা.বি.) খ.১, পৃ. ৮

১১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও অন্যান্য, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : লেকচার পাবলিকেশন্স, জুন ১৯৯৭), পৃ. ১৮৯; Edward William Lane, *Lane Arabic English Lexicon*(Bairut : Librairic du Libon, 1980), Part-7, p 2502; A.M.A Shushtury, *Out lines of Islamic culture*(Mysour : The University of Mysour, No Dated), vol. I, p. 598

১২. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া লিল মালাইন, ১৯৮৫), পৃ. ১৯; P.T. Hughes, *Dictionary of Islam*, (New Delhi : Oriental Books Corporation, reprient, 1976), p. 481

কোন কোন ভাষ্যকারের মতানুসারে, কুরআন শব্দটি আরবদের উক্তি, مَا قَرَأَتْ هٰذِهِ النَّاقَةُ سَلًى قَطُّ (মা-করাআত হাযিহিন নাকাতু সালান কাততু) হতে নির্গত। এর অর্থ উষ্ট্রীটি কখনও গর্ভপাত করেনি। অনুরূপভাবে পাঠক-পাঠিকা আপন মুখ থেকে কুরআনের শব্দ প্রকাশ করে।[১৩] মোটকথা, কুরআন মাজিদে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সারবস্তু এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে, এ জন্য একে قُرْاٰنٌ (কুরআন) বলা হয়।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানি রহ. তার 'আল-মুফরাদাত' নামক কুরআনের পরিভাষা ও বাগধারা বিষয়ক অভিধান গ্রন্থে বলেন, কুরআন শব্দটি قَرَأَ (কারাআ) ধাতু হতে উৎপন্ন। এর শাব্দিক অর্থ একত্র করা, সংগ্রহ করা। আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দের বিশ্লেষণে ইমাম রাগিব ইস্পাহানি আরও লেখেন, (قَرْءٌ) ق ر ء 'কারউন' ধাতু থেকে কুরআন শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ– একত্র করা, সন্নিবেশ করা, জমা করা। আর এর সম্প্রসারিত অর্থ অধ্যয়ন করা, আবৃত্তি করা ও পাঠ করা।[১৪]

প্রখ্যাত ব্যাকারণবিদ ফাররার মতে, اَلْقُرْاٰنُ (আল-কুরআনু) শব্দটি اَلْقَرَائِنُ (আল-কারাইনু) হতে উৎকলিত। এর অর্থ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুসমূহ। কুরআনের আয়াতসমূহেও পরস্পর একটা অপরটার সত্যতা প্রমাণ ও সাদৃশ্যতা বিধান দেখা যায়। পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মগ্রন্থের সারমর্ম ও শিক্ষা একত্রিকরণ লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সুরা, আয়াত এবং হরফেও একত্রিকরণ দেখা যায়।[১৫]

মান্না খলিল আল কাত্তানের মতে, قُرْاٰنٌ শব্দটি স্বয়ং قَرَأَ (কারাআ) (সে পড়েছে) ক্রিয়ার মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যেমন, غُفْرَانٌ (গুফরনুন– ক্ষমা করা) শব্দটি غَفَرَ (গফারা– সে ক্ষমা করেছে) ক্রিয়ার মাসদার। অর্থ– মিলানো, একত্রিকরণ। অর্থাৎ, একটা জিনিসকে অপর একটা জিনিসের সাথে মিলানো।[১৬] আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অনেক সময় ধাতু (lnfinitive) দ্বারা কর্মবাচক বিশেষ্য (Past participle)-এর অর্থ ব্যক্ত করা হয়। অতএব, قُرْاٰنٌ (কুরআনুন) 'শব্দটাও 'পাঠ করা' অর্থের স্থলে مَقْرُوْءٌ (মাকরুউন) 'পঠিত' অর্থ বুঝিয়ে থাকে।

বেশিরভাগ ভাষাবিদ ও তাফসিরকারক বলেন, আল-কুরআন এসেছে اَلْقَرْءُ (আল 'কারউ') থেকে, যার অর্থ হলো পাঠ করা। সাধারণভাবে আল-কুরআন শব্দটার মধ্যে আভিধানিক অর্থ একত্র করা, সংগ্রহ করা, পাঠ করা, আবৃত্তি করা প্রভৃতি অর্থ বিদ্যমান। তবে শব্দটা ব্যবহারগত দিক দিয়ে ইসমে মাফউল বা কর্মবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে আল-কুরআনের ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়ায় পঠিত, সংগৃহীত, একত্রিত, অধীত, লিখিত, সংযোগ, সমন্বয় প্রভৃতি। কুরআন মাজিদে ঘোষিত হয়েছে,

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

'মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাব (আল-কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে।'[১৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

---

১৩. ইবনুল মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১২৬; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলুমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৪. মাওলানা মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, *উলুমুল কুরআন*(করাচি : মাকতাবা দারুল উলুম, তা.বি.), পৃ. ১৪৭

১৫. আল্লামা জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি রহ., *আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১৬. মান্না খলিল আল কাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*(রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, সং. ৩, ১৪২১ হি.), পৃ. ১৫; সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, ৩য় মুদ্রণ, জুন ১৯৯৫), খ.১, পৃ. ৩৩৮

১৭. আল কুরআন, ৪০ : ২

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا.

'তারা কি আল-কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত.., তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।'[১৮]

বর্ণিত আছে, কুরআন শব্দটি 'কারাআ' ধাতু থেকে উদ্ভুত হয়েছে, যার অর্থ সে কিতাবসমূহের সার সংগ্রহ এবং পৃথিবীর সর্বাধিক আবৃত্তিযোগ্য গ্রন্থ যাতে মানবজীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।[১৯] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'এ কুরআন এমন গ্রন্থ নয় যা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও দ্বারা উদ্ভাবিত হতে পারে। এটা সমূদয় পূর্ববর্তী ঐশী বাণীর সমর্থনকারী এবং যে শাশ্বত ঐশীগ্রন্থ সমস্ত সংশয় সন্দেহের অতীত, বিশ্ববিধাতার পক্ষ থেকে তারই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা।"[২০]

পারিভাষিক পরিচয় : ইসলামি শারি'আতের পরিভাষায় কুরআনের সর্বজনবিদিত পরিচয় হচ্ছে নিম্নরূপ : আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ রহ. বলেন,

القراٰن هو كلام الله الذي نزل به روح الأمين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيها الحقة. الْمبدؤ بسورة الفاتحة والْمختوم بسورة الناس.

'আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, যা পবিত্র আত্মা ফেরেশতা জিবরাইল আমিন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ করেন। এর ভাষা আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সুরা ফাতিহা এবং শেষ সুরা হচ্ছে সুরা নাস। যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে অকাট্য মুতাওয়াতির বর্ণনা সূত্রে। যা অবশ্যই যাবতীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন হতে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।'[২১]

মুফতি আমিমুল ইহসানের ভাষায়, والكتاب القراٰن الْمنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه 'কুরআন মাজিদ এমন আসমানি কিতাব, যা আমাদের নেতা নবী কারিম সা.-এর উপর অবতীর্ণ, যার একটা ক্ষুদ্র সুরার মুকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম।'[২২]

মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. 'তালখিসুল মানার' গ্রন্থে বলেন, 'আল-কুরআন মহান আল্লাহর সেই অতীব পবিত্র ও সম্মানিত কালাম যা তাঁর পক্ষ হতে রাসুলুল্লাহ সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসহাফে লিখিত হয়েছে, এটা রাসুল সা. হতে আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে। আর তা হলো কুরআনের আয়াত ও এর অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম।'

আল্লামা নাদভি রহ. বলেন, 'কুরআন এমন এক ঐশী গ্রন্থ, যার মধ্যে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসুল সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।'[২৩]

আল্লামা যারকানি রহ.-এর মতে, 'কুরআন মাজিদ হলো সে কালাম সমষ্টি যা মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত, যা তিলাওয়াত করা হয় এবং যার তিলাওয়াত আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য।'[২৪] তিনি বলেন, কুরআন

---

১৮. আল-কুরআন, ৪ : ৮২

১৯. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৯৬৯), পৃ. ১১৭

২০. আল কুরআন, ১০ : ১৭

২১. ড. শাহ্ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : সোনালী সোপান প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১১), পৃ. ৩

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২৩. ড. মোঃ রহিম উল্যাহ, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : লেকচার পাবলিকেশন্স লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ২

শব্দটি 'কিরাআতুন' ধাতু হতে এসেছে। যার অর্থ পাঠ করা। আরবি ব্যাকরণের নিয়মে, এটা কর্মবাচক বিশেষ্য (Past participle) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয়– সে গ্রন্থ যা পাঠ করা হয়। অর্থাৎ, مَقْرُوْءٌ তথা পঠিত গ্রন্থ। এ কথার প্রমাণ মেলে মহান আল্লাহর বাণীতে–

لَا تُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَه. فَإِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه.

'নিশ্চয়ই কুরআন একত্র করা ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, আপনি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করুণ।'[২৫]

আল্লামা সুয়ুতি রহ. বলেন, 'কুরআন মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় মূলনীতির উৎস। আল কুরআন ইসলামের সঠিক বিধি-বিধানের স্বয়ং সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলিল।'[২৬]

আবদুল আলিম সিদ্দিকি তার 'Elementary Teaching of Islam' গ্রন্থে বলেন,

'Its verses were inspired and revealed by Allah to Prophet Mohammad (sm.) through Angel Jibreel; and they still preserved intact in their original form in Arabic language.'[২৭]

ড. সুবহি সালিহ বলেন,

هو الكلام الْمعجز الْمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الْمكتوب في الْمصاحف الْمنقول عنه بالتواتر الْمتعبد بتلاوته.

'এটা মুহাম্মদ সা.-এর উপর নাযিলকৃত এমন এক মু'জিযাপূর্ণ বাণী যা মুসহাফে লিপিবদ্ধ, তার থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত এবং যার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।'[২৮]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

'নিশ্চয়ই এ কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত; বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাইল আ. এটাকে নিয়ে এসেছেন আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন, (আর তা নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।'[২৯]

হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফি রহ. বলেন,

أما الكتاب فالقرآن الْمنزل على الرسول عليه السلام الْمكتوب في الْمصاحف الْمنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة.

---

২৪. শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল আযিম যারকানি রহ., *মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন*(বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১৯৯৫), খ.১, পৃ. ১৩, ২০, ২৪

২৫. আল কুরআন, ৭৫ : ১৬-১৮

২৬. মান্না খলিল আল কাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, প্রগুক্ত, পৃ. ১৫

২৭. ড. মোঃ রহিম উল্যাহ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২৮. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২৯. আল-কুরআন, ২৬ : ১৯২-১৯৫

'কিতাব হলো কুরআন, যা রাসুল সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, এটা মুসহাফের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আর এটা রাসুল সা. থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।'[৩০] আল-কুরআন মানবজাতির হিদায়েতের জন্য ও বিশ্ব মানবের প্রয়োজনীয় বিধানাবলী, দিক-নির্দেশনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমি আপনার উপর এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাকারী এবং মুসলিমদের জন্য পথপ্রদর্শক, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ।'[৩১] কুরআনের বাহক মহানবী সা. বলেন,

ان هذا القرآن حبل الله، والنور الْمبين، والشفاء النافع، عصمة لِمن تمسك به، ونجاة لِمن تبعه.

'আল-কুরআন আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, কল্যাণময় প্রতিষেধক। যে সাদরে সযত্নে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে সে সম্মান পাবে এবং যে অনুসরণ করবে, সে মুক্তির রাজপথ পাবে।'[৩২] যারা এ কিতাবকে গ্রহণ করে এ কিতাব তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সাফল্যের ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দেয়। আর যারা একে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে উভয় জগতে দুর্ভাগ্য বরণের ভীতি প্রদর্শন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِه لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا 'মহান সে সত্তা যিনি তাঁর বান্দার উপর সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে করে তিনি এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে সতর্ক ও সাবধান করতে সক্ষম হন।'[৩৩] কুরআনে এসেছে, 'নিশ্চয়ই এ কুরআন বিশ্ব অধিপতির নিকট থেকেই অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ। সত্যপরায়ণ ও বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাইল আ. এ বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন– আপনার হৃদয় কন্দরে যেন আপনি লোকজনকে সতর্ক করে দিতে পারেন প্রাঞ্জল আরবি ভাষার মাধ্যমে।'[৩৪] মোটকথা, কুরআন লাওহি মাহফুযে সংরক্ষিত আল্লাহর বাণী, যা মহানবী সা.-এর উপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরের নবুয়তি জীবনে আল্লাহর নিকট থেকে সন্দেহমুক্ত ও ধারাবাহিক বর্ণনায়, সহিফাসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যার একটা অক্ষর ও নুকতারও কোনো পরিবর্তন হবে না, তাই আল-কুরআন।

পরিভাষায় কুরআন বলতে বুঝায়[৩৫] 'কুরআন এমন এক কিতাব, যা রাসুল সা.-এর উপর নাযিল করা হয়েছে, যা মুসহাফে লেখা হয়েছে এবং উহা রাসুল সা. হতে সন্দেহহীনভাবে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।'[৩৬] মান্না খলিল আল-কাত্তান-এর ভাষায়,

هو كلام الله الْمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الْمتعبد بتلاوته.

'উহা আল্লাহর কালাম যা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর নাযিলকৃত, যার তিলাওয়াত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।'[৩৭] আল্লাহ তা'আলার কালাম সীমাহীন জ্ঞানের আকর। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

৩০. আল্লামা জুরজানি, *আত-তা'আরিফাত*(ইস্তাম্বুল : মাতবা'আহ আহমাদ কামিল, ১৩২৭ হি.), পৃ. ২২৩

৩১. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯

৩২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবি শাইবাহ, *আল-মুসান্নাফ*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৪), হাদিস নং ৪৩৮১, পৃ. ১৬৫

৩৩. আল-কুরআন, ২৫ : ১

৩৪. আল-কুরআন, ২৬ : ১৯২, ১৯৫

৩৫. আহমদ মোল্লা জিওন ইবন আবি সাইদ, *নুরুল আনওয়ার ফি শারহিল মানার*(দেওবন্দ : মাকতাবাহ থানবি, তা.বি.) পৃ. ৯-১১; আল্লামা জুরজানি, *আত-তা'আরিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

৩৬. মান্না' খলিল আল কাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه مَدَدًا.

'পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহপাক মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৮] কুরআন মাজিদই পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।[৩৯]

হাদিসের দৃষ্টিতে আল-কুরআন,[৪০]

كتاب الله فيه نباء ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، هو حبل الله الْمتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط الْمستقيم، وهو الذى لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا: انا سمعنا قرآنا عجبا، يهدى إلى الرشد فامنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.

ড. মুহাম্মদ ইবন লুতফি আস সাব্বাগ বলেন,

القرآن هو كلام الله الْمعجز، ووحيه الْمنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الْمكتوب في الْمصاحف، الْمنقول عنه بالتواتر الْمتعبد بتلاوته.

'কুরআন হলো আল্লাহর বাণী যা অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার অহি নবী কারিম সা.-এর উপর নাযিলকৃত যা সহিফাসমূহে লিপিবদ্ধ রাসুল সা. হতে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত। যার তিলাওয়াত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।'[৪১]

মৌলভী ফিরোজ উদ্দীন বলেন, কুরআনের শাব্দিক অর্থ কালামুল্লাহ, কালামে মাজিদ। ইহা মুযাক্কির অর্থাৎ, 'কুরআন হলো ঐ কালামে ইলাহি যা মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।"[৪২]

القرآن-ع-مذكر- كلام الله، كلام مجيد- وه كلام إلهي جو حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پر نازل هوا.

শাইখ মুহাম্মদ আবদুল আজিম যারকানি রহ. বলেন,

إن القرآن كلام الله وإن كلام الله غير كلام البشر، ما في ذلك ريب.

'নিঃসন্দেহে কুরআন বলা হয়, আল্লাহর কালামকে। আর আল্লাহর কালাম সেটা, যেটা মানুষের কালাম নয়; যার মাঝে কোন সন্দেহ নেই।' তিনি আরও বলেন, القرآن الكتاب الذي يعتقد الْمسلمون أنه أنزل على

---

৩৭. মান্না' খলিল আল কাত্তান, *মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩৮. আল কুরআন, ১৮ : ১০৯

৩৯. মানবজাতির হিদায়াত ও দিক নির্দেশনার জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে যতগুলো গ্রন্থ পেয়েছে তন্মধ্যে আল-কুরআনের স্থান অন্যন্য। এ মহাবিশ্বে এমন কোন দ্বিতীয় গ্রন্থ নেই, যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তিলাওয়াত করে। একবার নয়; বার-বার। বুঝে পড়ে, আর না বুঝে আরও বেশি পড়ে। দ্র. দৈনিক যুগান্তর, (ঢাকা : দৈনিক যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর, ২০০১), ২য় বর্ষ, সংখ্যা-৩১২, পৃ. ১৫; মুহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, *মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, অনুবাদ ও তাফসীর*(ঢাকা : মাসিক মদীনা, অক্টোবর ২০০২), বর্ষ ৩৮, সংখ্যা-৭ম, পৃ. ২; P.K. Hitty, *History of the Arabs*(London : Macmilan st Martins Press, 10th ed., January 1970), p. 120; Shamsul Alom, *Islamic Thought*(Dhaka : IFB, August 1986), p. 11

৪০. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৫, হাদিস নং ২৯০৮, পৃ. ২৬৫-২৬৬

৪১. ড. মুহাম্মদ ইবন লুতফি আস-সাব্বাগ, *লুমহাত ফি উলুমিল কুরআন ওয়া ইত্তেজাহাতিত তাফসির*(বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪১০ হি.), খ.৩, পৃ. ১২৫

৪২. মৌলভী ফিরোজ উদ্দীন, *ফিরোজুল লুগাত*(করাচি : জে.এস. সুন্নাত সংঘ এন্ড সন্স, ১৯৮২), পৃ. ৭১৬

نبيهم ‘কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার কালাম যা তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে।’[৪৩]

লুইস মা’লোফ বলেন, القرآن الكتاب الذي يعتقد الْمسلمون أنه أنزل على نبيهم ‘কুরআন হচ্ছে ঐ কিতাব যে কিতাব সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা যে এটা তাদের নবীর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।’[৪৪]

আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদি আল বারাকাতি রহ. বলেন, القراٰن هو الكتاب الْمنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه ‘কুরআন হলো এমন এক আসমানি কিতাব যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যার একটা সুরাই মু‘জিযার জন্য যথেষ্ট।’[৪৫]

ইংরেজি অভিধানের দৃষ্টিতে, ‘The Holy Quran containing the Divine Revelation to prophet Muhammad (sm.)’[৪৬] আল-কুরআন আল্লাহর কালাম, মুসলিমগণের পবিত্র গ্রন্থ। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ অহি, যাতে সুনির্দিষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৪৭] মূলত, আল-কুরআন মুসলিমগণের নিকট শুধু পবিত্র গ্রন্থই নয়; বরং মহত্তর আরও কিছু। এটা আমাদের সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পথ প্রদর্শক।[৪৮]

T.P Hughes কুরআনের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, ‘The word ‘Qur’an’ is derived from the Arabic Qara; meaning read and secite.’[৪৯] আল-কুরআন এমনই এক ঐশী মহাগ্রন্থ যা পাঠ বা তিলাওয়াত করার পূর্বে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হয়। আর এ মহাগ্রন্থ সংরক্ষেণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহপাকের নিজ কুদরতের উপর নির্ভরশীল। অন্য কোন কিতাবের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মহান আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাও।’[৫০] অনুরূপভাবে কুরআনে আল্লাহ বলেন, ‘এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি এটা তিলাওয়াত করি, তখন তুমি পাঠের অনুসরণ কর।’[৫১]

‘আল্লামা সাবুনি রহ. আল কুরআনের সংজ্ঞায় বলেন,

---

৪৩. শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল আযিম যারকানি, *মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৪৪. লুইস মা’লোফ, *আল মুনজিদ*(বৈরুত : আল মাতবা আল কাসুলিকিয়া, সং. ১৫, ১৯৫৬), পৃ. ১১৮

৪৫. আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহসান, *আত তানবির ফি উসুলিত তাফসির*(ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯), পৃ. ৪

৪৬. Mohammad Ali, *Bengali-English Dictionary*(Dhaka : Bangla Academy, reprient, January 2010), p. 142; James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*(New York : Charlers Seribner’s sons, December 1965), vol.10, p. 538

৪৭. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা., ৩য় মুদ্রণ, জুন ১৯৯৫), খ.১, পৃ. ৩৩০

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

৪৯. T.P Hughes, *Dictionary of Islam*(New Delhi : Oriental Books Corporation, reprint, 1976), p. 483

৫০. আল-কুরআন, ১৬ : ৯৮

৫১. আল-কুরআন, ৭৫ : ১৭-১৮

هو كلام الله الْمعجز الْمنزل على خاتم الأنبياء والْمرسلين بواسطة الأمين جبرائيل عليه السلام، الْمكتوب في الْمصاحف، الْمنقول أُلينا بالتواتر، الْمبدأ بسورة الفاتحة، الْمختوم بسورة الناس.

'কুরআন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহর কালাম, যা সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ সা.-এর উপর হযরত জিবরাইল আমিন আ.-এর মাধ্যমে অবতারিত যা সহিফাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। মুতাওয়াতির সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণিত যা সুরা ফাতিহার মাধ্যমে সূচনা এবং সুরা নাসের মাধ্যমে সমাপ্ত।[৫২] প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক লিও টলস্টয় বলেন, 'কুরআন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিকদর্শন। পৃথিবীর সামনে যদি এ একটামাত্র গ্রন্থ থাকত, আর কোন সংস্কারক না আসত, তবুও মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য এটাই ছিল যথেষ্ট।'[৫৩]

মোটকথা, কুরআন হলো মহান আল্লাহ তা'আলার এমন কালাম, যা মানুষের মনোজগতে সুপরিচিত অথবা ইন্দ্রীয় দ্বারা পরিগ্রাহ্য। যা লিপিবদ্ধরূপে কিংবা মুখে পঠিত অবস্থায় ইঙ্গিত করে বুঝানো যায়। এটাই আল্লাহর কালাম আল কুরআন।

هو كلام الله تعالى الْمعهود في الذهن أو الْمشاهد بالحسن كما يشار إليه مكتوبا في الْمصحف أو مقرونا بأساس.

সুরার পরিচয় : সুরা (سورة) শব্দটি একবচন; বহুবচনে (سور) (সুওয়ারুন)। আভিধানিক অর্থ হলো– দীর্ঘ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, উচ্চতম অবস্থানস্থল ও মর্যাদা। সুরার পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে তানবির গ্রন্থকার বলেন,

السورة الطائفة من القرآن الْمسماة باسم خاص توقيفا وأقلها ثلث أيات.

'সুরা হলো আল কুরআনের এক একটা অংশবিশেষ, যা নির্দিষ্ট নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন আয়াত, আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো ২৮৬ আয়াত।'[৫৪] যেমন, সুরা আল কাউছার, সুরা আল বাকারা ইত্যাদি। কুরআনের সুরা সংখ্যা ১১৪।

আয়াতের পরিচয় : আয়াত (اَلْأَيَةُ) শব্দটা একবচন। বহুবচনে (اَيَاتٌ) এর আভিধানিক অর্থ হলো– চিহ্ন ও নিদর্শন, শিক্ষা, তাৎপর্য, উপদেশ, মু'জিযাহ। আয়াতের পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে, মুফতি আমিমুল ইহসান রহ. বলেছেন,

الأية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل.

'কুরআন মাজিদের বাক্যসমূহকে আয়াত বলা হয়, যাকে বিশেষ বিরাম চিহ্ন দ্বারা অপর বাক্য হতে পৃথক করা হয়েছে।'[৫৫]

---

৫২. আল্লামা সাবুনি, *আত তিবইয়ান ফি উলুমিল কুরআন*(দামিশক : মাকতাবাতুল গাযযালি, ২য় সং., ১৯৮১), পৃ. ৬

৫৩. লিও টলস্টয় ১৮২৮ সালে মস্কো থেকে ১৫০ মাইল দুরে ইয়াসনায়া পলিয়ানা গ্রামের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলাতেই তিনি পিতামাতাকে হারান। ১৮৪৪ সালে লিও টলস্টয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি প্রথমে প্রাচ্য ভাষাসমূহে এবং পরে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৮৫১ সালে তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। অতঃপর 'শৈশব' নামে রচনার মধ্য দিয়ে তার সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিবিদ ও জনদরদি লেখক ছিলেন। তার লেখায় কৃষকদের অধিকারের বিষয়টা ফুটে উঠেছে। 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আনাকারেনিনা', 'পুনরুত্থান' তার বিখ্যাত তিনটা উপন্যাস ও শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৯১০ সালে একটা রেলওয়ে স্টেশনে ৮২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *লিও টলস্টয় অনেক প্রসঙ্গের কয়েকটি*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৪-৬, ১০

৫৪. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

আয়াত ও আয়াতের প্রকারভেদ : আয়াত শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিদর্শন। পরিভাষায় আয়াত হচ্ছে, আল-কুরআনের একটি অংশ যা তার পূর্বের অংশ ও পরের অংশ থেকে পৃথক এবং সুরার অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত। হুকুমের দিক থেকে আয়াত তিন প্রকার। যথা, (১) হালাল, (২) হারাম ও (৩) আমছাল। আর শব্দের দিক থেকে আয়াত দুই প্রকার। (১) মুহকামাত ও (২) মুতাশাবিহাত । হাদিসে এসেছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا الحلال وحرموا الحرام وأعملوا بالْمحكم وأمنوا بالْمتشابه وأعتبروا بالأمثال.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল কুরআনে পাঁচ প্রকার আয়াত নাযিল হয়েছে– (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকামাত, (৪) মুতাশাবিহাত, ও (৫) পূর্বের জাতির দৃষ্টান্ত। তোমরা হালালকে হালাল জান, হারাম থেকে দূরে থাক, মুহকাম আয়াত অনুযায়ী আমল কর, মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রতি ইমান রাখ এবং পূর্বের জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ কর।'[৫৬]

শ্রেণিভেদ : কুরআনের সুরা ও আয়াতগুলো অবতরণের দিক দিয়ে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা :

(ক) মাক্কি : যা মহানবী সা.-এর হিজরতের পূর্বে ১৩ বছরের মাক্কি জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(খ) মাদানি : যা মহানবী সা.-এর হিজরতের পর ১০ বছরের মাদানি জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি : আল-কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহ বর্ণনার দিক থেকে দু'ধরনের। যথা–

(ক) এমন কিছু আয়াত যেগুলো কোনো উপলক্ষ ব্যতীত বর্ণনামূলকভাবে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। যাতে কোন ঘটনা বা প্রেক্ষাপট অথবা কোন প্রশ্নের জবাব দানের জন্য নয়।

(খ) এমন আয়াতসমূহ, যা কোন অবস্থা, প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোন সমস্যাকে সামনে রেখে আল্লাহ তার সমাধানকল্পে নাযিল করেছেন। এ ধরনের অবস্থা প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে ঐ আয়াতের বা অংশের শানে নুযুল বা ঐতিহাসিক পটভূমি বলা হয়।

শানে নুযুল : কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষাপট বা অন্তর্নিহিত কারণকে শানে নুযুল বলা হয়। এর শাব্দিক বিশ্লেষণ হচ্ছে, 'শান' ও 'নুযুল'। এ শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো যথাক্রমে কারণ ও অবতীর্ণ। 'শান' শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা ও পটভূমি। আর 'নুযুল' অর্থ নেমে আসা, অবতরণ। অতএব, শানে নুযুল অর্থ অবতরণের কারণ বা পটভূমি। অভিধানে অবস্থা, উপলক্ষ, প্রেক্ষিত, পারিপার্শ্বিকতা অর্থেও শান শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং অবতরণের হেতু, বিশেষ ঘটনা, প্রেক্ষাপট বা উপলক্ষই হলো শানে নুযুল। একে 'সাবাবে নুযুল'ও বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায়, আল-কুরআনের সুরা বা আয়াত নাযিলের কারণ বা পটভূমিকে শানে নুযুল বলা হয়। কুরআন মাজিদ নবী কারিম সা.-এর উপর এক সাথে নাযিল হয়নি। বরং বিভিন্ন প্রয়োজন উপলক্ষে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। কোনো ঘটনার বিধান বর্ণনায় কিংবা কোন সমস্যার সমাধানে কুরআনের অংশবিশেষ নাযিল হত। তাফসিরকারদের মতে, যে ঘটনা বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে আল-কুরআনের আয়াত বা সুরা নাযিল হত সে ঘটনা বা অবস্থাকে ঐ আয়াত বা সুরার শানে নুযুল বলা হয়। যেমন, হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র

---

৫৫. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫৬. মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী, *বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদিস সংকলন*-১(ঢাকা : পিস পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০১৩), পৃ. ৭৫

করে নাযিল হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।'[৫৭] এছাড়া রাসুলুল্লাহ সা.-এর শিশুপুত্র ইন্তিকাল করলে কাফিররা তাকে 'আবতার' বা নির্বংশ বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগলে এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-কে সান্তনা দিয়ে সুরা আল কাউছার নাযিল করেন। অতএব, মহানবী সা.-এর প্রতি কাফিরদের উপহাস করার ঘটনাটা সুরা আল কাউছারের শানে নুযুল হিসেবে পরিচিত।[৫৮] মুফাসসিরগণ কুরআন নাযিলের এ বিচিত্র ঘটনা ও নেপথ্য কারণকেই অভিহিত করেছেন শানে নুযুল হিসেবে। শানে নুযুল জানার অনেক উপকারিতা রয়েছে। শানে নুযুলের মাধ্যমে শারি'আতের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়। আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ অবগত হওয়া যায়।

বস্তুত কুরআন লাওহি মাহফুযে সংরক্ষিত আল্লাহর কালাম যা ফেরেশতা জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে মহানবী সা. এর উপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরের নবুয়াতি জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে, যা সহিফাসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যার একটা হরফ ও নুকতারও কোন পরিবর্তন হবে না।

---

৫৭. আল কুরআন, ৪৮ : ১

৫৮. আল কুরআন, ১০৮ : ৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন নাযিলের পূর্বাপর সূত্র

একটা মহৎ ও সর্বজনীন উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং মানুষ নামের এ বান্দার মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাঁরই আনুগত্যের ধারা প্রবাহিত করতে চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে আদিপিতা হযরত আদম আ. ও আদিমাতা হাওয়াকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ করে দেন এবং পৃথিবীব্যাপী মানব সমাজের বিস্তৃতি ঘটান। কালক্রমে পৃথিবীর সে মানুষগুলোর অন্তিম পর্যায়ে নিমজ্জিত হয়ে কুপ্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়া এবং বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে স্বযত্নে উদ্ধার করার জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মাদ সা.-কে ধরণীতে পদার্পণ করান। আর সমগ্র মানবজাতির কল্যাণেই ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য মহানবী সা.-এর মাধ্যমে কাঙ্খিত, বিনয়ী, আনুগত্যকারী ও কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে 'আশরাফুল মাখলুকাত' মানবকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে শান্তির রাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর তাঁরই মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাকে মুক্তির স্বাদ আহরণের জন্য মনোনীত করে পবিত্র ঐশী বাণী কুরআনুল কারিম মানবতার জীবন দর্পণ ও কাঙ্খিত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পাঠিয়েছেন। নিম্নে কুরআন নাযিলের পূর্বাপর সূত্রসহ রাসূল সা.-এর আগমনের পূর্বাবস্থা ও আবশ্যকতা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

কুরআন নাযিলের পূর্বাপর সূত্র

রাসুল সা.-এর আগমনের পূর্বাবস্থা : খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম, প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ ও সেসবের বিধিবিধান শিশুদের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল এবং বিকৃতির পতাকাবাহী, মুনাফিক, খোদাভীতিহীন ও বিবেকবঞ্চিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থের লক্ষ্যে এবং কালের কুটিল চক্রান্ত ও বিপর্যয়ের এমন শিকারে পরিণত হয়েছিল যে, সেসবের আসল রূপ চিনে নেয়া কষ্টকরই নয়; বরং অসম্ভব ছিল। যদি ঐসব ধর্মের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা, পতাকাবাহী ও তাদের সম্মানিত নবীগণ পুনরায় ফিরে এসে এ অবস্থা দেখতেন, তবে তারা তাদের রেখে যাওয়া ধর্মকে নিজেরাই চিনতে পারতেন না এবং ঐসব ধর্মের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার জন্য কখনো প্রস্তুত হতেন না। ইয়াহুদি ধর্ম ছিল কতকগুলো নিষ্প্রাণ রীতিনীতি ও কিংবদন্তীর সমাহার।[৫৯] যার মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল না। এতদ্ভিন্ন ইয়াহুদি ধর্ম ছিল স্বয়ং একটি বংশীয় ও সম্প্রদায়গত ধর্ম।

তাদের বহু অভ্যাস শিরকযুক্ত, পৌত্তলিক ও জাহিলি গালগল্প তথা কিংবদন্তী গ্রহণ করে, Jewish Encyclopaedia-এর নিবন্ধকার লিখেছেন, 'মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে নবীদের ক্রোধ ও কুপিত হওয়া থেকে একথা প্রকাশ পায় যে, দেবতাদের পূজা-অর্চনা ইসরাইলি জনসাধারণের অন্তর-রাজ্যে আসন গেড়ে বসেছিল এবং কল্পনা পূজা ও যাদুর মাধ্যমে বহু শিরকমিশ্রিত ধ্যান-ধারণা ও রসম-রেওয়াজ পুনর্বার

---

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৭), খ.২, পৃ. ৩০৯-৩১০

জনগণ গ্রহণ করেছিল।'[৬০] আর খ্রিস্টবাদ তার জন্ম ও বিকাশের প্রথম প্রভাতেই চরমপন্থীদের সৃষ্ট বিকৃতি, মূর্খ-জাহিলদের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রোমক খ্রিস্টানদের পৌত্তলিকতার শিকার হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইসা আ.-এর সহজ-সরল তথা অনাড়ম্বর ও পবিত্র শিক্ষামালা ঐ সমস্ত ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ব্যাবিলনের তালমুদ[৬১] এমন সব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর নমুনা দ্বারা পূর্ণ যদ্দৃষ্টে ঐ শতাব্দীতে ইয়াহুদি সমাজের চেতনা ও উপলব্ধিগত অধঃপতন এবং ধর্মীয় রুচি বিকৃতির পূর্ণ পরিমাপ করা যায়।[৬২]

চতুর্থ শতাব্দীর শেষে খ্রিস্টান সমাজে ত্রিত্ববাদের আকিদা-বিশ্বাস অনুপ্রবেশ করেছিল। একজন খ্রিস্টান মণীষী লিখেছেন, 'এক আল্লাহ তিনটা মৌলিক বস্তুর সংমিশ্রণ। এ বিশ্বাস খ্রিস্টান বিশ্বের গোটা যিন্দেগি ও চিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ করেছিল এবং দীর্ঘকাল যাবত সরকারি ও স্বীকৃত আকিদা-বিশ্বাস হিসেবে, যা গোটা খ্রিস্টান বিশ্ব মান্য করত।'[৬৩] একজন সমসাময়িক খ্রিস্টান ঐতিহাসিক খ্রিস্টান সমাজে পৌত্তলিকতার সূচনা এবং নিত্য-নতুন কলাকৌশল সম্পর্কে তার 'The History of Christianity in the Light of Modern Knowledge' নামক গ্রন্থে বলেন, 'পৌত্তলিকতা শেষ হল বটে কিন্তু একেবারে ধ্বংস হল না, বরং তা আত্মস্থ করে নেয়া হল। প্রায় সবকিছুই, যা পৌত্তলিকতার মধ্যে ছিল, তা খ্রিস্ট ধর্মের নামে চলতে লাগল। এমন কি ৪০০ খৃ. পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে সূর্য দেবতার প্রাচীন উৎসব যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনের রূপ পরিগ্রহ করল।' খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে সিরিয়া ও ইরাকের খ্রিস্টান এবং মিসরের খ্রিস্টানদের যুদ্ধ পূর্ণ শক্তিতে চলছিল।'[৬৪] মাজুসিরা (ইরানের পার্শি সম্প্রদায়) প্রাচীনকাল থেকে সৃষ্টির মৌলিক উপাদান চতুষ্টয়ের বৃহত্তম উপাদান অগ্নির পূজা করত। অগ্নিপূজা ও সূর্যকে পবিত্র জ্ঞান করা ছাড়া আর সব দর্শন ও ধর্মবিশ্বাস সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একজন অগ্নিউপাসক ও একজন বেদীন, বিবেকহীন ও অপদার্থের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না।'[৬৫]

'সাসানি আমলে ইরান' গ্রন্থের লেখক আর্থার ক্রিষ্টিনসেন লিখেছেন, 'সরকারি কর্মচারীদের জন্য দিনে চারবার সূর্য পূজা করা আবশ্যিক কর্তব্য ছিল। চন্দ্রপূজা, অগ্নিপূজা ও পানিপূজা ছিল এর অতিরিক্ত।

---

৬০. Board of Editors, *The Jewish Encyclopedia*(Lonadon : Funk and Wagnalls Company, 1901), vol xii, pp. 568-569

৬১. তালমুদ অর্থ ইয়াহুদিদের ধর্ম ও আদব-কায়দা শিক্ষার গ্রন্থ। এটা প্রকৃতপক্ষে ইয়াহুদি পণ্ডিতদের শারি'আত গ্রন্থ 'আল-মুশান্না'-এর টীকা-ভাষ্যের সংকলন যা বিভিন্ন যুগে প্রচলিত ছিল, যাকে ইয়াহুদিদের মধ্যে সীমাতিরিক্ত পবিত্র জ্ঞান করা হত এবং কোন কোন মুহূর্তে তাওরাতের উপরও একে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৬২. ড. রোহলিঙ্গ, '*তালমুদের আলোকে ইয়াহুদি সম্প্রদায়*' ও ড. ইউসুফ হান্নাকৃত এর আরবি অনুবাদ الكنز المرصود في قواعد التلمود।

৬৩. Board of Editors, *New Catholic Encyclopedia*(Washington : The Catholic University of America Press, 2003), vol.12, p. 195

৬৪. Alfred Joshua Butler, *Arab's Conquest of Egypt and the last Thirty years of Roman Dominion*(Oxford : Nabu Press, July 2010), pp. 44-45

৬৫. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, অনূ. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, *নবীয়ে রহমত সা.*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০০৭), পৃ. ৪৮

শয়ন, জাগরণ, গোসল, পৈতা পরিধান, খানাপিনা, মোটকথা সকল কাজের জন্যই মন্ত্র ছিল।'[৬৬] ইরানের শেষ সম্রাট ইয়াযদাগির্দ একবার সূর্যের কসম খেয়ে একথা বলেছিলেন, 'আমি সূর্যের কসম খাচ্ছি যিনি সবচেয়ে বড় উপাস্য।' তিনি সেসব খ্রিস্টানকে, যারা খ্রিস্ট ধর্ম থেকে তাওবা করেছিল, বাধ্য করেছিলেন তাদের ধর্মনিষ্ঠা প্রমাণের জন্য সূর্যের পূজা করতে।[৬৭] ইরানের লোকেরা সর্বকালে ও সর্বযুগেই দ্বিত্ববাদের শিকার ছিল অর্থাৎ তারা দুই খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল।[৬৮] বৌদ্ধ ধর্ম, যা ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছিল, তাও একটি পৌত্তলিক ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। মূর্তি বৌদ্ধ ধর্মের লাগাম ধরে পথ চলছিল। যেখানেই তাদের কাফিলা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ছাউনি ফেলত সেখানেই গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা হত এবং দেখতে না দেখতেই একটি উপাসনাগৃহ তৈরি হয়ে যেত।[৬৯] আর হিন্দু ধর্ম ছিল দেবদেবীর আধিক্যের ক্ষেত্রে অপরাপর ধর্মের তুলনায় অনেক অগ্রসর।

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মূর্তি পূজার ছিল রমরমা রাজত্ব। মোটের উপর প্রতিটি বৃহৎ কিংবা ভয়াবহ বা উপকারী বস্তুই ছিল উপাস্য দেবতা। মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরি বিদ্যা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল।[৭০] একজন হিন্দু মণীষী লিখেছেন, 'এ যুগে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধমত উভয়ই সমভাবে পৌত্তলিক ছিল, বরং খুব সম্ভব পৌত্তলিকতার দিক দিয়ে বৌদ্ধমত হিন্দু ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে তা এতটা উন্নতি করতে সক্ষম হয় যে, প্রাচ্য ভাষাগুলোতে বুদ্ধের নাম পৌত্তলিকতার সমর্থকে পরিণত হয়।"[৭১] আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী পৌত্তলিকতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। খ্রিস্ট ধর্ম, সেমিটিক ধর্মসমূহ, বৌদ্ধ ধর্ম মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনে একে অপরকে অতিক্রম করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।[৭২] আরো একজন হিন্দু মণীষী তার Popular Hinduism : The Religion of the Masses নামক গ্রন্থে বলেন, 'খোদা তৈরির কর্ম-কৌশল এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, বরং বিভিন্ন যুগে এ খোদায়ি একাডেমি বা কাউন্সিল এত বিরাট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে, তার পরিমাপ করাই কঠিন।'[৭৩]

আরবরা প্রাচীন কালে ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মমতের ধারক-বাহক ছিল। কিন্তু নবুওয়াত ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সঙ্গে কালের দূরত্বের কারণে তারা খুবই নিম্নস্তরের পৌত্তলিকতার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং এক আল্লাহর পরিবর্তে বহু উপাস্য দেবতায় তারা বিশ্বাস করত। গোটা আরব জাতি পৌত্তলিকতার মধ্যে

---

৬৬. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, অনূ. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, *নবীয়ে রহমত সা.*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৬৭. আর্থার ক্রিস্টিনসেন, *সাসানি আমলে ইরান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৬৮. প্রাগুক্ত।

৬৯. অধ্যাপক ঈশ্বরী টোপা, '*হিন্দুস্তানী তামাদ্দুন*', উর্দু অনুবাদ, *তাহযিব হিন্দ*(হায়দরাবাদ : হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৯৪), পৃ. ২০৯

৭০. L.S.S O'Malley, *Popular Hinduism –The Religion of the Masses*(Cambridge : Cambridge University Press, 1935), পৃ. ৬-৭

৭১. C.V. Vaidya, *History of Medieval Hindu India*(Puna : The Oriental Book Supplying Agency, 1921), vol. I, pp. 606-648

৭২. C.V. Vaidya, *History of Medieval Hindu India*, ibid, vol. I, p. 101

৭৩. L.S.S O` Malley. C.I.F. ICS. *Popular Hinduism : The Religion of the Masses*(Cambridge : Cambridge University Press, 1935), pp. 6-7

আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটা গোত্র ও প্রতিটা এলাকার পৃথক উপাস্য দেবতা ছিল।[৭৪] স্বয়ং কা'বা শরিফের অভ্যন্তরে ও এর প্রাঙ্গণে, তিন শত ষাটটা মূর্তি স্থান পেয়েছিল।[৭৫] তারা মূর্তি ও দেব-দেবির পূজা অর্চনা থেকে অগ্রসর হয়ে শেষাবধি সব ধরনের পাথরকেই পূজা করতে শুরু করেছিল। তারা ফেরেশতা, জিন ও তারকারাজিকেও তাদের উপাস্য জ্ঞান করত।[৭৬]

এক নজরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠী : এ ছিল সেসব ধর্মের অবস্থা যা আপন আপন যুগে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর জন্য পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিল। যেসব দেশ সুসভ্য হিসেবে পরিচিত ছিল ও শিল্প-সাহিত্যের সরব চর্চা ছিল এবং যেসব দেশকে সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র মনে করা হত, সেসব দেশে ধর্মের অবয়ব ছিল একেবারেই বিকৃত। সেসব ধর্ম আপন মৌল সত্তা, মূল ও মর্যাদা, শক্তি ও কল্যাণকামিতা খুইয়ে বসেছিল।

প্রাচ্যের রোমক সাম্রাজ্য : প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যে[৭৭] ট্যাক্সের বোঝা এতই দুর্বহ হয়ে পড়েছিল যে, দেশের গণমানুষ আপন হুকুমতের মুকাবিলায় বিদেশী শাসনকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করেছিল। বারবার বিপ্লব ও বিদ্রোহ দেখা দিত।[৭৮] তাদের রাত-দিনের বড় ভাবনা ও আকর্ষণই ছিল সম্পদ অর্জন এবং বিলাসী জীবন-যাপনে ব্যয় করা। ক্রীড়া-কৌতুক ও চিত্তবিনোদনের মাঝে তারা এত দূর অগ্রসর হয়েছিল যে, তা অন্ধত্ব ও বর্বরতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।[৭৯] Civilization : Past and Present নামক গ্রন্থের লেখকবৃন্দ সমাজের নৈতিক অরাজকতা ও চারিত্রিক বিপর্যয় সম্পর্কে লিখেছেন, 'বাইযান্টাইনীয় সমাজ জীবনে বিরাট বৈপরীত্য পাওয়া যেত। ধর্মীয় ঝোঁক তাদের মন-মস্তিষ্কে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। দুনিয়া বর্জন ও বৈরাগ্যবাদ সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। তাদের বিশিষ্ট লোকদের (Elites) জীবনে ছিল আনন্দ-আয়েশ, ষড়যন্ত্র, লৌকিকতা ও যাবতীয় মন্দের জগাখিচুড়ি।[৮০] মিশর ছিল বিরাট ধর্মীয় নিপীড়ন ও নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক জোর-জবরদস্তির শিকার।[৮১]

সিরিয়া ছিল বাইযান্টাইন সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রদেশ। এখানে বিভিন্ন রকম যুলুম-নির্যাতন, অধিকার হরণ, লোকদের ক্রীতদাসে পরিণত করা এবং বেগার শ্রমদানে বাধ্য করা ছিল সাধারণ রেওয়াজ।[৮২] একজন

---

৭৪. ইবনুল কালবি, *কিতাবুল আসনাম*(কায়রো : মাতবাআ' দারুল কুতুব আল মিসরিয়া, ১৯৯৫), পৃ. ৪৪

৭৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর ২০১৬), খ.৭, হাদিস নং ৩৯৫৮, পৃ. ১৪০

৭৬. ইবনুল কালবি, *কিতাবুল আসনাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৭৭. প্রাচ্যের রোমক সাম্রাজ্যের উল্লেখ্য ইতিহাসে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামেই করা হয়েছে। আরবরা একে রোম বলে। সে যুগে উল্লিখিত সাম্রাজের অধীনে গ্রীস, বলকান, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, গোটা রোম সমুদ্র এলাকা ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ছিল। ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে এর সূচনা এবং ১৪৫৩ খিস্টাব্দে এর সমাপ্তি।

৭৮. Board of Editors, *Encyclopedia Britannica*(Cambridge : Cambridge University Press, ed.11, 1911), vol. XXV, p. 514

৭৯. Edward Gibbon, *Decline and Fall of the Roman Empire*(London : The Laibrery of Congress, 1800), vol. I, p.135

৮০. T. Walter Wall Bank and Alastar M. Taylor, *Civilization : Past and Present*(New York : Oxford University Press, 2002), pp. 261-262

৮১. Alfred Joshua Butler, *Arab's Conquest of Egypt and the last Thirty years of Roman Dominion*(Oxford : Nabu Press, July 2010), p. vii

৮২. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *খুতাতুশ শাম*(দামিশক : মাকতাবা আন নুরি, ১৯৮৩), খ.১, পৃ. ১০১

ঐতিহাসিক Victor বলেন, 'রোম সম্রাট কাইসারকে উপাস্য মনে করা হত। বিষয়টি মৌরছি ও পারিবারিকভাবে ছিল না, বরং যিনিই সিংহাসন ও রাজমুকুটের মালিক হতেন তাকেই খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হত।'[৮৩]

পারসিক সাম্রাজ্য : ইরানের প্রাচীনতম ধর্ম মাযদাইয়াত ধর্মের স্থান দখল করল যরদশ্ত ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যরদশ্ত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। যরথুস্ত্র ধর্ম প্রথম দিন থেকেই আলো ও অন্ধকার, ভাল ও মন্দের সংঘাত-সংঘর্ষের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দীতে 'মানি' নামক একজন দার্শনিক এ ধর্মের সংস্কারক হিসেবে আবির্ভূত হন।[৮৪] তারা যত রকমের চোগলখোরি ও শয়তানিতে সিদ্ধহস্ত, গালিগালাজ ও অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারে পটু এবং অপরের দোষারোপ করতে উস্তাদ ছিল। আর্থার ক্রিস্টিনসেন তার 'সাসানি আমলে ইরান' নামক গ্রন্থে বলেন, ফল এ দাঁড়াল যে, চতুর্দিকে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। লুটতরাজকারীরা আমির-উমরার বাড়িঘরে ঢুকে পড়ত ও মাল-মাত্তা লুট করে নিয়ে যেত। মেয়েদেরকে জোর করে ছিনিয়ে নিত এবং জমি-জায়গা দখল করে নিত।

ভারতবর্ষ : ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতবর্ষ ধর্মীয়, নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক দিকের অন্ধকারতম ও নিকৃষ্টতম যুগ খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শুরু হয়।[৮৫] অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তাদের উপসনাগৃহ পর্যন্ত মুক্ত ছিল না। কেননা ধর্ম একে পবিত্র ও উপাসনার রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছিল। নারীর কোন মূল্য, সম্মান-মর্যাদা ও সতীত্ব-সম্ভ্রম অবশিষ্ট ছিল না। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় সহমরণে যাওয়ার প্রথা উচ্চ ও সচ্ছল পরিবারগুলোতে প্রচলিত ছিল।[৮৬] ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশী ও পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলোর মধ্যে শ্রেণিগত বৈষম্য এবং মানুষের মধ্যে জাতপাত ও ভেদ-বৈষম্যের ক্ষেত্রে ছিল অনেক অগ্রসর। এ ছিল এক কঠিন ও নির্দয় সমাজ ব্যবস্থা যেখানে দয়ামায়া ও কোমলতার কোন স্থান ছিল না। এ জীবন-সংহিতা তথা সংবিধান[৮৭] ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল। যথা : (১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য ও (৪) অচ্ছ্যুৎ বা শূদ্র সম্প্রদায়। এ শেষোক্ত শ্রেণিটাই ছিল অধঃপতনের চূড়ান্ত ধাপে উপনীত।

এ সংবিধান ব্রাহ্মণদের এত বেশি অধিকার ও উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছিল যে, আকাশ-পাতাল নিজেদের হাজারো পাপ ও কু-কর্মে ত্রিভূবন কলূষিত করলেও তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেত না। এর বিপরীতে শূদ্র কিংবা অস্পৃশ্যদের উপার্জনের বা ধর্মগ্রন্থ পাঠেরও অধিকার ছিল না।[৮৮] গোটা দেশ ছিল অরাজকতা, বিশৃঙ্খলার অশান্তি ও অব্যবস্থাপনা এবং প্রজাদের পক্ষ থেকে বেপরোয়া মনোভাব ছিল সর্বত্র, ব্যাপক ছিল যুলুম-নিপীড়নের রাজত্ব। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক বিদ্যাধর মহাজন নামক একজন

---

৮৩. G. B. Niebuhr, *The History of Rome*(Chestnut Street : Jame, Kay, Jun. & Brother, 1928), p. 418

৮৪. আর্থার ক্রিস্টিনসেন, *সাসানি আমলে ইরান*, মানি ও তার ধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৬৯

৮৫. Romesh Chunder Dutt, *Ancient India*(London : Longmans, Green & Co., 1904), vol. 3, p. 425

৮৬. ফরাসি পর্যটক বার্নেয়ার-এর সফরনামা। অধিকন্তু মধ্যযুগের রাজন্যবর্গের ইতিহাস।

৮৭. *মনু-সংহিতা* অধ্যায়-১/২/৮/৯/১০/১১

৮৮. *মনু-সংহিতা*, পরিচ্ছেদ ১,২,৮,৯,১০ ও ১১ অধ্যায়।

হিন্দু ঐতিহাসিক ইসলাম আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, 'ভারতবর্ষের জনগণ গোটা বিশ্ব থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন এবং পৃথিবীর অবস্থাদি সম্পর্কে বেখবর। তাদের মধ্যে জড়তা ও স্থবিরতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং পরাজয় ও অধঃপতনের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট প্রতিভাত। জাতিভেদের বেড়াজাল ছিল কঠিন।'[৮৯] ভারতবর্ষে সম্মান ও সম্ভ্রমের অপমান ও অবমাননা এবং সেসব পশ্চাৎপদ শ্রেণির প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন কল্পনাতীত ছিল।[৯০]

ইউরোপ : ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী, যারা উত্তর ও পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত বসতি স্থাপন করেছিল, মূর্খতা ও অশিক্ষার ভয়াবহ অন্ধকারে বসবাস করছিল এবং রক্তাক্ত লড়াই-সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। মানবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কাফিলার পশ্চাতে এবং পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগত থেকে বহুদূরে ছিল তাদের অবস্থান। যেমন বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, তেমনি বহির্বিশ্বের কাছেও তাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছু ছিল না। তাদের দেহ ছিল পূতিগন্ধময় আর মস্তিষ্ক ছিল অলীক কল্পনা বিলাসে ভরপুর।[৯১] তাদের পাদরী ও বিশপ শরীরকে কষ্ট দিত আর সমাজ থেকে পালানোর ক্ষেত্রে তারা ছিল কঠোর ও চরমপন্থী।[৯২] তাদের কাছে তখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়নি যে, নারী মানুষ না পশু, তাদের অবিনশ্বর আত্মা আছে কি না? Robert Brifault বলেন, 'পঞ্চম শতাব্দী থেকে নিয়ে খ্রিস্টিয় দশম পর্যন্ত ইউরোপে গভীর অন্ধকার বিরাজিত ছিল। আর এ অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতর এবং ভয়ানক থেকে ভয়ংকর হতে চলছিল। সে যুগের বর্বরতা প্রাচীন কালের বর্বরতার তুলনায় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা তাদের উদাহরণ ছিল সে মরা লাশের মত যা ফুলে ফেটে গিয়েছিল। সে সমস্ত দেশ যেখানে এ সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয়েছিল এবং অতীতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল, যেমন– ইটালি, ফ্রান্স, সেখানে চলছিল অরাজকতা ও ধ্বংসের রাজত্ব।'[৯৩]

জাযিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) : আরবদের নৈতিক চরিত্রেও মারাত্মক ধ্বস নেমেছিল। তারা মদ ও জুয়ায় আসক্ত ছিল। তাদের হৃদয়হীনতা ও জাহিলি আত্মমর্যাদাবোধের পরিমাপ করা যাবে সদ্যপ্রসূত আপন কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন করা থেকেই। কাফিলা লুণ্ঠন করা, নিরপরাধ লোকদের তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করা ছিল তাদের প্রিয় নেশা। তাদের নিকট নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। নারী ছিল শুধুমাত্র যথেচ্ছা ব্যবহার ও ভোগের সামগ্রী। পুরুষ যত খুশি বিয়ে করতে পারত। গোত্রীয়, বংশীয় ও পারিবারিক, রক্ত সম্পর্কীয় ও স্বজনপ্রীতি ছিল সীমাতিরিক্ত। যুদ্ধ ছিল তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত এবং একে অপরকে হত্যা করা তদের কাছে ক্রীড়া-কৌতুকের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।[৯৪]

গাঢ় অন্ধকার ও গভীর হতাশা : খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী ছিল ইতিহাসের নিকৃষ্টতম যুগ এবং মানবতার ভবিষ্যত, তার স্থায়ীত্ব ও উন্নতির দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্ধকার ও হতাশাব্যঞ্জক। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক

---

৮৯. V. D. Mahajan & Savitri Mahajan, *Muslim Rule in India*(Delhi : S. Chand & Co., 1965), p. 33

৯০. *মনু সংহিতা*, ১০ম অধ্যায়

৯১. Frank Thilly, *A History of Philosophy*(New York : H. Holt & Company, 1914), p. 45

৯২. William Edward Hartpole Lecky, *History of European Morals*(London : Longmans, Green & Co., 1890), p. 123

৯৩. Robert Briffault, *The Making of Humanity*(London : G. Allen & Unwin Ltd., 1919), p. 1164

৯৪. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, অনূ. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, *নবীয়ে রহমত সা.*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

H. G. Wells সে যুগের চিত্রাঙ্কন করেছেন এভাবে, 'বিজ্ঞান ও রাজনীতি দুটোই সংঘর্ষমুখর ও ধ্বংসোন্মুখ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৃত্যুর ঘুমে ছিল বিভোর। তখন পৃথিবীতে মানুষের এমন কোন শ্রেণি অবশিষ্ট ছিল না যারা প্রাচীন কালের অভিজাতবর্গের মত নির্ভীক ও মুক্ত চিন্তার সমর্থক হত। সে যুগে মানবীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা ভোঁতা ও ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে গ্রন্থকার আরো বলেন, বাইযান্টাইন ও পারসিক সাম্রাজ্য একে অপরকে ধ্বংস করার ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছিল। ভারতবর্ষও ছিল বিচ্ছিন্নতা ও বিপর্যয়ের শিকার।"[৯৫]

বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ও অরাজকতা : মহানবী মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাবকালে সমগ্র মানবতা আত্মহত্যার পথে ছিল দ্রুতবেগে ধাবমান। মানুষ তার সত্ত্বাকে ভুলে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, মানুষের মন-মস্তিষ্ক কোন কিছুর গভীরে হারিয়ে গেছে। আত্মার খাদ্য, পারলৌকিক কল্যাণ, মানবতার সেবা ও অবস্থার সংস্কার-সংশোধনের জন্য তাদের একটা মুহূর্তেরও অবকাশ ছিল না। অনেক সময় গোটা দেশে এমন একটা লোকও চোখে পড়ত না যার অন্তরে আপন ধর্মের জন্য সামান্যতম চিন্ত-ভাবনাও ছিল। এ ছিল আল্লাহ তা'আলার সে ঘোষণার হুবহু প্রতিচ্ছবি। আর তাহলো,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

'মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।'[৯৬]

মহানবী সা.-কে আরব উপদ্বীপে প্রেরণের মহত্ত্ব : আল্লাহতা'আলার ইচ্ছা ও হিকমতের সিদ্ধান্ত ছিল যে, মানবতার হিদায়াত ও মুক্তির এ সূর্য যা দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জগতে আলো বিস্তার লাভ করবে তা জাযিরাতুল আরবের ভূখণ্ড থেকে উদিত হবে। যে ভূভাগের এ প্রখর আলোক-রশ্মির সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল। আরব উপদ্বীপে শেষ নবী প্রেরণের মূল কারণ হল, আরব উপদ্বীপে ও মক্কা মু'আজ্জামায় কা'বার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি যা হযরত ইবরাহিম আ. এ জন্যই নির্মাণ করেছিলেন যেন তাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং এ জায়গাটা চিরদিনের জন্য তাওহিদের দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) গ্রন্থে ব্যাপক পরিমাণ বিকৃতি সত্ত্বেও 'বাক্কা'[৯৭] উপত্যকা' শব্দটা অদ্যাবধি বর্তমান। مزامير داؤد এর শব্দসমষ্টি যা আরবি ভাষায় এসেছে তাহলো,

طوبى لاناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي لبكاء يصيرونه ينبوعا.

'বরকতময় ও পবিত্র সে মানুষ যার ভিতর তোমার পক্ষ থেকে শক্তি নিহিত, যার অন্তরে রয়েছে তোমার ঘরের রাস্তা যিনি বুকা উপত্যকা অতিক্রমরত অবস্থায় তাতে একটা কুয়া বানান।'[৯৮] তারা 'বাক্কা'

---

৯৫. H.G. Wells, *A Short History of the World*(London : Public Laibrery, 1924) p. 140-141, 144

৯৬. আল কুরআন, ৩০ : ৪১

৯৭. বাক্কা পবিত্র মক্কার অপর নাম। বাক্কা ও মক্কা উভয় নামই ব্যবহৃত হয় এজন্য যে, আরবি ভাষায় মিম ও বা-এর মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন, لازم ও لازب এবং بلبط ও ملبط

শব্দটাকে মূল সহিফার ন্যায় অবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় হুবহু অবশিষ্ট রেখেছেন এবং ইংরেজি 'b' ছোট অক্ষরে না লিখে বড় অক্ষরে 'B' লিখেছেন। ইংরেজি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হলো, Blessed is the man whose strength is in thee in whose heart are the ways of them. Who passing through the Valley of **Baca** make it a well.[৯৯] 'মুবারকবাদ সে সব লোকের প্রতি সম্মান ও শক্তি রয়েছে তোমার সাথে, যাদের অন্তরে তাদের রাস্তা রয়েছে যা বাক্কা উপত্যকা অতিক্রম করবে এবং তাকে একটা কুয়া বানাবে।' রাসুলুল্লাহ সা.-এর আবির্ভাব ছিল হযরত ইবরাহিম ও ইসমাইল আ.-এর সে দু'আর ফসল যা তারা কা'বা গৃহের ভিত্তি পুনঃস্থাপন করতে গিয়ে ও তা পুনঃনির্মাণ করার সময় করেছিলেন। আল-কুরআনে এসেছে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট এক রাসুল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১০০]

স্বয়ং তাওরাতে এর প্রমাণ বিদ্যমান যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহিম আ.-এর এ দু'আ কবুল করেন। লিখিত আছে, 'এবং ইসমাঈলের অনুকূলে আমি তোমার কথা শুনলাম। দেখ, আমি তাকে প্রাচুর্য দান করব, তাকে সৌভাগ্যশালী করব এবং তাকে খুব বর্ধিত করব।'[১০১] মূলত জাযিরাতুল আরবের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান যা একে দা'ওয়াতের কেন্দ্র হিসেবে সর্বাধিক উপযোগী রূপ দান করেছে, যেখান থেকে এ দা'ওয়াত ও পয়গাম সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দেয়া যায় এবং পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা যায়। মূলত, এটা ছিল কয়েকটা মহাদেশের সঙ্গমস্থল।[১০২] এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তা'আলা আরব উপদ্বীপকে রাসুল সা.-এর আবির্ভাব, আসমানি অহির অবতরণ এবং পৃথিবীর বুকে ইসলাম প্রচারের বিশ্বব্যপী কেন্দ্র ও সূচনাবিন্দু হিসেবে নির্বাচিত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه ط.

'আল্লাহই বেশি জানেন তাঁর পয়গাম কোথায় এবং কাকে প্রদান করবেন।'[১০৩]

আরবের অন্ধকার যুগ এবং একজন স্থায়ী নবী প্রেরণের আবশ্যকতা : আল্লাহপাক আরবদেরকে যে জন্য ধন্য করেছিলেন এবং যে কারণে হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর প্রেরণ ও ইসলামের আবির্ভাবের জন্য তাদের

---

৯৮. *গীত সংহিতা*, ৮৪ : ৫, ৬, ৭

৯৯. মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদি, *তাফসিরে মাজিদি*(লাহোর : পাক কোম্পানি, তা.বি.), পৃ. ১৪৫

১০০. আল কুরআন, ২ : ১২৯

১০১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *নবীয়ে রহমত সা.*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১০২. ড. হুসাইন কামালুদ্দিন রিয়াদ ভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি। তিনি এক সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এক নতুন ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে উপনীত হয়েছেন। যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কা মুকাররামা পৃথিবীর শুষ্ক অংশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তার কাছে এ সত্যও দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মক্কা মুকাররামা ঠিক পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থিত। এ গবেষণা দ্বারা তার সামনে এ রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে যে, মক্কা মুকাররামাকে বাইতুল্লাহর কেন্দ্র ও আসমানি হিদায়াতের সূচনাবিন্দু বানানোর মধ্যে আল্লাহর কি রহস্য ও কুদরত নিহিত ছিল (রিয়াদ : দৈনিক আল আহরাম, ৫ জানুয়ারি, ১৯৯৭)।

১০৩. আল কুরআন, ৬ : ১২৪

নির্বাচিত করেছিলেন, আরব উপদ্বীপে সে রকম কোন সচেতনতা ও অস্থিরতার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হত না এবং হুনাফা[১০৪] ও সত্যের অন্বেষণের প্রেরণা ও আবেগ পোষণকারী মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তিই অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিলেন এবং যাদের অবস্থান বর্ষাঘন শীতল রাতের গভীর অন্ধকারে জোনাকি পোকার চেয়ে বেশি ছিল না। এ সে যুগ, যে যুগে রাতুলুল্লাহ সা. আবির্ভূত হন আরব উপদ্বীপের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অন্ধকার যুগ ছিল। নবী কারিম সা.-এর একজন ইংরেজ জীবনীকার স্যার উইলিয়াম মুইর সে যুগের খুব সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে লাভা নির্গত হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মাদ সা. কেবল সঠিক মুহূর্তে ও যথার্থ স্থানে পৌঁছে আগুনের উত্তাপ বৃদ্ধি করেন। ফলে লাভা নির্গত হয়ে পড়ে। 'মুহাম্মাদ (সা.)-এর যৌবনের ঊষালগ্নে 'আরব উপদ্বীপ একেবারেই পরিবর্তনের অযোগ্য অবস্থায় ছিল। সম্ভবত এর চেয়ে বেশি নৈরাশ্যজনক অবস্থা আর কোন যুগে ছিল না। স্থানীয় মূর্তিপূজা ও ইসমাইলিদের কল্পনা পূজার খরস্রোত সবদিক থেকে কা'বার অভিমুখে দু'কূলপ্লাবী হয়ে আছড়ে পড়ছিল এবং মক্কার মাযহাব ও উপাসনার পদ্ধতি আরবদের মস্তিষ্কের উপর শক্তভাবে জেঁকে বসেছিল।'[১০৫]

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগের অবস্থার বিকৃতি এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মানবতার অবনতি ও অধঃপতন সে সীমায় পৌঁছেছিল যে, তার চরিত্র সংশোধন আর কোন সংস্কারক ও শিক্ষকের সাধ্যের ভিতর ছিল না। জাহিলিয়াতের শিরকি ও মূর্তিপূজামূলক এবং মানবতার এ ধ্বংসাত্মক আবর্জনাকে কিভাবে সরানো হবে ও পরিষ্কার করা হবে যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশানুক্রমে জমা হয়ে আসছিল যার নিচে আম্বিয়া কিরাম আ.-এর বিশুদ্ধ শিক্ষামালা ও চেষ্টা-সাধনা সমাহিত ছিল। অতঃপর সেখানে সে নতুন সুদৃঢ়, বিস্তৃত ও সমুন্নত প্রাসাদোপম অট্টালিকা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে যার রহমতের ছায়াতলে সমগ্র মানবতা আশ্রয় গ্রহণ করবে।[১০৬] আল্লাহপাক বলেন,

أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَه نُوْرًا يَّمْشِىْ بِه فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُه فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا.

'যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে ইচ্ছা মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি- সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান থেকে বের হবার নয়?'[১০৭] এসব ফিতনা-ফ্যাসাদের জড় চিরদিনের জন্য খতম করা এবং মূর্তিপূজার ভিত্তিকে মূলোৎপাটনের প্রয়োজন ছিল যে, দূর-দূরান্তেও এর কোন চিহ্ন ও নাম-নিশানা যেন অবশিষ্ট থাকতে না পারে। রাসুল সা.-কে প্রেরণ করে আল্লাহপাক মানব জাতির যে উপকার করেছেন, তার বর্ণনা কুরআনে এভাবে এসেছে,

---

১০৪. 'হুনাফা' বলা হয় যারা মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল ও নিজেদের জ্ঞান ও উপলব্ধি মুতাবিক ইবরাহিম আ.-এর ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১০৫. Sir William Muir, *The life of Mohammad*(Edinburgh : J. Grant, 1923), vol. I, pp. ccxxv-iii

১০৬. ibid.

১০৭. আল কুরআন, ৬ : ১২২

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط.

'তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।'[১০৮] আল্লাহপাক তাঁর পক্ষ থেকে মহান ঐশী বাণী প্রেরণের মাধ্যমে মানব জাতিকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুব্যবস্থা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى 'এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না; এতো অহি যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।'[১০৯] অন্যত্র আয়াতে বলা হয়েছে, لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِه ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ 'কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করে না, সামনে থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।"[১১০]

আর এটা ছিল স্বয়ং এক শক্তিশালী মু'জিযা। রাসুল সা.-এর মুখ দিয়ে যখনই এ আকিদা-বিশ্বাস ঘোষিত হল তখনই মূর্তির সমস্ত প্রাচীন মণ্ডপগুলোতে ধুলো উড়তে লাগল এবং এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবী ইমানি উত্তাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।'[১১১] এ ব্যাপক ও বিশ্বজোড়া বিপ্লব এবং মানবতার নবতর জীবন গঠন ও বিনির্মাণের মহান কাজ এক নতুন নবুওয়াত-রিসালাতের প্রত্যাশী ছিল যিনি হিদায়াত ও দীনে হকের পতাকা গোটা বিশ্বজাহানে চিরকালের জন্য উড্ডীন করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً. فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.

'কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল যে পর্যন্ত না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসল।'[১১২]

জন্ম থেকে নবুওয়াত পর্যন্ত সময়কাল

আবদুল্লাহ ও আমিনার বিবাহ : কুরাইশ সসদার 'আবদুল মুত্তালিবের ছিল দশ পুত্র। তাদের সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান। তার সকল পুত্রের মধ্যে আবদুল্লাহ খুবই প্রশংসনীয় গুণাবলী ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।[১১৩] তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বনু যুহরার সরদার ওয়াহহাবের কন্যা আমিনার সাথে। তিনি সে সময় উচ্চ বংশ, সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কুরাইশদের ভিতর সবচেয়ে সম্মানিতা মহিলা ছিলেন।[১১৪] রাসুলুল্লাহ সা. মা আমিনার গর্ভে থাকাকালেই পিতা আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন।[১১৫]

---

১০৮. আল কুরআন, ৩ : ১০৩
১০৯. আল কুরআন, ৫৩ : ৩-৪
১১০. আল কুরআন, ৪১ : ৪২
১১১. Lamertine, *Historie de la Turqie*(Paris : Paris V. Lecou, 1955), vol. II, pp. 276-277
১১২. আল কুরআন, ৯৮ : ১-৩
১১৩. ইবনে হিশাম, *সীরাতুননবী (সা.)*(ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ১৯৯৪), খ.১, পৃ. ১১৭
১১৪. প্রাগুক্ত।
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

রাসুলুল্লাহ সা.-এর জন্মলাভ : তাঁর জন্ম হয় 'আমুল ফিলে তথা ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবার।[১১৬] এটা ছিল মানবতার ইতিহাসের সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল ও বরকতময় দিন। রাসুল সা.-এর ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ শুনেই দাদা আবদুল মুত্তালিব ছুটে আসেন এবং পরম স্নেহ ও যত্নের সাথে কোলে তুলে নিয়ে কা'বার ভিতর প্রবেশ করেন, আল্লাহ তা'আলার হামদ বর্ণনা করেন এবং দু'আ করেন।[১১৭] তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। আরবে এ নাম ছিল নতুন। ফলে লোকে খুব বিস্মিত হয়।[১১৮]

তাঁর মুবারক বংশধারা : মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন 'আবদ মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ইবন কা'ব ইবন লুই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন আন-নাদার ইবন কিনানা ইবন খুযাইমা ইবন মুদরিকা ইবন ইলয়াস ইবন নাযার ইবন মা'আদ্দ ইবন আদনান। আদনানের বংশক্রম ঊর্ধে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল ইবন ইবরাহিম আ. পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।[১১৯]

দুগ্ধ পানকাল : জন্মের পর কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁর চাচা আবু লাহাবের বাঁদি ছুওয়াইবা তাকে দুধ পান করান। অতঃপর বনি সা'দ গোত্রের ধাত্রী বিবি হালিমার দুধ পান করেন।[১২০] তিনি কখনও বলতেন, 'আমি তোমাদের তুলনায় বেশি আরব কুরাইশি আর আমি সা'দ ইবন বকর গোত্রে দুধ পান করেছি।[১২১]

বিবি আমিনা ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল : মুহাম্মাদ সা.-এর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা আমিনা তাঁর দাদার মাতৃকুলকে দেখানোর জন্য তাকে ইয়াসরিব নিয়ে যান। মা আমিনা তাঁর প্রিয়তম স্বামী 'আবদুল্লাহর কবর যিয়ারতেও ইচ্ছুক ছিলেন।[১২২] মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে আল-আবওয়া[১২৩] নামক স্থানে বিবি আমিনা ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর দাদা 'আবদুল মুত্তালিবও ইন্তিকাল করেন।[১২৪] ফলে তাকে পুনরায় পিতৃহীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়।

চাচা আবু তালিবের সঙ্গে : দাদার ইন্তিকালের পর তিনি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে থাকতেন। আবদুল মুত্তালিব তাকে দেখাশোনা ও তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য বরাবর উপদেশ দিতেন। ফলে আবু তালিব আপন সন্তানদের চেয়েও বেশি কোমল, স্নেহপরবশ ও প্রতিপালন প্রবণ হয়ে রাসুল সা.-কে সাথে রাখতেন।[১২৫]

আসমানি প্রশিক্ষণ : রাসুলুল্লাহ সা.-এর লালন-পালন বিশেষ নিরাপদ ও কালিমামুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং জাহিলিয়াতের নাপাক ও খারাপ অভ্যাসসমূহ থেকে আল্লাহপাক তাকে সর্বদাই দূরে ও মুক্ত রাখেন।

---

১১৬. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *নবীয়ে রহমত সা.*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯
১১৭. ইবনে হিশাম, *সীরাতুননবী (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৬
১২০. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত সা., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-২১
১২১. ইবনে হিশাম, *সীরাতুননবী (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
১২২. শারহ আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৬৭-১৬৮
১২৩. জায়গাটা মস্তরার নিকটবর্তী যা এখন মক্কা ও মদিনার মাঝখানে প্রসিদ্ধ মনযিল। দ্র. ইবনে হিশাম, *সীরাতুননবী (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
১২৪. ইবনে হিশাম, *সীরাতুননবী (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

যিনি তাঁর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম থেকেই সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় গুণাবলি, উন্নত মনোবল, উত্তম চরিত্রে বিভূষিত, লাজনম্র, সত্যবাদী, আমানতদার ও আল-আমিন ছিলেন।[১২৬]

হযরত খাদিজা রা.-এর সাথে বিবাহ : যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন খাদিজা রা.-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি ছিলেন বিধবা এবং কুরাইশ গোত্রের খুবই প্রভাবশালী, বোধশক্তি সম্পন্ন, দূরদর্শী, সম্পদশালী, খ্যাতিসম্পন্না মহিলা।[১২৭]

অনিশ্চিত অস্থিরতা : রাসুল সা. নিজের ভিতর এক ধরনের অদৃশ্য ও অনিশ্চিত অস্থিরতা অনুভব করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ط مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيْمَانُ.

'এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ (অহি) নাযিল করেছি রুহ তথা আমার নির্দেশ! তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ইমান কি?'[১২৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا أَنْ يُّلْقٰى إِلَيْكَ الْكِتٰبُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ.

'তুমি আশা করনি যে, তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনো কাফিরদের সহায় হয়ো না।'[১২৯]

মানবতার সুবহি সাদিক : রাসুল সা.-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো বিশ্ব তখন অনলকুণ্ডের একেবারে প্রান্তসীমায়। গোটা মানবগোষ্ঠী দ্রুততার সাথে আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হয়েছিল। এটা ছিল সে নাজুক মুহূর্ত যখন মানবতার ভাগ্যাকাশে ঘটল সুবহি সাদিকের উদয়। শোষিত, বঞ্চিত ও দূর্ভাগা বিশ্বের ভাগ্য জেগে উঠে এবং বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সা.-এর আবির্ভাবের মুবারক মুহূর্ত নিকটবর্তী হয় আর মানবতার শীতল মৌসুমী বাগানে আবার বসন্তের আগমন ঘটে।

হিরা গুহা : এ সময় একাকিত্ব ও নির্জনতা প্রিয়তা তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি সকলের থেকে আলাদা হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থানে বেশি তৃপ্তি পেতেন; শান্তি পেতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি হিরাগুহায় অবস্থান করতেন এবং উপর্যুপরি কয়েক রাত সেখানে অতিবাহিত করতেন। তিনি ইবরাহিম আ.-এর পদ্ধতিতে ও সুস্থ প্রকৃতির পথ-নির্দেশনায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।[১৩০]

নবুওয়াত লাভ : এভাবেই একদা তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তাকে নবুওয়াতের পদমর্যাদা দিয়ে সরফরায করার পবিত্র মুহূর্ত এসে যায়। জন্মের ৪১তম বছরে ১৭ রমদান[১৩১] তারিখের ঘটনা মুতাবিক ৬ আগষ্ট, ৬১০ খ্রি. জাগ্রত ও চৈতন্যাবস্থায় সংগঠিত হয়। তাঁর সামনে হিরা গুহায়

---

১২৬. ইবনে হিশাম, অনূ. আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবনে হিশাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ৫২

১২৭. ইবনে হিশাম, *সীরাতুননবী (সা.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১২৮. আল কুরআন, ৪২ : ৫২

১২৯. আল কুরআন, ২৮ : ৮৬

১৩০. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *নবীয়ে রহমত সা.*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১

১৩১. আবু জা'ফার মুহাম্মদ আল-বাকির, সীরাত ইবন কাছির, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৯২

ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আ. আগমন করেন এবং বলেন, 'হে রাসুল! আপনি পড়ুন।' সুরা 'আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।[১৩২] এটা ছিল নবুওতের প্রথম দিন; প্রথম অহি।

কুরআন মাজিদ অবতরণের সময়কাল : কুরআন ও হাদিসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন মাজিদ 'লাওহি মাহফুজ' থেকে মহানবী সা.-এর কাছে দু'টো পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। সর্বপ্রথম হিজরি পূর্ব ১৩ সন অনুযায়ী ৬১০ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসের লাইলাতুল কদরে[১৩৩] বা ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে নবী করীম সা.-এর ৪০ বছর বয়সে রমাদান মাসের কদর রজনীতে হিরা গুহায় সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১৩৪]

প্রকৃতপক্ষে কুরআন নাযিলের পূর্বে বিশ্বের যেসব দেশ সুসভ্য হিসেবে পরিচিত ছিল ও শিল্প-সাহিত্যের সরব চর্চা ছিল এবং যেসব দেশকে সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র মনে করা হত, সেসব দেশে ধর্মের অবয়ব ছিল একেবারেই বিকৃত ধরনের। সেসব ধর্ম স্বীয় মৌল সত্তা, মূল ও মর্যাদা, শক্তি ও কল্যাণকামিতা হারাতে বসেছিল। বিশ্বের এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়নের জন্য মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করেন।

---

১৩২. আল কুরআন, ৯৬ : ১-৫; আবু জা'ফার মুহাম্মদ আল-বাকির, *সীরাত ইবন কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৯২

১৩৩. মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী, *বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদিস সংকলন-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১৩৪. ড. শাহ মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পবিত্র কুরআনের অবতরণ, কাঠামোগত পরিচয় ও বিষয়বস্তু

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠ বান্দা ও রাসুল সা.-এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে নাযিলকৃত প্রত্যক্ষ অহির সমষ্টি। এ অহি অবতরণ দু'টো পর্যায়ে হয়েছে। প্রথমত লাওহি মাহফুজ থেকে বাইতুল ইযযাতে অবতরণ ও দ্বিতীয়ত বাইতুল ইযযাত থেকে ধীরে ধীরে মহানবী সা.-এর প্রতি অবতরণ। পরে গ্রন্থাবদ্ধ কাঠামোতে রূপ নেয়। নিচে কুরআনের অবতরণ, কাঠামোগত পরিচয় ও এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

কুরআন মাজিদ অবতরণ

প্রথম পর্যায় : লাওহি মাহফুজ থেকে বাইতুল ইযযাতে অবতরণ : প্রথম পর্যায়ে মহান আল্লাহর আরশে আযিমে অবস্থিত 'লাওহি মাহফুজ' বা 'সুরক্ষিত ফলক' থেকে সম্পূর্ণ কুরআন একই সাথে রমাদান মাসের মহিমান্বিত কদর রজনীতে পৃথিবী সংলগ্ন প্রথম আসমানের 'বাইতুল ইযযাতে' তথা 'বাইতুল মামুরে' অবতীর্ণ হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ 'পবিত্র রমাদান মাসেই কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়।'[১৩৫]

আল্লাহপাক আরও বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা কুরআনকে কদর রজনীতে অবতীর্ণ করেছি।'[১৩৬] 'কদর রজনীতে কুরআন নাযিল হয়েছে' এ কথাটার তিনটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে–

(১) লাওহি মাহফুজ থেকে সম্পূর্ণ কুরআন এ কদরের রাতে প্রথম আকাশে বাইতুল ইযযাহ তথা বাইতুল মামুর নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেখান থেকে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে দীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী মহানবী সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। নবুওয়াত লাভের পর রাসুল সা.-এর মাক্কি জীবনের ১৩ বছর এবং মাদানি জীবনের ১০ বছর উক্ত ২৩ বছরের অন্তর্ভুক্ত।

(২) কুরআনের এক একটা অংশ প্রতি বছর কদরের রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে তথা বাইতুল ইযযাতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা ২৩ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

(৩) কদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়েছে। এরপর যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। মহানবী সা. এ প্রসঙ্গে বলেন, 'লাওহি মাহফুজ' থেকে কুরআনকে পৃথিবীর আকাশে বাইতুল ইযযাতে রাখা হয়। অতঃপর জিবরাইল আ. ক্রমশ তা রাসুল সা.-এর প্রতি নাযিল করতে থাকেন।'[১৩৭]

দ্বিতীয়ত : বাইতুল ইযযাত থেকে মহানবী সা.-এর প্রতি অবতরণ : এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহপাকের ঘোষণা, وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَه عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً 'লোকদেরকে ধীরে ধীরে শুনানোর সুবিধার্থে

---

১৩৫. আল কুরআন, ২ : ১৮৫

১৩৬. আল কুরআন, ৯৭ : ১

১৩৭. আহমাদ ইবন শু'আইব ইবন আলি আন-নাসাই, *সুনান আন-নাসাই আল-কুবরা*(দামেশক : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১), খ.৬, পৃ. ৫১৯

আমি অল্প অল্প করে ক্রমশঃ কুরআন অবতীর্ণ করেছি।'[১৩৮] তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ইত্যাদি একসাথে পূর্ণাঙ্গ কিতাব আকারে নাযিল করা হয়েছিল। কুরআন মাজিদ একসাথে নাযিল করা হয়নি। মক্কার কাফিররা রাসুল সা.-কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ বলেন, 'কাফিররা বলে, তাঁর উপর সমগ্র কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, আপনার হৃদয়কে এর দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।'[১৩৯]

সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত : সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন অহি হিসেবে অবতীর্ণের সূচনা সম্পর্কে সহিহ বুখারি শরিফে উল্লেখ আছে। এ মর্মে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রা. বর্ণনা করেন,

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ...

'..মহানবী সা.-এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে অহি অবতরণের সূচনা হয়েছিল...।' অত:পর তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি হিরা পর্বতের একটি গুহায় রজনীর পর রজনী ইবাদতে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে তাঁর নিকট সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। জিবরাইল আ. মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' মহানবী সা. বলেন, তখন জিবরাইল আ. আমাকে চেপে ধরলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, পড়ুন! 'আমি আবার বললাম, আমি পড়তে জানি না।' তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন– 'হে রাসুল সা.! আপনি পড়ুন, আপনার সে প্রভুর নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন..।'[১৪০] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

'পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[১৪১]

বর্ণিত আছে, ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ রমাদান হযরত জিবরাইল আ. স্ব-রূপে এ অহি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি যখন অহি নিয়ে আসেন, রাসুলুল্লাহ সা. তখন হিরা গিরি গুহায় অবস্থান করছিলেন।

মহানবী সা.-এর প্রতি অহি নাযিলের পদ্ধতি : পবিত্র কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় একসাথে নাযিল হয়নি; বরং মহানবী সা.-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতি জীবনে প্রয়োজন অনুসারে ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে অহি প্রেরণ করতেন। বর্ণিত আছে হযরত জিবরাইল আ. রাসুল সা.-এর নিকট মোট চব্বিশ হাজার বার আগমন করেছেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুযায়ী মানুষের নিকট আল্লাহর নির্দেশ তিনটা উপায়ে পৌঁছে থাকে।[১৪২] কুরআনে এসেছে,

---

১৩৮. আল কুরআন, ১৭ : ১০৬

১৩৯. আল কুরআন, ২৫ : ৩২

১৪০. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), খ.১, হাদিস নং ৩, পৃ. ৪

১৪১. আল কুরআন, ৯৬ : ৫

১৪২. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৭), পৃ. ১১৯

وَإِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الأَمِيْنُ. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

'নিশ্চয়ই এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এটা অবতীর্ণ করেছেন বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাইল আ.) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।'[১৪৩] কুরআনে আরও এসেছে, 'আর এটা মানুষের জন্যে স্বাভাবিক নয় যে আল্লাহ অহি দ্বারা অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহরই আদেশ নাযিল করার জন্য রাসুল প্রেরণ ব্যতীত তাদের সাথে কথা বলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহিমান্বিত ও বিজ্ঞানময়।'[১৪৪] হাদিসের বর্ণনার আলোকে জানা যায় মহানবী সা.-এর নিকট বিভিন্ন পদ্ধতিতে অহি নাযিল হতো। হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত কুরআন অবতণের বিষয়টি দু'টো পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন,

(ক) প্রথম পর্যায় : লাওহি মাহফুজ থেকে জিবরাইল আ.-এর নিকট অবতরণ পদ্ধতি।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় : জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে রাসুল সা.-এর নিকট কুরআন অবতরণ পদ্ধতি।

(ক) কুরআন মাজিদ নাযিলের প্রথম পর্যায় : লাওহি মাহফুজ থেকে জিবরাইল আ.-এর নিকট অবতরণের কি পদ্ধতি ছিল সে সম্পর্কে তাফসিরকারদের দু'টো বর্ণনা প্রচলিত রয়েছে।[১৪৫] যেমন,

সাইদ বিন যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও ইকরামা বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, লাওহি মাহফুজ থেকে সমগ্র কুরআন কোন এক কদরের রাতে পৃথিবীর আকাশে অর্থাৎ বাইতুল ইযযাতে নাযিল হয়। সেখান থেকে জিবরাইল আ. ক্রমান্বয়ে ২৩ বছর ধরে রাসুল সা.-এর নিকট কুরআন নিয়ে আসেন।

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি রহ. বলেন, একত্রে সমগ্র কুরআন লাওহি মাহফুজ থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয়নি। বরং প্রতি এক বছরের প্রয়োজনীয় অংশ লাওহি মাহফুজ থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হত। বস্তুত কুরআন মাজিদ অবতরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা একটা বিশেষ ক্রমধারা অনুসরণ করেছেন। যেমন,

(১) লাওহি মাহফুজে কুরআন : অনাদিকাল থেকে আল্লাহর কালাম কুরআন মাজিদ তাঁর পবিত্র সত্তায় অন্তর্নিহিত ছিল, সেখান থেকে এটাকে লাওহি মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ. فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ 'বরং এটা মহিমান্বিত ও পবিত্র কুরআন যা লাওহি মাহফুজে সংরক্ষিত আছে।'[১৪৬]

(২) অতঃপর লাওহি মাহফুজ থেকে বাইতুল ইযযায় কুরআন অবতরণ।

(৩) এরপর হিরা গুহায় রাসুল সা.-এর নিকট কুরআন অবতরণ শুরু।

(৪) খণ্ড-খণ্ড করে কুরআন নাযিল : এরপর খণ্ডকারে কুরআন নাযিল হতে থাকে। কখনও ৫ বা ১০ আয়াত, কখনও আয়াতের অংশ আর কখনো বা সম্পূর্ণ একটি সুরা নাযিল হতে থাকে। আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِه فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا.

---

১৪৩. আল কুরআন, ২৬ : ১৯২-১৯৪

১৪৪. আল কুরআন, ৪২ : ৫১

১৪৫. ড. মোঃ ইবরাহীম খলিল ও অন্যান্য, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড, মে ২০১২), পৃ. ১৯৮

১৪৬. আল কুরআন, ৮৫ : ২১

'আর এ কুরআনকে অল্প-অল্প করে নাযিল করেছি, যেন আপনি তা থেমে থেমে লোকদের শোনান, আর ক্রমশ নাযিল করেছি। এভাবে নাযিলের কারণ হলো, যাতে এটা খুব ভালোভাবে আপনার মন-মগজে বদ্ধমূল হয়। আর (এ উদ্দেশ্যেই) একে এক বিশেষ ধারায় আলাদা আলাদা অংশে সুবিন্যস্ত করেছি।'[১৪৭]

(খ) কুরআন মাজিদ নাযিলের দ্বিতীয় পর্যায় : জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট কুরআন অবতরণ পদ্ধতি। আলিমগণের মতে, রাসুল সা.-এর নিকট সাধারণত নয়টা বিশেষ পদ্ধতিতে অহি নাযিল হয়েছে।[১৪৮] নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো :

(১) সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে (الرؤيا الصالحة) : নবী-রাসুলগণের স্বপ্ন ও অহি। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রা. বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়, তিনি বলেন,

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ...

'... নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবী সা.-এর উপর অহি নাযিলের শুভ সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে...।'[১৪৯] হাদিসে অনেক স্বপ্নের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো হাদিসে কুদসির অন্তর্ভুক্ত। রাসুলুল্লাহ সা. তাঁর মাদানি জীবনে যে স্বপ্ন দেখেন তা কুরআনে এসেছে এভাবে, لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ 'আল্লাহ তাঁর রাসুল সা.-এর স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন যে, তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।'[১৫০] হযরত ইবরাহিম আ. স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল আ.-কে কুরবানি করার জন্য স্বপ্নেই আদিষ্ট হয়েছিলেন। কাজেই নবীদের স্বপ্ন অহির অন্তর্ভুক্ত।

(২) অন্তর্লোকে ফুকে দেয়া (إلقاء في القلب) বা (نفس في الروع) : এ পদ্ধতিতে জিবরাইল আ. মহানবী সা.-কে দেখা না দিয়ে অদৃশ্য থেকে তাঁর হৃদয়পটে কোন কথা ফুঁকে দিতেন। রাসুল সা. বলেন, إن روح القدس نفس في روعي 'নিশ্চয়ই রুহুল কুদ্দুস আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন বা ফুঁকে দিয়েছেন।' কিংবা মহান আল্লাহ নবীর অন্তর্লোকে কোন কথার উদ্রেক করে কোন বিষয় জানিয়ে দিতেন।

(৩) ঘন্টাধ্বনির আকারে : অহি নাযিলের পূর্ব মুহূর্তে মহানবী সা.-এর কানে ঘন্টাধ্বনির মত অবিরাম বাজতে থাকত। আর এর সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা কথা বলতে থাকতেন। এ পদ্ধতিকে 'সালসালাতুল জারাস' বলা হয়েছে। এ সময় তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারিস ইবন হিশাম রা. রাসুল সা.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার নিকট কিভাবে অহি আসে? এর জবাবে তিনি বলেন, কখনো কখনো আমার নিকট অহি আসে ঘন্টাধ্বনির মত। এ প্রকার অহি আমার নিকট খুবই কষ্টকর মনে হয়। তবুও জিবরাইল আ. যা বলেন আমি তা তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্ব করে নিই।'[১৫১]

---

১৪৭. আল কুরআন, ২৫ : ৩২

১৪৮. ড. শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

১৪৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), খ.১, হাদিস নং ৩, পৃ. ৪

১৫০. আল কুরআন, ৪৮ : ২৭

১৫১. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), খ.১, হাদিস নং ৩, পৃ. ৪

হাদিসে এ ধ্বনিকে বুঝানোর জন্য مثل سلسلة الجرس (নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনির মত), كسلسلة على صفوان (পাথরের উপর লোহার ধ্বনির মত) বা كدوي النحل (মৌমাছির গুন গুন ধ্বনির মত) এ তিনটা বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের উপমার মূল কথা একই। হাদিসে এটাকে নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনিও আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৫২] এটা কালামে ইলাহির নিজস্ব আওয়াজ অথবা ফেরেশতা বা তাদের পাখার আওয়াজ বলেও বর্ণিত হয়েছে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. বলেন, এটা বাইরের কোন ধ্বনি নয়; বরং অহি অবতরণের মুহূর্তে প্রিয়নবী সা.-এর ইন্দ্রিয়সমূহকে জাগতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছন্ন করে একমাত্র অহির দিকেই মনোযোগী করে দেয়া হত।[১৫৩]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির মতে, এটা কালামে রব্বানির নিজস্ব আওয়াজ। এ ধ্বনির সূচনা হয় আরশে আযিমে আর সমাপ্তি ঘটে প্রিয়নবীর হৃদয়ে পৌঁছা পর্যন্ত। এটা ছিল কঠিনতম পদ্ধতি। প্রচণ্ড শীতের সময়ও মহানবীর শরীর মুবারক থেকে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ত।[১৫৪]

(৪) **ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন :** ফেরেশতা জিবরাইল আ. মানবাকৃতিতে মহানবী সা.-এর নিকট অহি নিয়ে আসতেন। এ পদ্ধতি ছিল সহজতর। হাদিসে জিবরাইল আ. নামে প্রসিদ্ধ হাদিসটা এ পদ্ধতির অহির উদাহরণ। এ পদ্ধতিতে জিবরাইল আ. সাধারণত সাহাবি হযরত দাহইয়াতুল কালবি রা.-এর আকৃতি বেশি গ্রহণ করতেন। আল্লামা 'আইনি রহ. বলেন, কোন কোন সময় অন্য সাহাবির আকৃতিতে আসার বর্ণনাও হাদিসে আছে।

(৫) **ফেরেশতার নিজ আকৃতিতে আগমন :** ফেরেশতা জিবরাইল আ. তাঁর নিজের আকৃতিতে মহানবী সা.-এর নিকট অহি নিয়ে আসতেন। নবী কারিম সা. তিনবার জিবরাইল আ.-কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। (ক) হিরা গুহায়, (খ) ফাতরাতুল অহির পরে (পুনঃ অহি চালুর সময়) এবং (গ) মি'রাজের সময়, সিদরাতুল মুনতাহায়।

(৬) **পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি :** আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-এর সাথে কোন মাধ্যম ছাড়াই জাগ্রত অবস্থায় পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি কথা বলতেন। মি'রাজের সময় আল্লাহর সাথে এভাবেই কথা হয়েছিল। মুসলিমগণের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এ পদ্ধতিতে ফরজ হয়।[১৫৫]

(৭) **তন্দ্রাবস্থায় সরাসরি অহি :** মহানবী সা. তন্দ্রাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি অহি পেতেন। এ পদ্ধতিতে মহানবী সা. সাতবার অহি পেয়েছেন বলে হাদিস থেকে জানা যায়।

(৮) **ইসরাফিল আ.-এর মাধ্যমে অহি লাভ :** কোন কোন সময় মহানবী সা. হযরত ইসরাফিল আ.-এর মাধ্যমেও অহি লাভ করতেন। তবে তিনি খুব কমই অহি নিয়ে এসেছেন।[১৫৬]

(৯) **অন্তরাল ছাড়া অহি :** এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-এর সাথে কোন অন্তরাল ছাড়াই জাগ্রত অবস্থায় কথা বলেছেন। নবী কারিম সা. আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখেছেন বলে যারা বিশ্বাস

---

১৫২. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল ও অন্যান্য, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

১৫৩. ড. শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৫৪. প্রাগুক্ত।

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৫৬. ড. শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

করেন এ মত হচ্ছে তাদের। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নবী কারিম সা. নিজের ইচ্ছামত কোনো কথা বলেন না, তিনি যা বলেন তা অবতীর্ণ অহি ব্যতীত আর কিছুই নয়।' আল্লাহপাক আরও বলেছেন, 'এটা এমন একটা গ্রন্থ যা আমি আপনার নিকট নাযিল করেছি যেন আপনি মানুষকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করতে পারেন– যে পথ সর্বশক্তিমান ও সর্বপ্রশংসিত আল্লাহর পথ।'[১৫৭] মূলত উপরে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেই মহানবী সা.-এর প্রতি অহি নাযিল করা হত। আর এ সকল পদ্ধতির মধ্যে কেবলমাত্র হযরত জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমেই সিংহভাগ অহি রাসুল সা.-এর উপর নাযিল করা হয়েছে।[১৫৮]

আল কুরআনের কাঠামোগত পরিচয়

পবিত্র কুরআনের সর্বমোট সুরা সংখ্যা ১১৪, সর্বমোট পারা সংখ্যা ৩০, মাক্কি সুরা ৯২ টা (মতান্তরে ৮৬ টা অথবা ৮৯ টা এবং মাদানি সুরা ২২ টা (মতান্তরে ২৮ টা অথবা ২৫ টা)। কারো মতে, মাক্কি সুরা ৮২ টা ও মাদানি সুরা ২০ টা। ১২ টাতে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এ ১২ টা মাক্কি সুরা, আবার কারো মতে, মাদানি সুরা। সর্বমোট রুকু সংখ্যা ৫৪০ বা ৫৫৪ বা ৫৬১ টা। সর্বমোট মনযিল সংখ্যা ৭ টা। সাত দিনে খতম করার সুবিধার্থে উক্ত সুরাগুলোকে সাত মনযিলে বিভক্ত করা হয়েছে। সর্বমোট শব্দ সংখ্যা ৭৬,৪৪০ অথবা ৭৭,৪৩৯ অথবা ৭৭,৪৪০ অথবা ৭৭,৯৩৪ অথবা ৮৬,৪৩০ টা। সর্বমোট অক্ষর সংখ্যা ৩,১২,৬৯০ অথবা ৩,২৩,৬২১ অথবা ৩,২৩,৬৭১ টা। সর্বমোট বাক্য সংখ্যা ৭৬,৪৩০ টা। যবরের সংখ্যা ৫৩,২৪৩ অথবা ৫৩,১৪৩ টা। যেরের সংখ্যা ৩৯,৫৮২ টা। পেশের সংখ্যা ৮,৮০৪ টা। তাশদিদের সংখ্যা ১,২৫৩ অথবা ১,২৭৪ টা। পবিত্র কুরআনে মাদ হলো ১,৭৭১ টা। নুকতা হলো ১,০৫,৬৮১ অথবা ১,০৫,৬৮২ অথবা ১,০৫,৬৮৪ টা। পবিত্র কুরআনের মোট ওয়াকফ (বিরতি চিহ্ন) ৫,০৫৮ টা। তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত আছে ১৪ টা।[১৫৯] ইমাম শাফিয়ি' রহ.-এর মতে ১৫ টা। আর তাহল সুরা হজ্জের ৭৭ নম্বর আয়াত। সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত যে সুরায় নাযিল হয়েছে তার নাম সুরা আন-নাজম। পবিত্র কুরআনে আদেশসূচক আয়াত আছে ১,০০০ টা। পবিত্র কুরআনে নিষেধমূলক আয়াত আছে ১,০০০ টা। পবিত্র কুরআনে সুসংবাদমূলক আয়াত আছে ১,০০০ টা। পবিত্র কুরআনে সতর্কবাণী মূলক আয়াত আছে ১,০০০ টা। পবিত্র কুরআনে হালাল-হারামের আয়াত আছে ৫০০ টা। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির সম্পর্কে আয়াত আছে ৫০০ টা। পবিত্র কুরআনে সালাত ও যাকাতের আয়াত আছে ১৫০ টা। পবিত্র কুরআনে তাসবিহের আয়াত আছে ১২০ টা। পবিত্র কুরআনে 'আল্লাহ' শব্দটা আছে মোট ২৫৮৪ স্থানে। পবিত্র কুরআনে 'মুহাম্মাদ' শব্দটা আছে মোট ৪ স্থানে। পবিত্র কুরআনে নবী-রাসুলদের নাম আছে মোট ২৫ জনের। পবিত্র কুরআনে 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' শব্দটা আছে মোট ২ স্থানে। পবিত্র কুরআনে দীর্ঘতম সুরা আল-বাকারা, যার আয়াত সংখ্যা ২৮৬ টা। পবিত্র কুরআনে ক্ষুদ্রতম সুরা আল-কাওছার, যার আয়াত সংখ্যা ৩ টা। পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত সুরা আলাকের

---

১৫৭. আল কুরআন, ৫৩ : ৩-৪; ১৪ : ৯

১৫৮. ড. শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৫৯. মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাশেম গাজী ও অন্যান্য, *বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন*-১, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬২-৬৪, ৭৪-৭৫

প্রথম পাঁচ আয়াত। পবিত্র কুরআনে সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সুরা মায়িদার তৃতীয় আয়াত। পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সুরা আল-ফাতিহা। পবিত্র কুরআনে সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সুরা আন-নাছর। পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম হারাকাত (যবর, যের, পেশ) সংযোজন করা হয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক হিজরি ৭৫ সাল মুতাবিক ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে।[১৬০] পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম অবতীর্ণ শুরু হয় হিজরি পূর্ব ১৩ সন মুতাবিক ৬১০ খ্রিস্টাব্দের রমাদান মাসে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ শেষ হয় হিজরি ১১ সন মুতাবিক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের সফর মাসে। পবিত্র কুরআনের সর্বমোট আয়াত সংখ্যা হযরত আয়েশা রা.-এর মতে ৬,৬৬৬; হযরত উসমান রা.-এর মতে ৬,২৫০; হযরত আলি রা.-এর মতে ৬,২৩৬, হযরত ইবন মাসউদ রা.-এর মতে ৬,২১৮; মক্কার গণনা মতে ৬,২১২; বসরার গণনা মতে ৬,২২৬; ইরাকের গণনা মতে ৬,২১৪ টা।

ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত আয়িশা রা.-এর গণনাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কুরআনের কপিসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গণনা করলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। আমাদের এখানে প্রচলিত কুরআনের মধ্যে আয়াতের সংখ্যা পাওয়া যায় ৬,২৩৬ টা। এখানে ব্যাপক মতভেদের কারণ হলো– রাসুল সা. কোন কোন সময় কিছু কিছু আয়াত তিলাওয়াত শেষে থামতেন, আবার কখনও না থেমে মিলিয়ে পড়তেন। কেউ কেউ সে সকল আয়াতকে পৃথক ধরেছেন, আবার কেউ কেউ মিলিয়ে হিসেব করেছেন, যার ফলে এ রকম মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুর[১৬১] ভিত্তিতে আয়াত সংখ্যা : (১) ওয়াদার আয়াত ১০০০ টা; (২) ভীতি প্রদর্শক আয়াত ১০০০ টা; (৩) নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াত ১০০০ টা; (৪) আদেশসূচক আয়াত ১০০০ টা; (৫) উপমা সম্বলিত আয়াত ১০০০ টা; (৬) ঘটনাবলী সম্বলিত আয়াত ১০০০ টা; (৭) হালাল বিধান সম্বলিত আয়াত ২৫০ টা; (৮) হারাম বিধান সম্বলিত আয়াত ২৫০ টা; (৯) তাসবিহ বিষয়ক আয়াত ১০০ টা; (১০) বিবিধ প্রসঙ্গের আয়াত ৬৬ টি। মোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ টা।

আল-কুরআন নামকরণের কারণ ও তাৎপর্য : আল-কুরআন মানবজাতির জন্যে প্রেরিত বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমত এবং নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। কুরআনের ভাষা, ভাব, গ্রন্থনা বিন্যাস ও নামকরণ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

হাফিয ইবন হাজার আসকালানি রহ. বলেন, 'আরববাসীগণ সাধারণত ও বিশেষত নিজেদের সাহিত্যকর্মের যেভাবে নামকরণ করেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের নাম সেরূপে করেননি। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীসমষ্টির নাম কুরআন (قرآن) রেখেছেন। আরবগণ তাদের সাহিত্যকর্মের সংকলন বা সমষ্টিকে বলে থাকেন 'দিওয়ান'। আরবগণ তাদের 'দিওয়ানের' অংশ বিশেষকে বলেন, (قصيدة) 'কাসিদা'। কিন্তু আল-কুরআনের অংশ বিশেষের নামকরণ করা হয়, 'সুরা' (سورة) হিসেবে। আরবরা ছোট বাক্যকে 'বাইত' (بيت) বলে। কিন্তু কুরআনের বাক্যকে বলা হয় আয়াত (أيت)।' কি

---

১৬০. মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাশেম গাজী ও অন্যান্য, *বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন*-১, প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৪-৭৫

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৪

তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের কারণে আল্লাহর এ কিতাবকে আল-কুরআন নামকরণ করা হয়েছে এ বিষয়ে অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে আল্লামা তাকি উসমানির মন্তব্যটা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,

'কুরআন অবতরণকালে আরবের অবিশ্বাসীরা এ কুরআনের পবিত্র বাণী শুনতে চাইত না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তারা নানারূপ হট্টগোল ও শোরগোল করত। কাফিরদের এ হীন আচরণ ও কদর্য ব্যবহারের জবাবে আল-কুরআন (পঠিত গ্রন্থ) নাম রেখে বুঝানো হচ্ছে– তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা কুরআনের সুমহান বাণীকে ঠেকাতে চাও, কিন্তু কিছুতেই তা পারবে না। পবিত্র এ কিতাব 'পঠিত' হওয়ার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, আজ পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য হচ্ছে, পৃথিবীতে একমাত্র কুরআনই সবচেয়ে বেশি পঠিত ও পঠিতব্য গ্রন্থ।'[১৬২] কুরআন বিশেষজ্ঞগণের কয়েকটি ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

আল্লামা মাজদুদ্দিন ফিরুযাবাদী বলেন, (১) এ গ্রন্থে বহু আয়াত ও সুরার সমষ্টি, (২) পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহিফাসমূহে যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছিল, তার সার-সংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে, ফলে একে কুরআন নামকরণ করা হয়েছে।[১৬৩]

বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ফাররার মতে, 'যেহেতু কুরআনের আয়াতসমূহ একটা অপরটার সত্যতা প্রমাণকারী ও সাদৃশ্যপূর্ণ; তাই একে কুরআন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তার মতে কুরআন কারাইন (قرائن) (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিস) শব্দ থেকে এসেছে।'[১৬৪]

ইমাম রাগিব ইস্পাহানি 'কুরআন' শব্দের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কিতাবকেই কুরআন বলা হয়েছে এ জন্য যে, আসলে এ কিতাবেই অন্যান্য সকল আসমানি কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূলত, বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান এবং যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমের সমাবেশ ঘটেছে এ কিতাবে।'[১৬৫]

আল-কুরআনের অন্যান্য নাম : 'কুরআন' ছাড়াও পবিত্র কুরআনের আরো অনেক গুণবাচক ও প্রশংসিত নাম আছে। যেমন, (১) আল-কালাম, (২) আল-নুর, (৩) আল-হুদা, (৪) আশ-শিফা, (৫) আত-তানযিল, (৬) আল-হিকমাত, (৭) আল-হাকিম, (৮) আর-রুহ, (৯) আল মাসানি, (১০) আল-হাবলু, (১১) আল-মাজিদ, (১২) আল-বায়ান, (১৩) আল-বালাগ, (১৪) আল-বুরহান, (১৫) আল-মুবিন, (১৬) আর-মুসহাফ, (১৭) আন-নাজাত, (১৮) আর-রাহমাত ও (১৯) সিরাতুম মুস্তাকিম ইত্যাদি নাম কুরআনে পাওয়া যায়।[১৬৬]

আল্লামা আবুল মা'আলি 'আল-বুরহান' নামক গ্রন্থে আল-কুরআনের গুণবাচক ও প্রশংসিত মোট ৫৫ টা নামের উল্লেখ করেন। আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি রহ. তার রচিত 'আল ইতকান ফি 'উলুমিল

---

১৬২. মাওলানা মুহাম্মদ তাকি উসমানি, *উলুমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৬৩. ড. শাহ্ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৬৪. আল রাগিব আল ইস্পাহানি, *মুফরাদাত আলফাজিল কুরআন*(দামিশক : দারুল কলম, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৯), পৃ. ৬২৭

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫

১৬৬. আল রাগিব আল ইস্পাহানি, *মুফরাদাত আলফাজিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

কুরআন' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে আল কুরআনের ৫৫ টা নামের উল্লেখ করেছেন। 'ফাতহুর রহমান' কিতাবে কুরআনের ৯০ টা নাম উল্লিখিত হয়েছে।[১৬৭] তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম দু'টো হলো, আল কুরআন (القرآن) ও আল-ফুরকান (الفرقان)। আল্লাহর তা'আলা বলেছেন, تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِه لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا 'কতই না মহান তিনি! যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।'[১৬৮] ইবন জারির তাবারি রহ. তার তাফসির গ্রন্থে লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে বিশেষ ৪ টা নামে উল্লেখ করেছেন। তাহলো– (১) আল-কুরআন (অধিক পঠিত গ্রন্থ); (২) আল-ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী); (৩) আল-কিতাব (মহাগ্রন্থ); (৪) আর-যিকর (স্মারক ও উপদেশ)। মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন গ্রন্থে উক্ত চারটা নামসহ তানযিল নাম যোগ করে পাঁচটা নাম রয়েছে।[১৬৯] পবিত্র কুরআনে 'কুরআন' নামটা উচ্চারিত হয়েছে ৬১ মতান্তরে ৬৬ বার।[১৭০]

কুরআনুল কারিমের বিষয়বস্তু

কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, কতগুলো আয়াতের সমষ্টি। সমগ্র কুরআনুল কারিমের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ (মতান্তরে ৬২৩৬, ৬২৪০ বা ৬২৪৭)।[১৭১] কিন্তু সকল আয়াত একই শ্রেণিভুক্ত নয়। এতে রয়েছে ইসলামের যাবতীয় মূলনীতির উৎস এবং সার্বিক বিধি-বিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলিল। বিশ্বের প্রতিটা জিনিস শ্রেণিবদ্ধ বা বিষয়ভিত্তিক। প্রতিটা জিনিসের কোন না কোন বিষয়বস্তু আছে। যে জিনিসের বিষয়বস্তু নেই তার কোন মূল্য নেই, সেটা ভিত্তিহীন। মূলত লেখকের গল্প ও প্রবন্ধ, কবির কবিতা, ছড়াকারের ছড়া, বক্তার বক্তব্য, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদি সব কিছুই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। কুরআন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয়বস্তুর আঁধার। কুরআনে সকল বিষয়বস্তুর কোন কোনটা স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত আকারে ইশারা-ইঙ্গিতে আবার কোন কোনটা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর কোন কোনটা আবার বিভিন্ন জাগতিক কর্ম তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোন কোনটা ইবাদতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পবিত্র কুরআনে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছুই বিবৃত হয়েছে। কুরআন যেহেতু বিশাল ও ব্যাপক বিষয়ের সমাহার কাজেই এর সঠিক নির্ভুল বিষয়বস্তু নিরূপন করা সম্ভব নয়। কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহ মূলত দ্বিবিধ। যথা– (১) আয়াতে মুহকামাত এবং (২) আয়াতে মুতাশাবিহাত।

(১) আয়াতে মুহকামাত : আয়াতে মুহকামাত বলতে সে সকল আয়াতকে বুঝিয়ে থাকে যাতে আল্লাহর হুকুম-আহকাম বা বিধি-বিধান ঘোষিত হয়। এ সমস্ত আয়াতে ইসলামের মৌলিক বিধান ও নীতি

---

১৬৭. ড. শাহ্ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২; আল্লামা আবুল মা'আলি উযাইযি ইবন আবদুল মালিক শায়দালাহ (মৃ. ৪৯৪ হি.) তার 'আল বুরহানু ফি মুশকিলাতিল কুরআন' গ্রন্থে কুরআনের ৫৫ টি নামের উল্লেখ করেছেন। দ্র. আল্লামা সুয়ুতি রহ., *আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫০

১৬৮. আল কুরআন, ২৫ : ১

১৬৯. মাওলানা মুহাম্মদ তাকি উসমানি, *উলুমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১৭০. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, *কুরআন পরিচিতি*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৭), পৃ. ১৩

১৭১. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৫তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭), পৃ. ১১৮, ১২২; অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী, *পবিত্র কোরআনের সারকথা*(ঢাকা : এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারী প্রেস, ২০১৪), পৃ. vii

সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। এগুলোকে 'উম্মুল কুরআন'ও বলা হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহপাক বলেন, 'হে মু'মিনগণ, তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি দাখিল হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[১৭২] আরও বলা হয়েছে, 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পুরোপুরিভাবে উদযাপন কর।'[১৭৩] 'তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন কর না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।'[১৭৪] 'আর নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠিত রেখ, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।'[১৭৫] এ শ্রেণির আয়াতসমূহের মর্মার্থ নিয়ে কোনরূপ মতভেদ নেই।

(২) আয়াতে মুতাশাবিহাত : অন্য শ্রেণির আয়াতসমূহকে বলা হয়, আয়াতে মুতাশাবিহাত। এ শ্রেণির আয়াতসমূহ রূপক ও উপমা সহকারে বর্ণিত। এ আয়াতসমূহের অর্থ নিয়ে মতবিরোধের সম্ভাবনা আছে এবং অল্প-বিস্তর মতানৈক্য তাফসিরকারদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।[১৭৬] পাঠকের জ্ঞানদৃষ্টির প্রসারতার ক্রম অনুসারে এ সকল আয়াতের বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করাও অসম্ভব নয়। সুরা আন-নুরে বলা হয়েছে, 'আল্লাহপাক দ্যুলোক-ভূলোকের জ্যোতি স্বরূপ। তাঁর জ্যোতির রূপ এমন একটি দেয়াল গাত্রস্থিত গর্ত বা কুলুঙ্গি, যার মধ্যে আছে একটা প্রদীপ; স্বচ্ছ আয়নায় বা স্ফুটিকে ঢাকা এ প্রদীপ, এ স্ফুটিক পাত্রও যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এ প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে কল্যাণ পূত জলপাই বৃক্ষের তেল থেকে যে বৃক্ষ পূর্ব-পশ্চিম কোনো মুখিই নয় এবং যা অগ্নি সংযোগ ব্যতীতও উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করে। এটা আলোর উপর আলো, জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে খুশি আপন আলোর পানে চালিত করেন। মানুষের বুঝার সুবিধার জন্য আল্লাহপাক উপমা ও রূপক ব্যবহার করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।'[১৭৭] অন্যত্র আছে, '(হে রাসুল সা.)! তারা তোমাকে 'রুহ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন, এ রুহ আমার প্রভুর অনুজ্ঞা বিশেষ এবং তোমাদেরকে শুধু তত্ত্বজ্ঞানের স্বল্প মাত্রই প্রদত্ত হয়েছে।'[১৭৮] 'আলিফ-লাম-মিম' এগুলো সুস্পষ্ট ঐশীগ্রন্থের সাংকেতিক বাণী।'[১৭৯] কুরআন মাজিদ এ দ্বিবিধ আয়াতসমূহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে। কুরআনের তৃতীয় সুরা আলে ইমরানের মধ্যে সুস্পষ্টই বলা হয়েছে, 'তিনিই আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছেন। এর কতগুলো আয়াত সুনির্দিষ্ট অর্থবিশিষ্ট। এগুলোই কুরআনের মূলভিত্তি। অপর আয়াতগুলো একাধিক অর্থবোধক, রূপক শ্রেণিভুক্ত। কিন্তু যাদের হৃদয়ে কুটিলতা আছে তারা অশান্তি ও বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং অন্তর্গূঢ় মর্মার্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় এ আয়াতগুলোর অনুশীলন করে থাকে। এদের প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ তা'আলাই জ্ঞাত আছেন। আর জ্ঞানে যারা প্রতিষ্ঠিত তারা কেবল বলে থাকেন, আমরা এগুলোকে বিশ্বাস করি। কারণ সকল আয়াতই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। কিন্তু

---

১৭২. আল কুরআন, ২ : ২০৮
১৭৩. আল কুরআন, ২ : ৯৬
১৭৪. আল কুরআন, ২ : ১৯০
১৭৫. আল কুরআন, ২ : ৪৩
১৭৬. মাওলানা আব্দুর রহমান, *কোরান ও জীবনদর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
১৭৭. আল কুরআন, ২৪ : ৩৫
১৭৮. আল কুরআন, ১৭ : ৮৫
১৭৯. আল কুরআন, ২ : ১

জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্যেরা সদুপদেশ গ্রহণ করে না।'[১৮০] কুরআনের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক। কুরআন মাজিদের ব্যাপক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা সম্ভব নয়। ড. রাশিদুল আলম তার, 'মুসলিম দর্শনের ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থে পাঠকের চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কুরআন মাজিদে বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করেছেন। কুরআন মাজিদের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়।[১৮১] যথা–

(ক) বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মরমীয়, (খ) ঐতিহাসিক বিবরণ এবং (গ) বিধি-বিধান সংক্রান্ত।

আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু সুনাগরিক গঠনে সুরা আল-হুজুরাতের প্রভাব সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অর্ন্তভুক্ত। মূলত সুরা আল-হুজুরাতের আলোকে ইসলামের সামাজিক বিধানসমূহ মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মরমীয় আয়াতসমূহ : কুরআন মাজিদ শুধু একখানা ধর্মগ্রন্থ নয়; এটা সমস্যাপীড়িত মানব জীবনের পথচলার নির্দেশনামা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ যে সকল সমস্যার কবলে নিপতিত হয়, কুরআন সে সকল সমস্যা সমাধানের মূলনীতি প্রদান করে। মানুষের জীবনের পার্থিব সমস্যা যে একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে এবং তার সমগ্র জীবনের উপর এ দিকটা যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে কুরআন মাজিদের ছত্রে-ছত্রে তার আভাস পাওয়া যায়। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে রিক্ত-নিঃস্ব অবস্থার মধ্যে নয়। প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে; আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, ভূগর্ভ ও সমুদ্রতলে মানুষের জন্য বহু উপকারী জিনিস রয়েছে; এগুলোকে আবিষ্কার ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করে মানুষের জীবনের অগ্রগতি ও সভ্যতার বিকাশ। কুরআনের বিপুল সংখ্যক আয়াতে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ উদঘাটন ও মানুষের কাজে নিয়োগ, সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার ও জীবনজগৎকে অনুধাবন প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণা চালানোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআন আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে। নিম্নে কুরআন মাজিদ থেকে কতগুলো আয়াতের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করে এ সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো :

(১) 'আমি প্রত্যেক সজীব পদার্থকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?'[১৮২]

(২) 'নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বিষয় তার পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।'[১৮৩]

(৩) 'আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈষম্যও তাঁর পরম বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। জ্ঞানীদের জন্য বাস্তবিকই এতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিহিত আছে।'[১৮৪]

(৪) 'হে রাসুল! আপনি বলে দিন, তোমরা পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখ তিনি কিরূপে আদি সৃষ্টির সূত্রপাত করেছেন।'[১৮৫]

(৫) 'তিনি তোমাদের উপকারের জন্য (ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে) যা কিছু আছে, সমস্তই সৃষ্টি করেছেন।'[১৮৬]

---

১৮০. আল কুরআন, ৩ : ৭

১৮১. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

১৮২. আল কুরআন, ২১ : ৩০

১৮৩. আল কুরআন, ৫৪ : ৪৯

১৮৪. আল কুরআন, ৩০ : ২২

১৮৫. আল কুরআন, ২৯ : ২০

(৬) 'আর আমি লৌহ অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষের জন্য কঠিন যুদ্ধাস্ত্র ও সুফলসমূহ রয়েছে।'[১৮৭]

(৭) 'আর আমি প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা অনুধাবন কর।'[১৮৮]

(৮) 'আর তোমরা গর্দভের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এ জন্য যে, আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করব এবং অস্থিপুঞ্জের প্রতি লক্ষ্য কর কিরূপে আমি তাকে সংযুক্ত করি তৎপর মাংসাবৃত করি।'[১৮৯]

(৯) 'তুমি সর্ব-প্রদাতার সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না। অতঃপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি কি তাতে ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ?'[১৯০]

(১০) 'তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন, আর দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে রত রেখেছেন, প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময়ে চলতে থাকবে।'[১৯১]

(১১) তিনিই রজনী ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন; এদের প্রত্যেকেই কক্ষপথে দ্রুত গমন করে থাকে।'[১৯২]

(১২) 'আমি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ছাদ করে দিয়েছি।'[১৯৩]

(১৩) 'হে পিপীলিকারা। তোমরা তোমাদের আবাসে প্রবেশ কর; যেন সুলাইমান ও তার সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে নিষ্পেষিত না করে।'[১৯৪]

(১৪) 'আর সমুদ্রের মধ্যে পর্বতাকার জলযানসমূহ তাঁর নিদর্শনাবলির অন্তর্গত।'[১৯৫]

(১৫) 'হে মানবগণ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; নিশ্চয়ই কিয়ামতের ভূমিকম্প গুরুতর বিষয়।'[১৯৬]

(১৬) 'তবে কি তারা তাদের উর্ধ্বে-সপ্ত আকাশের দিকে লক্ষ্য করেছে না যে কিরূপে আমি তা নির্মাণ করেছি এবং তা সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন দাগ নেই?'[১৯৭]

(১৭) 'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন।'[১৯৮]

(১৮) 'যিনি স্তরে স্তরে সাতটা আকাশ সৃষ্টি করেছেন।'[১৯৯]

---

১৮৬. আল কুরআন, ২ : ২৯
১৮৭. আল কুরআন, ৫৭ : ২৫
১৮৮. আল কুরআন, ৪ : ৫০
১৮৯. আল কুরআন, ২ : ২৫৯
১৯০. আল কুরআন, ৬৭ : ৩
১৯১. আল কুরআন, ৩৫ : ৯১
১৯২. আল কুরআন, ২৯ : ৩০
১৯৩. আল কুরআন, ২ : ২২
১৯৪. আল কুরআন, ২৭ : ১৮
১৯৫. আল কুরআন, ৩২ : ৩২
১৯৬. আল কুরআন, ২২ : ১
১৯৭. আল কুরআন, ৬৭ : ৩-৪
১৯৮. আল কুরআন, ২৫ : ৫৯

কুরআন মাজিদের উদ্বৃত আয়াতসমূহ ও অনুরূপ বহু আয়াত থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কুরআন মাজিদ শুধু ধর্মীয় বিধি-বিধানেরই আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; এটা মানুষকে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। মানুষকে সৃষ্টি রহস্য ও সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে। কুরআন মাজিদ মানুষের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তাকে নব-নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে দেয়।

কুরআনের সুরাসমূহের নামকরণের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা এ বিষয়ে অবহিত হতে পারি। যেমন, 'নমল' (পিপীলিকা), 'নাহল' (মধু-মক্ষিকা), 'দুখান' (ধূম, গ্যাস, কুয়াশা), 'নুর' (জ্যোতি), 'নাজম' (তারকা), 'কমার' (চন্দ্র), 'হাদিদ' (ইস্পাত), 'দাহর' (কাল), 'আল-বুরুজ' (রাশি), 'আদ-দুহা' (মধ্যহ্নকাল), 'রাদ' (বজ্রপাত) 'কাহাফ' (গহ্বর), জারিয়াত (ঝঞ্জাময় বায়ু) ইত্যাদি।

কুরআন মাজিদে দার্শনিক ও মরমীভাব সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে। নিম্নে এ জাতীয় কিছু আয়াতের অনুবাদ উদ্ধৃত হলো :

(১) 'দ্যূলোক-ভূলোক ব্যাপী তাঁর সিংহাসন বিরাজমান।'[২০০]

(২) 'তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।'[২০১]

(৩) 'আল্লাহর স্মরণ (সালাত)-এর দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'[২০২]

(৪) 'তিনি আদি ও অন্ত, প্রকাশ্য ও গুপ্ত, তিনি সর্বজ্ঞানী।'[২০৩]

(৫) 'আর আমি (আল্লাহ) মানুষের শাহরগ অপেক্ষাও নিকটবর্তী।'[২০৪]

(৬) 'তিনি তাদেরকে ভালবাসেন আর তারাও তাকে ভালবাসে।'[২০৫]

(৭) 'অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।'[২০৬]

ঐতিহাসিক আয়াতসমূহ : কুরআনের এ শ্রেণির আয়াতসমূহের একদিকে প্রেরিত পুরুষদের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, ধৈর্য সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে, অপরদিকে সত্যের বিরোধী শক্তির লোমহর্ষক অত্যাচার ও পরিণামে যুলুমকারী রাজা-বাদশাহদের পতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সত্যের স্বীকৃতি কিভাবে জাতি, সমাজ ও পরিবারকে উন্নতির চরম শিখরে অধিষ্ঠিত করে, পক্ষান্তরে সত্যের অস্বীকৃতি ও মিথ্যার অবলম্বনে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কি মহা অনর্থ ঘটায়, আল্লাহ সে জাতি, সমাজ ও পরিবারকে কিভাবে পর্যুদস্ত করেন, অমর্যাদা ও অবহেলার পঙ্কে নামিয়ে দেন, কুরআন মাজিদের বহু আয়াতে সে সম্পর্ক সুস্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত নুহ, মুসা ও ইসা আ.-এর কার্যাবলি, বনি ইসরাইল, আদ, সামুদ সম্প্রদায়, ফিরআউন, নমরুদ প্রসঙ্গে এবং হযরত রাসুল সা.-এর জীবনের কার্যাবলির সত্য ও অসত্য, ধর্ম ও অধর্মের জয়-পরাজয়ের বিষয় বিবৃত

---

১৯৯. আল কুরআন, ৬৭ : ৩১
২০০. আল কুরআন, ২ : ২৫৫
২০১. আল কুরআন, ৫৭ : ৪
২০২. আল কুরআন, ২ : ১৫২
২০৩. আল কুরআন, ৫৭ : ৩
২০৪. আল কুরআন, ৫০ : ১৬
২০৫. আল কুরআন, ৫ : ২৫
২০৬. আল কুরআন, ২ : ১৮৬

হয়েছে। এ সকল আয়াত বিশ্বমানবের সম্মুখে জীবনের পরিচ্ছন্ন নিয়ামক নীতি তুলে ধরেছে এবং সাবধান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

(১) 'তাদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায় রাসসের অধিবাসীরা, সামুদ আর 'আদ, ফিরআউন এবং লুত সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসীরা ও তুব্বা সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল– সকলেই নবী-রাসুলদের অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং আমার শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়েছে।'[২০৭]

(২) 'আদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল, অতএব আমার আযাব ও ভীতি দর্শনে কেমন হয়েছিল? আমি তাদের উপর এক প্রকাণ্ড ঝটিকা প্রেরণ করলাম কোন এক স্থায়ী অশুভ দিবসে। উক্ত ঝটিকা মানুষকে এমনিভাবে উপড়িয়ে নিক্ষেপ করল, যেন তারা উপড়ানো খেজুর বৃক্ষের ন্যায়।'[২০৮]

(৩) 'আর আমি এদের (মক্কাবাসীদের) পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে ফেলেছি, তারা শক্তিতে এদের অপেক্ষা অধিক ছিল এবং নগরসমূহে ঘুরে বেড়াত। তবুও তারা পলায়নের কোন স্থান পেল না।'[২০৯]

(৪) 'আমি লুকমানকে বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং আদেশ দিয়েছিলাম, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করো। বস্তুত যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে থাকে। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তার জানা উচিত আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিশ্বনন্দিত।'[২১০]

(৫) 'আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল আমি শু'আইবকে এবং যারা তার সাথে মু'মিন ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর সে যালিমদেরকে এক ভীষণ ধ্বনি আক্রমণ করল; ফলে নিজেদের গৃহসমূহের মধ্যে তারা অধোমুখে পড়ে রইল যেন কোন সময় এ গৃহসমূহে কেউ বসতি করেনি; শ্রবণ কর মাদইয়ানের রহমত থেকে বিচ্ছেদ ঘটল, সামুদ রহমত থেকে বিদূরিত হয়েছিল।'[২১১]

(৬) 'এদের পূর্বে নুহ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল। আর বলেছিল যে, এ ব্যক্তি পাগল এবং নুহকে ধমক দিয়েছিল। তখন নুহ স্বীয় প্রভুর নিকট প্রার্থনা করলেন, অতঃপর আমি মুষলধারে বৃষ্টির পানি দ্বারা আসমানের দরজা খুলে দিলাম এবং জমিন থেকে ফোয়ারা প্রবাহিত করে দিলাম। অনন্তর পানি সে কাজের জন্য মিলিত হল যা আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। এসব কিছুই সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য করেছিলাম।'[২১২]

(৭) 'হে মু'মিনরা, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হও, যেমন ইসা ইবন মারইয়াম হাওয়ারিদের বললেন, আল্লাহর জন্য কে আমার সহায় হবে? হাওয়ারিরা বলল, আমরা আল্লাহ তা'আলার সহায় হলাম। অতএব, বনি ইসরাইল গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক ইমান আনয়ন করল এবং কিছুসংখ্যক লোক অবিশ্বাসী থেকে গেল, পরিশেষে আমি মু'মিনদের তাদের শত্রুদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সাহায্য করলাম। ফলে তারা জয়ী হল।'[২১৩]

---

২০৭. আল কুরআন, ৫৯ : ১২-১৪
২০৮. আল কুরআন, ৫৪ : ১৮-২০
২০৯. আল কুরআন, ৫০ : ৩৬
২১০. আল কুরআন, ৩১ : ১২
২১১. আল কুরআন, ২ : ৯৪-৯৫
২১২. আল কুরআন, ৫ : ৯, ১৪
২১৩. আল কুরআন, ৬৪ : ১৪

বিধি-বিধান সংক্রান্ত আয়াতসমূহ : পবিত্র কুরআনে তৃতীয় শ্রেণির আয়াতসমূহ হল বিধি-বিধান সংক্রান্ত আয়াত। এ আয়াতসমূহ মুসলিমদের জীবন নিয়ন্ত্রণে আদেশ ও নির্দেশাবলি সম্বলিত। ইসলাম মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও পন্থা নির্দেশ করেছে। কুরআন এ সকল নির্দেশাবলি আমাদের নিকট পৌঁছে দেয়। কুরআনের এ শ্রেণির আয়াতসমূহ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নীতি নির্দেশ করে। এ সম্পর্কে এখানে এ শ্রেণিভুক্ত কতগুলো আয়াত উদ্ধৃত করা হল :

(১) 'হে মু'মিনরা, আল্লাহ ও রাসুলের আহ্বানে সাড়া দিও, যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন জীবনের প্রেরণাদায়ক আহ্বান আসে।'[২১৪]

(২) 'আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকেও উপাস্যরূপে গ্রহণ কর না; যদি কর তবে তুমি লাঞ্ছনা ও অপমানভরে বসে পড়বে।'[২১৫]

(৩) 'আত্মীয়-স্বজনকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান কর। আর গরিব-মিসকিন ও পথিক-মুসাফিরদেরও দান-খয়রাত কর এবং ব্যয়বহুল ধন-সম্পত্তির অপচয় কর না।'[২১৬]

(৪) 'ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যাবে না– নিশ্চয়ই এটা একটা গর্হিত কাজ এবং অকল্যাণের সুড়ঙ্গ পথ।'[২১৭]

(৫) 'তুমি যখন ওজন কর তখন পুরোপুরি ওজন কর। ওজনের দাঁড়িপাল্লা ঠিক রেখ। সব সময়ে এটাই বেশি লাভজনক ও কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।'[২১৮]

(৬) 'ধরাপৃষ্ঠে উল্লাসিত ও দাম্ভিক পদক্ষেপে চলাফেরা কর না। তুমি পদভরে নিশ্চয় ধরণীকে দ্বিধাবিভক্ত করতে পারবে না। উচ্চতায়ও তুমি পর্বতের নাগাল পাবে না। এসব চাল-চলনের বিশ্রী অসঙ্গতি তোমার প্রভূর নিকটে অত্যন্ত গর্হিত।'[২১৯]

(৭) 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন কর না।'[২২০]

(৮) 'ন্যায্য প্রাপ্য থেকে লোককে বঞ্চিত কর না ও অন্যায় দ্বারা পৃথিবীতে অনর্থের সৃষ্টি কর না।'[২২১]

(৯) 'আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ ও রাসুলের একান্ত অনুগত হয় এবং সৎকাজ করে, তাকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার দিব। তদুপরি তার জন্য (পরকালে) পর্যাপ্ত উপজীবিকার ব্যবস্থাও করেছি।'[২২২]

---

২১৪. আল কুরআন, ৮ : ২৪
২১৫. আল কুরআন, ১৭ : ২২
২১৬. আল কুরআন, ১৭ : ২৬
২১৭. আল কুরআন, ১৭ : ৩২
২১৮. আল কুরআন, ১০ : ১৫
২১৯. আল কুরআন, ১৭ : ৩৭
২২০. আল কুরআন, ২ : ৪২
২২১. আল কুরআন, ২৬ : ১৮৩
২২২. আল কুরআন, ৩৩ : ৩১

(১০) 'যে কেউ ভাল কাজে সুপারিশ করে সে কাজের জন্য সেও পূণ্যভোগী হবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে উৎসাহ জোগায় সে মন্দ কাজের জন্য সেও দা'য়ি হবে।'[২২৩]

(১১) 'নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের অগণিত প্রতিদান পুরোপুরিই দেয়া হবে।'[২২৪]

(১২) 'চোর স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, কুকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাদের হাত কেটে ফেলবে– এটাই আল্লাহর অভিপ্রেত আদর্শ শাস্তি। আল্লাহ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আধার।'[২২৫]

(১৩) 'তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।'[২২৬]

(১৪) 'নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে অপরের ধন গ্রাস কর না। আর বিচারকদের নিকট মামলা রুজু কর না– যেন জ্ঞাতসারে অপরের ধনসম্পত্তির কিয়দাংশ তোমরা অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে পার।'[২২৭]

(১৫) "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক কথা বল।'[২২৮]

(১৬) 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যবাদীদের সাথী হও।'[২২৯]

(১৭) 'তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর, কেননা ন্যায়বিচার তাকওয়ার খুব নিকটবর্তী।'[২৩০]

উপরের বিধি-বিধান সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করা হল। পবিত্র কুরআনের অনন্ত জ্ঞান-ভান্ডার সীমিত পরিসরে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। ইসলামি জীবনব্যবস্থা একটা সার্বজনীন ব্যাপার; কাজেই সেখানে মানব জীবনের পথচলার নির্দেশনামাও সুষ্ঠুভাবে ও সুস্পষ্টরূপে পরিব্যপ্ত। তবে সকলের অবগতি ও জিজ্ঞাসার কিঞ্চিত মাত্রা পরিতৃপ্তির জন্য এবং ইসলামি জীবনধারার বিশালতা ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিষয়বস্তুর কিছুটা আভাস দেয়ার জন্য সংক্ষেপে কিছু বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হল। কুরআনুল কারিমের ব্যাপক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী তার 'পবিত্র কুরআনের সারকথা' গ্রন্থে পাঠকের চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কুরআন মাজিদের বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কুরআন মাজিদের বিষয়বস্তুকে প্রধানত সাতটা ভাগে ভাগ করেছেন।[২৩১] যথা–

(১) মহান আল্লাহপাক তাঁর নিজ সম্পর্কে যা বলেন, (২) পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেন, (৩) রাসুল মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেন, (৪) মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেন, (৫) মানুষের কল্যাণে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, (৬) ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ যা বলেন এবং (৭) ইসলামে গণতন্ত্র।

---

২২৩. আল কুরআন, ৪ : ৮৫
২২৪. আল কুরআন, ৩৯ : ১০
২২৫. আল কুরআন, ৫ : ৩৮
২২৬. আল কুরআন, ২ : ১৯০
২২৭. আল কুরআন, ২ : ১৮৮
২২৮. আল কুরআন, ৩৩ : ৭০
২২৯. আল কুরআন, ৯ : ১১৯
২৩০. আল কুরআন, ৫ : ৮
২৩১. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী, *পবিত্র কোরআনের সারকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. vii

কুরআন মাজিদ মুসলিমদের জীবন দর্শনের মূল উৎস, এটা আমাদের ধর্মীয়, নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতির নির্দেশনামা। ইসলাম ধর্মের মূলনীতিসমূহের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হিসেবে ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন মাজিদের সর্বোচ্চ মূল্য নিরূপিত হলেও এর সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়। অল্প কথায়, মুসলিম জাতির পার্থিব ও আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক ও আত্মিক উন্নতির মূল শক্তি, মূল প্রেরণা মহাগ্রন্থ কুরআন। আল্লাহর কালাম কুরআন মাজিদ তাই বিশ্বের এক পরম বিস্ময়। বলাবাহুল্য কুরআনের শিক্ষার আলোকে আজও মুসলিম জাহান হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন সাধনা ও জাতীয় জীবনে কুরআনিক শিক্ষার প্রতিফলন; বাস্তবায়ন। কুরআন শ্রবণ করে এর মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে জিনদের একটা দল তাই নিজ জাতির কাছে গিয়ে বলেছিল, আল কুরআনের বর্ণনাতীত ভাব ও ভাষা খুবই বিস্ময়কর ও অশ্রুতপূর্ব। এটা এতটাই সৌন্দর্যময় যে, এটা সকলকে সত্যের দিকে ধাবিত করে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে,

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا. يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.

'বলুন! আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করেছিল এবং তারা বলেছিল– আমরা তো বিস্ময়কর কুরআন শুনে এসেছি, যা সত্য-সুন্দর পথের দিশারি। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস করেছি। আর আমরা কখন আমাদের প্রভূর সাথে কোন শরিক স্থাপন করব না।'[২৩২]

মহাগ্রন্থ কুরআনের ছত্রে ছত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে। কুরআন মানুষকে নৈসর্গিক ঘটনাবলি, স্বর্গ-মর্তের সৃষ্টি, ঋতুর পরিবর্তন, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, মানবজাতির উত্থান-পতন সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য বারবার নির্দেশ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল যে আরোহ পদ্ধতি তা কুরআনের শিক্ষা থেকেই উদ্ভুত। 'ইকরা' শব্দটার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল ইসলামের যাত্রা, যে জীবন ব্যবস্থায় বলা হয়েছে, تدارس العلم ساعة من الليل خير من أحيائها 'রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান অর্জন করা সারা রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম।'[২৩৩]

কুরআনুল কারিমের অন্যূন সাত শতাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও এ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজ্ঞানী নবী হযরত মুহাম্মদ সা. কুরআনের সমার্থক মূল্যবান পথনির্দেশ করেছেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে জ্ঞানের মহিমাকে উচ্চকিত করেছেন। কুরআনের সুমহান নির্দেশ এবং রাসুলের মৌলিক আদর্শ বুকে ধারণ করে যাযাবর এক অন্ধকারচ্ছন্ন আরব জাতি অচিরেই বিশ্ব সভ্যতার মশালকে নিজেদের হাতে ধারণ করেছিলেন।

ফলে মধ্যযুগের সে কুহেলিকায় জ্বলে উঠেছিল এক দেদীপ্যমান আলোর উৎস। পুরনো জাতিসমূহের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহে মেতে উঠেছিল মুসলিম অনুবাদকবৃন্দ, জ্ঞান গবেষণার এক পর্যায়ে তারা জন্ম দিয়েছিলেন এক অসামান্য যুগের– যা বিশ্ব সভ্যতায় আরব সভ্যতা নামে পরিচিত হলেছিল। শিক্ষা ও

---

২৩২. আল কুরআন, ৭২ : ১-২

২৩৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমি, *সুনান আদ-দারিমি*(করাচি : কদিমি কুতুবখানা, ১৪০৭ হি.), খ.১, হাদিস নং ৬১৪, পৃ. ১৫৭

বিজ্ঞানের উন্নয়নে এবং জ্ঞান-গবেষণার নতুন নতুন অভিধার তালাশে মুসলিম বিজ্ঞানী ও মণীষীরা পৃথিবীর সামনে জ্বালালেন এমনই দীপ্ত শিখা যা সে নবম-দশম শতাব্দী থেকে অষ্ট-ঊনবিশ্ব শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘকাল পরিক্রমায় যুক্ত করল এক অনন্য মাইল ফলক। নবী কারিম সা. বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।'[২৩৪] ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। কুরআন শাশ্বত বিধান। বিজ্ঞান এবং ধর্ম পৃথক জিনিস নয়, যদি না উভয়ের পথ দু'দিকে বেঁকে যায়।[২৩৫] ইতিহাস বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, 'Science without religion is lame and religion without science is blind.'[২৩৬]

Dr. Hartwig Hirschfeld বলেন,

> 'We must not be surprised to find the Qur'an the fountainhead of sciences. Every subject connected with heaven or earth, human life,commerce and various trades are occasionally touched upon and thisgave rise to the production of numerous monographs formingcommentaries on parts of the Holy (Noble) Book..'[২৩৭]

প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ পণ্ডিত Emmanuel Deutseh, মন্তব্য করেন,

> 'By the aid of the Quran the Arabs Canquered a World greater than that of Alexandr the great, greater than that of Rome…..by the aid of the Quran they alone of all semites come to Europe as kings. Whither the Phoenicians had come as tradersmen, and the Jews as fugitives or cuptives; came to Europe to hold up together whih these fugitives the light to humarinty; they alone, whik darkness Layaroun.to raise up, the wisdom and knowledge of hellas from the dead,to teach, philosophy,medicine, astronomy and the golden art of song to the west as cto the East, to stand at cradle of modern science.'[২৩৮]

বাস্তবিকপক্ষে কুরআন মাজিদ লাওহি মাহফুযে সংরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকে কদরের রাতে বাইতুল ইযযাতে একসাথে অবতরণ করা হয়। বাইতুল ইযযাত থেকে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী সা. এর উপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। আল কুরআনে রয়েছে ৩০ পারা, ১১৪ সুরা, ৭ মনযিল, ৫৫৪ রুকু ও ৬২৩৬ টি আয়াত। কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ প্রধানত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মরমীয়; ঐতিহাসিক বিবরণ ও বিধি-বিধান সম্বলিত বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। আর এ সকল বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের অবস্থান।

---

২৩৪. ইমাম আবূ দাউদ (র), অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪, হাদিস নং ৩৬০২, পৃ. ৪৭৩

২৩৫. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, জুন ২০০২), পৃ. ১

২৩৬. Albert Einstein, *Science and religion*(New York : New York Times Magazine, November 9, 1930), p. 54

২৩৭. Dr. Hartwig Hirschfeld, *New Researches into the Composition and Exegesis of the QorÁn*(London : Royal Asiatic Society, 1902), pp. 9, 12, 13

২৩৮. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, *কুরআন পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

বিশ্বের একমাত্র মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর এক অসীম-অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অমূল্য নি'আমত। এ কুরআন গোটা মানবজাতির জন্য অনির্বাণ পথপ্রদর্শক ও শাশ্বত পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এমন কোন বিষয় নেই যা এ গ্রন্থে আলোচিত ও উপস্থাপিত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণের সমন্বয় হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এটা মানবের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিশারি। এটা সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর এবং সামগ্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহক। পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য অপরিসীম ও অফুরন্ত। নিম্নে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের কতিপয় দিক উপস্থাপন করা হলো :

পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ, মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত আসমানি কিতাব। সর্ববিধ কল্যাণের আকর এ কিতাব। কুরআনের প্রভাব এতই গভীর যে, একে যদি কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করা হত, তাহলে সে পর্বত বিদীর্ণ হয়ে যেত। এর অতীব মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন,

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَه خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ط وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

'আমি যদি এ কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে নত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এ দৃষ্টান্ত এজন্য মানবজাতির সামনে পেশ করলাম, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।'[২৩৯] কুরআন অতীব মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ, এটা লাওহি মাহফুজে সুরক্ষিত, যা পবিত্র সত্তা ছাড়া স্পর্শ করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّه لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ. فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ. لاَ يَمَسُّه إِلاَّ الْمُطَّهَّرُوْنَ.

'নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পূত-পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।'[২৪০] আল্লাহ বলেছেন,

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِىْ سَفَرَةٍ. كِرَامٍ م بَرَرَةٍ.

'তা আছে মহান লিপিসমূহে, যা সমুন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র মহান পূত-চরিত্র লিপিকার হতে লিপিবদ্ধ।'[২৪১] আল-কুরআন মুসলিম উম্মাহর জন্য খুবই সম্মান ও গৌরবের বিষয়। রাসুলুল্লাহ সা. একটা হাদিসে বর্ণনা করেছেন,

إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن.

---

২৩৯. আল কুরআন, ৫৯ : ২১
২৪০. আল কুরআন, ৫৬ : ৭৭-৭৯
২৪১. আল কুরআন, ৮০ : ১৩-১৬

'নিঃসন্দেহে প্রত্যেক জিনিসেরই কিছু সম্মান বা গৌরবের বিষয় থাকে। সেরূপ আমার উম্মতের সৌন্দর্য ও গৌরবের বিষয় হল আল-কুরআন।'[২৪২]

সর্বশেষ আসমানি কিতাব : পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না। এর আগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবুর, ইনযিল নামক আরও বড় তিনটা আসমানি কিতাব এবং ১০০ খানা সহিফা বিভিন্ন নবী-রাসুলের কাছে নাযিল হয়েছিল। বিভিন্ন বিপর্যয় এবং ইয়াহুদি-খ্রিস্টান পাদ্রীদের কারসাজিতে ঐসব গ্রন্থের অহির আসল ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ, আল্লাহ চেয়েছেন আল-কুরআনই বিশ্বের বুকে মানুষের জন্য শেষ এবং অমোঘ বাণী হয়ে থাকুক। এভাবে আসমানি কিতাব ও সহিফা নাযিল করে পরবর্তী কালের জন্য পরিপূর্ণ সর্বশেষ পয়গাম পাঠালেন আল-কুরআন। যা যুগ ও সামাজিক পরিবর্তনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য এ আল-কুরআনই কিয়ামত পর্যন্ত পথ-নির্দেশ করবে। এজন্য অন্য কোন কিতাবের অস্তিত্ব আল্লাহ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

الر ۚ كِتَابٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۙ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

'আলিফ-লাম-রা! এ কিতাব, ইহা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি বিশ্ব মানবতাকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে বের করে আনতে পারেন আলোকোজ্জ্বলতার মুক্তির রাজপথের দিকে। যিনি মহাপরাক্রমশালী, সুপ্রশংসিত।'[২৪৩] আল্লাহপাক আরও বলেছেন, إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ 'এটা তো বিশ্বজগতের জন্য স্মারকগ্রন্থ।'[২৪৪]

চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ : অতীত যুগের সকল আসমানি গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী, জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজিদ কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি, বরং এটা সর্বকালের সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বাত্মক হিদায়াতের সওগাত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এটা চিরন্তন ও শাশ্বত বিশ্বজনীন গ্রন্থ। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّه عِوَجًا.

'প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; আর এতে তিনি বক্রতা তথা অপূর্ণতা রাখেননি।'[২৪৫] কুরআনে এসেছে, قُلْ يٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ 'হে রাসুল! আপনি বলুন, হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে সত্য পথের দিশা এসেছে।'[২৪৬]

---

২৪২. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৯৯৫), খ.১৯, হাদিস নং ২৫৩০২

২৪৩. আল কুরআন, ১৪ : ১

২৪৪. আল কুরআন, ৩৮ : ৮৭

২৪৫. আল কুরআন, ১৮ : ১

২৪৬. আল-কুরআন, ১০ : ১০৮

তিনি আরও বলেছেন, يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে শাশ্বত-চিরন্তন প্রমাণ এসেছে, আর আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা অবতীর্ণ করেছি।'[২৪৭]

অতএব, পবিত্র কুরআন শুধু একখানা গ্রন্থ নয়; বরং বিশ্বগ্রন্থ। এর আবেদন বিশ্বজনীন, সার্বজনীন এবং কালজয়ী।

পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা : পবিত্র কুরআনই ইসলামি জীবন দর্শন ও জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামি শারি'আতের মূলনীতি ও অনুশাসনের উৎস এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনের উপরই ইসলামের সম্পূর্ণ ইমারতের অবকাঠামো অধিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছেন। আল্লাহর সে খিলাফতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানবজাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যেসব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দিবে, তার সবকিছুরই মূলধারা ও মূলনীতি পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। কুরআনে মানবজীবনের ইহকালীন ও পরকলীন সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কুরআনই বিশ্বমানবতার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ আসমানি নির্দেশনা। হযরত মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ ও বিশ্বনবী। কাজেই কুরআনের মাধ্যমে ইসলামি জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এরপর জীবন বিধান হিসেবে, জীবন দর্শনরূপে বা জীবন পথের দিশা স্বরূপ কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। জীবনব্যবস্থার পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيْنًا.

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত রাশি তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থারূপে ইসলামকে মনোনীত করলাম।'[২৪৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ '(হে রাসুল!) আপনার উপর এমন এক মহাগ্রন্থ নাযিল করেছি, যা সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং মুসলিমদের জন্য সৎপথের দিশারি, করুণা ও সুসংবাদস্বরূপ।'[২৪৯] আল-কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে জীবন বিধান হিসেবে মেনে না নিলে, তারা হবে কাফির। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ 'যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী শাসন-পরিচালনা করে না তারা কাফির।'[২৫০] হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেন, 'যে কুরআনকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে যথেষ্ট মনে করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।'[২৫১]

---

২৪৭. আল কুরআন, ৪ : ১৭৪

২৪৮. আল কুরআন, ৫ : ৩

২৪৯. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

২৫০. আল কুরআন, ৫ : ৪৪

২৫১. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, সেপ্টেম্বর ২০১০), খ.১০, হাদিস নং ৬৬৫৬, পৃ. ৪০৭

চূড়ান্ত দলিল : ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইসলামের নীতি তথা আইন-কানুন সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনায় পবিত্র কুরআনই চূড়ান্ত দলিল বলে গৃহীত। এতেই মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় ও ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে। এটা মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ঘোষণা করেন, هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ 'এ কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ এবং অনুগ্রহ।'[২৫২] তিনি আরও বলেছেন, يٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট চূড়ান্ত প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের জন্য অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা অবতীর্ণ করেছি।'[২৫৩] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَأَبٰى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوْرًا.

'মানবজাতির জন্য আমি এ কুরআনে যাবতীয় উপমা দিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশই তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে।'[২৫৪]

অতীত আসমানি গ্রন্থের শিক্ষা ও সার-নির্যাস : অতীত নবী-রাসুলগণের দা'ওয়াত ও হিদায়াতের সমষ্টি এবং সকল আসমানি কিতাবের শিক্ষার সার-নির্যাস হল এ পবিত্র আল-কুরআন। যা সকল গ্রন্থের কার্যকারিতা রহিত করে দিয়ে পথভ্রষ্টতার গহিনে নিমজ্জিত মানবতাকে চিরায়ত মুক্তির প্রদীপ্ত পথ সিরাতুম মুস্তাকিমের সন্ধান দিয়ে চলেছে যুগ-যুগান্তরে। কুরআনে উত্তম কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ق صلى 'আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমনিভাবে এ কুরআন তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি।'[২৫৫] আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ মহাগ্রন্থের বিশিষ্টতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এটা সে গ্রন্থ, যা নবীদের উপর অবতীর্ণ সকল গ্রন্থাবলির সত্যতা স্বীকার করে। এ মহাগ্রন্থে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও আদর্শের সার-সংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمِنْ قَبْلِه كِتٰبُ مُوْسٰى إِمَامًا وَّرَحْمَةً ط وَهٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ق صلى.

'এর পূর্বে ছিল মুসা (আ.)-এর কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ, এ কিতাব এর সমর্থক।'[২৫৬] আল্লাহ আরও বলেছেন, إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى. صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى 'নিশ্চয়ই একথা পূর্বে অবতীর্ণ ইবরাহিম ও মুসা আ.-এর সহিফাসমূহেও বলা হয়েছে।'[২৫৭] তিনি আরও বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

---

২৫২. আল কুরআন, ৪৫ : ২০
২৫৩. আল কুরআন, ৪ : ১৭৪
২৫৪. আল কুরআন, ১৭ : ৮৯
২৫৫. আল কুরআন, ১২ : ৩
২৫৬. আল কুরআন, ৪৬ : ১২
২৫৭. আল কুরআন, ৮৭ : ১৮-১৯

'তাদের বিবরণীতে বিবেকবান লোকদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী– যা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য এটা পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ এবং করুণা।'[২৫৮]

চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় একমাত্র উত্তীর্ণ গ্রন্থ : বহু অর্বাচীন যুগে-যুগে একে মানবমস্তিষ্ক প্রসূত বলে চরম ব্যর্থতার গ্লানি আনত শিরে স্বীকার করে নিয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রামাণিকতা মেনে নিয়েছে। আর এটা যে মানবাতীত মহান সত্ত্বা আল্লাহর প্রত্যক্ষ কালাম, নিশ্চিতভাবে ইলাহি উৎস (Divinine origin) থেকে উৎসারিত পবিত্র বাণী তা অকাট্যভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরবগণ নিজেদের ভাষার সাহিত্য রস ও লালিত্য সম্পর্কে গর্ববোধ করত। এজন্য তারা অনারবদের 'আজমি' বা মূক বলে অভিহিত করত। যখন রাসুল সা.-এর উপর কুরআন অবতরণ শুরু হয়, তখন কুরআনের ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কার তাদের গর্ব অহংকারকে ম্লান ও নিষ্প্রভ করে দেয়। আল-কুরআনের বাক্যশৈলী, বলিষ্ঠ যুক্তিধারা ও ভাষার মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে লোকেরা ইসলামের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে।

ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিকরা নিজেদের কুসংস্কার ও জিদের বশবর্তী হয়ে একে কবিতা, যাদু ইত্যাদি বলে উপহাস করে। আল-কুরআনের এটা একটা বড় মু'জিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি। আল্লাহর চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় কোন মানুষ বা জিন জাতি অদ্যবধি তো নয়ই, কিয়ামত পর্যন্ত যা কল্পণাতীত ও অবাস্তব। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ছুড়ে দেয়া আছে। যুগে যুগে বহু মানুষ বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী মহল এমন কি ইয়াহুদি-খ্রিস্টান জগৎ এ বিজ্ঞানের যুগেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় কেউ সফল হয়নি; কখন হবেও না। কুরআন বিরোধীরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থতার গ্লানি আনতে শিরে স্বীকার করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে অকুণ্ঠ চিত্তে তারা ও বলতে বাধ্য হয়েছে, لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ 'না– এটা কোন মানুষের বাণী নয়।' আল্লাহপাক বলেছেন, أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ 'তারা কি বলে, তিনি (নবী) এটা রচনা করেছেন? বলুন, তবে তোমরা এর মত একটা সুরা রচনা করে আন।'[২৫৯]

অবশ্য এ অক্ষমতার কথা চ্যালেঞ্জ করে সুরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা আগেই বলেছেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতরণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে তোমরা তার অনুরূপ কোন সুরা রচনা করে আন। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাক। তোমরা যদি সত্যবাদী হও।'[২৬০]

---

২৫৮. আল কুরআন, ১২ : ১১১
২৫৯. আল কুরআন, ১০ : ৩৮
২৬০. আল কুরআন, ২ : ২৩

কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করে অনুরূপ কোন সুরা বা বাক্য তৈরি করতে পারেনি। কুরআনের এ অনন্যতা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, সমগ্র মানবজাতি এবং জিন জাতি একত্রিত হয়ে সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى أنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَ يَأْتُوْنَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

‘(হে রাসুল!) আপনি বলুন, যদি এ কুরআনের মত কুরআন রচনার জন্য সমগ্র মানব ও জিন জাতি সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর মত সামান্যও উপস্থাপন করতে পারবে না।’[২৬১]

বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক : কুরআনুল কারিম শারি‘আতের প্রধান উৎস। এতে আছে বিশ্ব মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশনা। আল্লাহ বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

‘কুরআন বিশ্ব মানবতার দিশারি, যা মানুষের সৎপথ প্রদর্শনের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও নির্দেশাবলি এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে অবতীর্ণ হয়েছে।’[২৬২]

অতীব বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল গ্রন্থ : অতীত উম্মতগণ তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ এবং তাদের নবীর শিক্ষা কালক্রমে নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে বিকৃতির অতলান্তে পৌঁছিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনই কেবল এমন এক গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতির অভিশাপ থেকে চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র অবস্থায় অবিকল বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনের ঘোষণা, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لاَ رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ‘এ মহাগ্রন্থে সংশয়-সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নেই, আর এটা মুত্তাকিদের জন্য সৎ পথ প্রদর্শক।’[২৬৩] অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ ‘নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।’[২৬৪] আল-কুরআনের অনন্য মর্যাদা ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হল এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ গ্রন্থ। এটা তাঁর চিরন্তন বাণী। এটা মানব জাতিকে সত্য ও মুক্তির সন্ধান দেয়।

সর্বাধিক পঠিত, প্রচারিত ও হৃদয়গ্রাহী : সর্বাধিক প্রচারিত ও আলোচিত গ্রন্থ হল কুরআন মাজিদ। পৃথিবীতে অন্য কোন গ্রন্থ এরূপ প্রচারিত ও পঠিত হয় না। মুখস্থ করে হৃদয়গ্রাহী করার একমাত্র উপযোগী গ্রন্থ আল-কুরআন। জাহিলি যুগের বর্বরতা কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে দূরীভূত হয়েছিল। আল-কুরআন হল দুনিয়া ও আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণের দিশারি। পৃথিবী ব্যাপী রয়েছে লক্ষ লক্ষ কুরআনের হাফিজ, যারা সার্বক্ষণিক চর্চারত। যে সংখ্যা প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান।

কুরআনের ভাষা ও গুণগত মান : আল-কুরআন এক অতুলনীয়, অনুপম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। আল-কুরআনের অত্যুচ্চ ভাব-ভাষা, অলঙ্কার, উপমা, ছন্দ-মূর্ছনা, রচনাশৈলী বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা,

---

২৬১. আল কুরআন, ১৭ : ৮৮
২৬২. আল কুরআন, ২ : ১৮৫
২৬৩. আল কুরআন, ২ : ২
২৬৪. আল কুরআন, ১৫ : ৯

বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সব ঘিরে এক অতুলনীয় চিরন্তন-শাশ্বত সাহিত্যিক মানে সদা অধিষ্ঠিত। এ আসমানি গ্রন্থখানা মহানবী সা.-এর চিরন্তন মু'জিযাপূর্ণ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। কুরআনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য যে, চিন্তা-গবেষণা এবং সাহিত্যের বিচারেও আল-কুরআন অত্যুত্তম বিষয়সমূহের একটা মহোত্তম আকর। এর তিলাওয়াতের প্রভাব এতই গভীর যে, এর দ্বারা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের হৃদয়-মন জাগ্রত হয় এবং অন্তর আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়। বস্তুত আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর বাক্য, শব্দ, ভাব, ভাষা, পাঠ, উচ্চারণ খুবই সহজ-সুন্দর ও সাবলীল। এটা বুঝতে, মুখস্থ করতে, মনে রাখতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। এ কারণে প্রত্যেক যুগে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ হাফিয এবং কুরআনের অসংখ্যা ভাষ্যকার বিদ্যমান ছিল এবং আছে; আর কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এটাই কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার পরিচায়ক। আল্লাহপাকের ঘোষণা, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ 'এ কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?'[২৬৫] তিনি আরও বলেন, كِتبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِه وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ 'এটা একটা গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব, এটা পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটা বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ।'[২৬৬]

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা : আল-কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরের হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। কুরআনের এ সসীম কলেবরে লুকায়িত রয়েছে নিযুত-কোটি সাগরের বিশালতা। কুরআন এমন একটা মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ, যাতে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। প্রতিটা শব্দ-বাক্য ও বক্তব্য এতই ব্যাপকার্থক যে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত তাফসির গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

كِتبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُه قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ.

'এটা এমন এক গ্রন্থ, যা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে, এর আয়াতসমূহ আরবি ভাষায় কুরআন রূপে, যা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।'[২৬৭] কুরআনকে জ্ঞানগর্ভ কিতাব ও হিদায়াতের উৎস হিসেবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ. هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ 'এগুলো জ্ঞানগর্ভ বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত, পথ-নির্দেশ ও করুণার আধার সত্যপরায়ণদের জন্য।'[২৬৮] কুরআন বিভিন্ন বিষয়বস্তুর একটা হৃদয়স্পর্শী সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানকোষ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস : সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক, সৃষ্টি জগতের রহস্য, ভূতত্ত্ব, সৌরবিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন, মনোবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন-নীতি, সাম্য, ধর্মীয়, ব্যবহারিক প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের

---

২৬৫. আল কুরআন, ৫৪ : ২২
২৬৬. আল কুরআন, ৭ : ২
২৬৭. আল কুরআন, ৪১ : ৩-৪
২৬৮. আল কুরআন, ৩১ : ২-৩

সার্থক বর্ণনায় সমৃদ্ধ বিজ্ঞানময় এ পবিত্র কুরআন। অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ পবিত্র কুরআন সকল যুগের মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আবিষ্কারের নব-নব দিগন্তের সন্ধান দিয়ে আসছে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের চরম বিকাশে পবিত্র কুরআন অনুপম দিশারি। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার পবিত্র কুরআন। চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, বিবাহ, উত্তরাধিকার আইন, ভূতত্ত্ব, পদার্থ, রসায়ন. ন্যায়শাস্ত্র এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যার আলোচনা কুরআনে আসেনি। আল-কুরআনে এসেছে,

وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِىْ إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

'যাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা জানত আপনার প্রভুর নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। এটা মানবজাতিকে পরাক্রমশালী সপ্রশংসিত মহামহিম আল্লাহর পথ-নির্দেশ করে।'[২৬৯]

কুরআনে এসেছে, لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِى الْأَلْبَابِ ؕ 'তাদের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষা।'[২৭০]

সব সমস্যার সমাধান : এ মহান গ্রন্থে বিশ্বমানবতার সকল সমস্যার সুন্দর সমাধান রয়েছে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, এটা সকল সমস্যার মহৌষধ। পবিত্র কুরআনে এসেছে, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ 'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি যা সকল রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত।'[২৭১] মহানবী সা. এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

إن هذا القرآن حبل الله، والنور الْمبين، والشفاء النافع عصمة لِمن تمسك به، ونجاة لِمن تبعه.

'আল-কুরআন আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, কল্যাণময় প্রতিষেধক। যে সাদরে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে সে সম্মান পাবে এবং মুক্তির রাজপথ পাবে।'[২৭২]

সকল কিছুর আলোচনা : আল-কুরআন হচ্ছে মানব জীবনসংক্রান্ত একটা পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ। মহানবী সা. যেভাবে বিশ্বের সকল মানুষের নিকট আল্লাহর প্রেরিত মুক্তিদূত, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর উপর অবতারিত কুরআনও সর্বকালীন মুক্তির মহাসনদ। কুরআনে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহপাক বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

'আমি তোমার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী। আর মুসলিমদের জন্য হিদায়াত, রহমত এবং সুসংবাদ।'[২৭৩]

---

২৬৯. আল কুরআন, ৩৪ : ৬
২৭০. আল কুরআন, ১২ : ১১১
২৭১. আল কুরআন, ১৭ : ৮২
২৭২. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমি, *সুনান আদ-দারিমি*, প্রাগুক্ত, খ.২, হাদিস নং ৩৩১৫, পৃ. ৫২৩
২৭৩. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

কুরআন মাজিদের অন্যত্র এসেছে, مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ 'আমি কুরআনে কোন কিছু উল্লেখ করতে বাদ দেইনি।'[২৭৪] কুরআন মানুষের চিন্তা ও নৈতিক জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জীবনে এক কথায় জীবনের সকল পর্যায়ে এক মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হলেন বিশ্বনেতা মহানবী মুহাম্মদ সা., এবং তাঁর সংবিধান হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য : আল-কুরআন পৃথিবীর সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। এটা যে ভাষায়ই অনুবাদ করা হোক না কেন, এর ভাব সর্বদাই রুচিশীল এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এর প্রতিটা শব্দে, প্রতিটা বাক্যে আছে সাহিত্যের অনুপম, অনবদ্য ব্যঞ্জনা। বহু বিদগ্ধ ভাষাবিদ কুরআনের আঙ্গিক সৌন্দর্য ও অন্তর্গত সুষমায় মুগ্ধ হয়েছেন। ছন্দ ও গদ্যের নিখুঁত সন্নিবেশস্থল এ আল-কুরআন। কুরআন মাজিদের ভাষা সাবলীল ও ভাব গম্ভীর। উপমা, ছন্দ, অলঙ্করণ, গ্রন্থনা, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে এটা এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। আরবের বিখ্যাত সাহিত্যিকও কুরআনের সমমানের সৌন্দর্যের কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সক্ষম হননি। কুরআনের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। আরবি সাহিত্যে, এমনকি বিশ্ব সাহিত্যেও মূলনীতির নিরস বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের মত কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ নেই, আর কারও পক্ষে সম্ভবও নয়। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি এমনই প্রাঞ্জল, ধ্বনিসমৃদ্ধ ও ছন্দময় ও গতিশীল যে, অত্যন্ত কঠোর হুশিয়ারি বাণী নীতির একার্থক প্রকাশ ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে এটা উন্নীত হয়েছে।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অপূর্ব ধ্বনি ব্যঞ্জনা, শব্দের লালিত্য, বর্ণনার বলিষ্ঠতা ও প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা সর্বোপরি, রসবোধ কুরআনকে যেকোন ভাষায় রচিত প্রথম শ্রেণির সৃষ্টিধর্মী গ্রন্থসমূহের পুরোভাগেই স্থাপন করে। অধ্যাপক এম. এম. শরিফ বলেন,

> 'The Quran gave the Muslim a new ethics and a new political theory and a new philosophy-a practical, a democratic politics and a monotheistic philosophy....The Quran did inded give guidence to the intellect, but in no way did it chain and fetter it.'[২৭৫]

তাই ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারিমের দীর্ঘস্থায়ী ও অবিনশ্বর প্রভাব জগতের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়।

কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ : পৃথিবীতে অনেক খ্যাতনামা, প্রতিভাধর লেখক জন্মেছেন এবং রচনা করেছেন যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য। কিন্তু কুরআনের মত একটা বাক্যও কেউ আজ পর্যন্ত রচনা করতে পারেনি এবং পারবেও না। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার নির্ভুল সেতুবন্ধন; জীবন সমস্যার নিখুঁত সমাধান; মানুষের ইহকলীন ও পরকালীন মুক্তির সনদ; সত্য-সুন্দর ও প্রত্যাশা পূরণের মূর্ত প্রতীক।

কুরআনের আলোকে কুরআন : কুরআন আঁধার আকাশে উজ্জ্বল সূর্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। মানবজাতি সে আলোক ধারায় স্নাত হয়ে বিশ্ব প্রকৃতিকে চোখ মেলে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখল, জানল। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার অশান্ত এ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে বিশ্বকে প্রকৃত

---

২৭৪. আল-কুরআন, ৬ : ৩৮

২৭৫. Prof. M. M. Sharif, *Muslim thought: its origin and achievements*(Boston : Boston University Press, 2013), p. 109

শান্তির পথে পরিচালিত করতে পারে আল্লাহর এ অমোঘ কিতাব আল-কুরআন। কুরআন কি? এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন নিজেই প্রদান করেছে, الٓمّٓ. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ 'আলিফ-লাম-মিম। এটা এমন একটা কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ, সংশয় বা ভুলের স্থান নেই। এটা হচ্ছে আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক।'[২৭৬] কুরআনের অন্যত্র আছে, وَهٰذَا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'এ কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।'[২৭৭] আরও ইরশাদ করা হয়েছে, هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ 'এটা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক ও উপদেশ।'[২৭৮] কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে, وَإِنَّه لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ 'আর এটা তোমার জন্য এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য একটা উপদেশ। আর (এ নি'আমত সম্পর্কে) শীঘ্রই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।'[২৭৯]

বস্তুত মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ, মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত আসমানি কিতাব। সামগ্রিক কল্যাণের আকর এ আসমানি গ্রন্থ। সকল আসমানি কিতাবের সার-নির্যাস হলো আল কুরআন।

---

২৭৬. আল কুরআন, ২ : ১-২
২৭৭. আল কুরআন, ৬ : ১৫৫
২৭৮. আল কুরআন, ৩ : ১৩৮
২৭৯. আল-কুরআন, ৪৩ : ৪৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

কুরআন আল্লাহর কালাম। এ কুরআনের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের অবস্থান। আল্লাহ বলেছেন, 'যাকে আমি অসাধারণ করে সৃষ্টি করেছি, তার বিষয়টা আমিই দেখব।[২৮০] শুধু তাই নয়, আল্লাহপাক তাঁর বিশ্বজগৎ সৃষ্টির যে মহাপরিকল্পনা তৈরি করেন তার মধ্যে মানুষের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন।'[২৮১] তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে সকল জিনিস সৃষ্টির যে বর্ণনা কুরআনে দিয়েছেন তা মানুষকে বুঝানোর উদ্দেশ্যেই। মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও স্তর, মানুষের শ্রেণি, মন, স্বভাব, অপরাধ, ভালমন্দ কাজের বর্ণনা, মানুষের মৃত্যু, পুনর্জাগরণ ও কর্মফলের বিচার, বিচার শেষে মানুষের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা নিয়েই কুরআন।[২৮২] তবে এটা বিভিন্ন বিষয়বস্তুর একটা হৃদয় স্পর্শী সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানকোষ। এতে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের মনোরম প্রতিচ্ছবি। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে। এ সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় বিশদ ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিছু কিছু বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর কোন কোনটি বিভিন্ন জাগতিক কর্ম তাৎপরতার সাথে সম্পর্কিত এবং কোন কোনটি ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত।

আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানবজাতি। কেননা, মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় কুরআনেই তুলে ধরা হয়েছে। আল কুরআনের উদ্দেশ্য হল– মানবজাতিকে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন করা। যাতে মানুষ পৃথিবীর জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালে শান্তি ও সুখময় জীবনের অধিকারী হতে পারে। কুরআনের প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ 'এ কিতাবে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য চলার পথের নির্দেশনা দানকারী।'[২৮৩]

আরও বলা হয়েছে, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ 'অবশ্যই এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে তোমাদেরই আলোচনা করা হয়েছে। তোমরা কি তা বুঝ না।'[২৮৪] আরও বর্ণিত হয়েছে,

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَأَبٰى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا

---

২৮০. আল কুরআন, ৭৪ : ১১
২৮১. আল কুরআন, ৪৫ : ১৩
২৮২. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী, *পবিত্র কোরআনের সারকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২৮৩. আল কুরআন, ২ : ২
২৮৪. আল কুরআন, ২১ : ১০

'মানবজাতির জন্য আমি এ কুরআনে নানা উপমা দিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু তারা অনেকে এ সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে।'[২৮৫] আরও বলা হয়েছে, إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ 'এটা তো বিশ্বজগতের জন্য মুক্তির স্মারক।'[২৮৬] ঐশীগ্রন্থ কুরআনুল কারিমে আরও বর্ণিত হয়েছে,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

'আপনার কাছে এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদদাতা স্বরূপ।'[২৮৭] এ বিষয়ে আরও ইরশাদ হচ্ছে,

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ. يَّهْدِىْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِه وَيَهْدِيْهِمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

'অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের জন্য নুর এবং স্পষ্ট কিতাব আগমন করেছে। এর দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং তাদেরকে নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন এবং সরল পথে চালিত করেন।'[২৮৮] 'হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছেছে; আর এ কুরআন হল অন্তরাত্মার ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার উপায়-উপকরণ ও মহৌষধ।'[২৮৯] 'আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি, তাহল মু'মিনদের সকল সমস্যার সমাধান– চিকিৎসা-নিরাময় এবং রহমত।'[২৯০] মানুষকে উদ্দেশ্য করে এসব কিছুই। ইসলামকে বাস্তবে রূপদানের জন্যও মানুষ। মূলত কুরআনে অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা সব কিছু মানুষকে কেন্দ্র করেই। তাই বলা যায়, কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষকে নিয়েই আবর্তিত হয়েছে।

কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত[২৯১] তালিকা : (১) আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, (২) আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহিদের প্রমাণ, (৩) আল্লাহ তা'আলার পূত-পবিত্রতা ও ক্ষমতা, (৪) অদৃশ্য জ্ঞান, (৫) শিরক, (৬) তাকওয়া, (৭) রিসালাত, (৮) রাসুলের অনুসরণ (ইতা'আতে রাসুল), (৯) জিহাদ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, (১০) সালাত, (১১) যাকাত, (১২) সাওম, (১৩) হজ্জ, (১৪) চরিত্র বা আখলাক, (১৫) অর্থনীতি, (১৬) যিনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণের শাস্তি, (১৭) মজলিসের শিষ্টাচার, (১৮) রাসুলের সাথে আদব, (১৯) বিবেক-বুদ্ধির চর্চা, (২০) মাপ বা ওজনে সঠিকতা, (২১) কিসাস ও দিয়াত তথা দণ্ডবিধি, (২২) লুঠতরাজ ও ডাকাতির শাস্তি, (২৩) চুরির শাস্তি, (২৪) অর্থনৈতিক অসাধুতা ও দূর্নীতি তথা সুদ, (২৫) আদল ও ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার ও ন্যায়শাস্ত্র, (২৬) অপবাদ বর্ণনার শাস্তি, (২৭) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহদান ও এর মর্যাদা, (২৮) সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধ ইত্যাদি। বস্তুত কুরআন নাযিল হয়েছিল মানবজাতির হিদায়াতের জন্য। তাই এর বিষয়বস্তুও মানুষ। মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

---

২৮৫. আল কুরআন, ১৭ : ৮৯
২৮৬. আল কুরআন, ৩৮ : ৮৭
২৮৭. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯
২৮৮. আল কুরআন, ৫ : ১৫-১৬
২৮৯. আল কুরআন, ১০ : ৫৭
২৯০. আল কুরআন, ১৭ : ৮২
২৯১. ড. শাহ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের শ্রেণিবিভাগ : হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন।[২৯২] সেগুলো হলো–

(১) ইলমুল আহকাম বা সাংবিধানিক জ্ঞান : এ পর্যায়ে পবিত্র কুরআনে ইবাদত-বন্দেগি, পারস্পরিক মু'আমালাত, আচার-ব্যবহার, দাম্পত্য জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, যুদ্ধ, সন্ধি, প্রভৃতি মানবজীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও বিষয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলি আলোচিত হয়েছে। ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ এবং যাবতীয় আদেশ-নিষেধই এ প্রকারে আলোচিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত কুরআনে ৫০০ আয়াত রয়েছে।

(২) ইলমুল মুখাসামা বা ন্যায়শাস্ত্র : ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক ও মুনাফিক এ চার শ্রেণির বিভ্রান্ত ইসলাম বিরোধী পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্ক। এ পর্যায়ে তাদের আকিদা-বিশ্বাস এবং মতবাদের ঘৃণ্যতা ও ভ্রান্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক মতাদর্শের প্রতি জনমনে ঘৃণা জাগ্রত করা হয়েছে। এদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

(৩) ইলমুত তাযকির বি-আলা ইল্লাহ বা স্রষ্টাতত্ত্ব : বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে মহান আল্লাহর পরিচয়, অনুগ্রহ, অবদান এবং কুদরতি নির্দেশনাদি সম্পর্কিত জ্ঞান। এ পর্যায়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত বান্দার অভিজ্ঞান, সর্বোপরি স্রষ্টার সর্ববিধ গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৪) ইলমুত তাযকির বি-আইয়্যামিল্লাহ বা সৃষ্টিতত্ত্ব : আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান। এ পর্যায়ে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অতীত সংঘর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। সে সাথে হক ও সত্যপ্রিয়তার উজ্জ্বল পরিণাম, মিথ্যা ও বাতিলের শোচনীয় পরিণতি জনসম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে। সত্য সম্পর্কে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে মিথ্যার জন্য সতর্ক ও সাবধান করা হয়েছে।

(৫) ইলমুত তাযকির বিল-মাউত বা পরকাল সংক্রান্ত জ্ঞান : পবিত্র কুরআনে এ পর্যায়ে সৃষ্টি লোকের লয়, মানুষের মৃত্যু, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন– জান্নাত-জাহান্নামের দৃশ্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা। রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের আগমন-উপস্থিতি, কিয়ামতের আলামত, হযরত ইসা আ.-এর অবতরণ, দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজের আর্বিভাব, ইসরাফিলের শিঙ্গায় ফুঁকের উল্লেখ। হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, পাপ-পূণ্যের জ্ঞান, আমলনামা, মু'মিনগণের আল্লাহর সাথে দিদার ইত্যাদি বর্ণনা। তাছাড়া আযাব ও শাস্তির নানা রকম ভীতিপ্রদ বর্ণনা। জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য ও নি'আমতরাশির বিবরণ– এসব কিছুই রয়েছে এ পর্যায়ের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মানবজাতিকে আত্মসচেতন ও সদাসতর্ক করা এবং আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এ অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারে সব কিছুরই মৌলিক বর্ণনা ও জ্ঞান আলোচিত হয়েছে। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের যাবতীয় বিষয়ের এমন পরিপূর্ণ বর্ণনা আর কোথাও নেই। এটাই একমাত্র ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারূপে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতার প্রতি শ্রেষ্ঠ অবদান ও অনুগ্রহ।

---

২৯২. ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ., অনূ. মাওলানা মাহদী হাসান, *কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি (আল ফাওযুল কাবীর)*(ঢাকা : মক্কা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৩), পৃ. ১৫-১৬

সর্বশেষ অহি : পবিত্র কুরআন ও ইসলামের পরিপূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহ সর্বশেষ ঘোষণা বাণী অবতীর্ণ করেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا ط.

'আজ আমি তোমাদের জীবন বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম।'[২৯৩] এরপর বিধান সম্বলিত তথা হালাল-হারাম সংক্রান্ত কোন আয়াত আর অবতীর্ণ হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের বর্ণনায় দেখা যায়, সর্বশেষ অহি নাযিল হয়েছিল রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের সাত দিন আগে। তাহলো,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ قف ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ.

'তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে উপনীত হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।'[২৯৪]

অপর একটি বর্ণনায় আছে সর্বশেষ অহি ছিল সুরা আন-নাসর অর্থাৎ ... إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ 'যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ...।'[২৯৫] হযরত ইবন উমর রা.-এর বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, 'কুরআন মাজিদের শেষ সুরা 'আন-নাসর' (মহাবিজয় ও পূর্ণ সাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী) নাযিল হওয়ার পর মাত্র ৮০ দিন হযরত রাসুল সা. জীবিত ছিলেন।'[২৯৬] ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ার কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরআন মাজিদ খণ্ডাকারে সুদীর্ঘ ২৩ বছর সময়কাল ব্যাপী পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়। আর তা সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশক্রমে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে বিন্যাস করা হয়। কুরআনকে গ্রন্থাকারে বিন্যাস করার কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন হযরত উসমান ইবন আফফান রা.। যিনি রাসুলুল্লাহ সা.-এর জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলিফা। যাকে 'জামিউল কুরআন' উপাধি দেয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কুরআন লাওহি মাহফুযে সংরক্ষিত সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা যথা অবস্থায় থাকবে। কুরআন নাযিলের পূর্বে সারা বিশ্ব ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ফলে নাযিল হয় মহাগ্রন্থ আল কুরআন; যা সর্বশ্রেষ্ঠ, মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত আসমানি কিতাব। আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল মানবজাতি। কেননা, মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় কুরআনেই তুলে ধরা হয়েছে।

---

২৯৩. আল কুরআন, ৫ : ৩
২৯৪. আল কুরআন, ২ : ২৮১
২৯৫. আল কুরআন, ১১০ : ১-৩
২৯৬. আল কুরআন, ১১০ : ৩

চতুর্থ অধ্যায়

সুরা আল হুজুরাতের পরিচয়, বিষয়বস্তু ও সামাজিক বিধি-বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ : সুরা আল হুজুরাতের নামকরণ ও সার-সংক্ষেপ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুরা আল হুজুরাত নাযিলের প্রেক্ষাপট

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুরা আল হুজুরাত-এর আলোকে সামাজিক বিধি-বিধান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সুরা হুজুরাতের দৃষ্টিতে সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সুরা হুজুরাতে বর্ণিত ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত আলোচনা

চতুর্থ অধ্যায়

সুরা আল-হুজুরাতের পরিচয়, বিষয়বস্তু ও সামাজিক বিধি-বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুরা হুজুরাতের নামকরণ ও সার-সংক্ষেপ

পবিত্র কুরআনের ১১৪ টা সুরার মধ্যে মাত্র আঠারো আয়াত বিশিষ্ট মদিনায় অবতীর্ণ এ সুরাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও আইনগত বিধি-বিধানের বেশ কিছু প্রধান প্রধান তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এতে বিশ্বজগত এবং মানুষ সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এ তথ্যগুলো মানুষের মন-মগযে এক সুদূরপ্রসারী দিগন্ত ও সুউচ্চ জগত তুলে ধরে, মানুষের হৃদয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকে উচ্চকিত করে। বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার নিয়মনীতি, সৃষ্টিজগতের লালন, বিকাশ ও পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর আইনের বহু মূলনীতি এতে আলোচিত হয়েছে। এ সব মূল্যবান বিষয় আলোচনার ফলে সুরাটার আকৃতি ও তার আয়াত সংখ্যার তুলনায় শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুরাটা আমাদের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা গবেষণার আহ্বান জানায়। সর্বপ্রথম যে বিষয়টা এ সুরা অধ্যয়নের সময় মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা এ যে, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ, মহৎ, উদার, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক আদেশ ও প্রশিক্ষণ দেয়। যে স্বতন্ত্র বিধি-বিধান, নীতিমালা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে এ সমাজটা গড়ে উঠে, যে বিধিমালা এ সমাজের স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে, সে বিধিমালা ও নীতিমালা এ সুরায় আলোচিত হয়েছে। এ সমাজ শুধু সমাজ নয়, একটা স্বতন্ত্র জগত বা একটা স্বতন্ত্র বিশ্ব।

এ সমাজের অধিবাসীদের হৃদয় নির্মল, আবেগ-অনুভূতি পরিচ্ছন্ন এবং ভাষা ও ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও সংযত। এ সমাজের মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন, অন্যের সম্মান ও মর্যাদার রক্ষক এবং নিজের চিন্তায় ও চালচলনে নিয়মানুবর্তী। এ অনুশীলন ইমানের বলে বলীয়ান, আবেগ-অনুভূতি, ভয় আর শান্তির সংমিশ্রণে আবদ্ধ। শুধু প্রচলিত আইনের মাধ্যমে যার কাঙ্খিত ফলাফল সুদূর পরাহত। ফলে এ সমাজের ভিতর ও বাহির পরস্পর সুসমন্বিত, এর আইন-কানুন ও আবেগ-অনুভূতি পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এর উদ্বুদ্ধকারী ও সতর্ককারী নীতি ও বিধিসমূহ ভারসাম্যপূর্ণ। এ সমাজের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ শুধুমাত্র বিবেকের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা আবেগ-অনুভূতির পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভরশীল নয়।[১]

অনুরূপ তা শুধুমাত্র আইন, শাসন ও ব্যবস্থাপনার উপরও নির্ভরশীল নয়। এর চেতনা-অনুভূতি ও বাস্তব পদক্ষেপ পরস্পরে একাত্ম। বরং উভয়টার মূল সমন্বয়ের উপরই নির্ভরশীল। এ সমাজ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চেতনা ও সাধনা অথবা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ম-বিধি ও পদক্ষেপসমূহের ভিত্তিতেও গঠিত হয় না ও টিকে থাকে না। বরং এ সমাজে রাষ্ট্রের সাহায্যে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং উভয়ের

---

১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*(ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, সং. ১২, ২০১১), খ.১৯, পৃ. ১৫৭

দায়িত্ব-কর্তব্য ও তৎপরতা পূর্ণ সহযোগিতা ও সহমর্মিতার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। এ সমাজ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল সা.-এর আদব ও সম্মান রক্ষার্থে রাসুলের সামনে বান্দার তৎপরতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার দৃষ্টান্ত এ সুরার প্রথম আয়াতেই লক্ষ্যণীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللهِ وَرَسُوْلِه وَاتَّقُوْا اللهَ ط. إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

'হে মু'মিনগণ! তোমারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুলের (অনুমতির পূর্বে) সামনে আগ বাড়িয়ে কোন কিছু কর না। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সাবধান হও! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সব কিছু শোনেন ও জানেন।'[২] কোন আদেশ বা নিষেধ জারি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের সীমা অতিক্রম করা কোন মু'মিন বান্দার পক্ষে সঙ্গত নয়। আল্লাহর মুকাবিলায় কোন রায় দান বা ফায়সালা ঘোষণার বেলায় অনাহুতভাবে স্ব-উদ্যোগে নিজের কোন মত বা ইচ্ছা পোষণ করাও জায়িয নেই। আল্লাহর ভয়, লজ্জা ও আদব তথা সম্মানের তাগিদেই এ অগ্রণী হওয়ার মনোভাব তাকে ত্যাগ করতে হবে।

সুরার দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটা এর ঘটনাবলি পর্যালোচনা কালে মানুষের দৃষ্টি আর্কষণ করে তা এ যে, কুরআনের নির্দেশাবলির মধ্য দিয়ে এবং রাসুল সা.-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ মহৎ সমাজ গঠনের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে ও অপ্রতিহতভাবে অত্যন্ত জোরদার ও আপোষহীন চেষ্টা চালানো হয়েছে। এ সমাজ পৃথিবীতে এক সময় আবির্ভূত হয়েছিল এবং চালু ছিল। সুতরাং ইসলামের কাঙ্খিত এ বিশ্ব কোন অবাস্তব আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। ইতিহাসের কোন এক যুগে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত এ আদর্শ সমাজটা আকস্মিকভাবে ও রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তা পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, একটা গাছের বীজ সুনির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম করার পর বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। ঠিক তেমনি মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতেও বহু দিনের ধৈর্য, ত্যাগ-তিতীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ সমাজকে তার আমানত বহনের জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীতে তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেছিলেন। এ সব উপাদানের সম্মিলন ঘটানোর কারণেই সে অতুলনীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।[৩]

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি বস্তুই কোন না কোন নামে পরিচিত। নামহীন বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে মেলা ভার। মূলত নামহীন বস্তু মানুষের নিকট গুরুত্বহীন। কাজেই কোন কিছুর নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। মহানবী সা. বলেছেন, اذا ولد له ولد فليحسن اسمه 'যখন একটা মানব শিশুর জন্ম হয়, তখন তার একটা সুন্দর নাম রাখ।'[৪] মূলত, নামকরণের মাধ্যমেই কোন জিনিসের বিমূর্ত অবস্থা মূর্ত হয়ে উঠে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'A beautiful name is more than valuable a lot of wealth.' একটা সুন্দর নাম অনেক ধন-সম্পদের চেয়েও অধিক মূল্যবান। সুতরাং যেভাবেই নামকরণ করা হোক না কেন নামকরণের সার্থকতা অবশ্যই থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনের সুরাগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রেও এগুলোর ঘটনা, চরিত্র এবং অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টো নীতি অবলম্বন করা হয়। তবে নামকরণের ক্ষেত্রে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

---

২. আল কুরআন, ৪৯ : ১

৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৬

৪. ইমাম আবূ দাউদ রহ., অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৫, হাদিস নং ৪৮৬৪, পৃ. ৫২৬

পবিত্র কুরআনের সুরাগুলোর নামকরণ মানব রচিত সাহিত্য কর্মের মত নয়। মানব রচিত সাহিত্যকর্মের নামকরণ, কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিষয়বস্তু বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে হয়; পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। পবিত্র কুরআনের প্রতিটা সুরার নামকরণ বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং এক একটা সুরাকে অন্য সুরা থেকে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে একটা বিশেষ প্রতীকী নাম দেয়া হয়েছে। সুরাগুলোর নামকরণ আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়। এটা আল্লাহপাকের এক অনন্য সৃষ্টি। কেননা, পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটা সুরাতেই এত অধিক সংখ্যক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিষয়বস্তু বা অন্তর্নিহিত ভাবধারার দৃষ্টিতে কোন সুরার সর্বব্যাপক শিরোনাম নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। এ জন্যই মহানবী সা. আল্লাহর নির্দেশে শিরোনামের পরিবর্তে প্রত্যেকটা সুরার প্রতীকী নাম নির্ধারণ করেছেন। মূলত, এ নামগুলো গোটা সুরার নিদর্শন বা প্রতীক স্বরূপ।

সুরা আল-হুজুরাতের নামকরণ

সুরা আল-হুজুরাতের নামকণের ভিত্তি হচ্ছে 'হুজুরাত' শব্দটা। এ শব্দটা সুরার প্রথম রুকুর চতুর্থ আয়াত থেকে গৃহীত। আয়াতটি হলো– إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ এর অর্থ হলো, '(হে রাসুল!) নিশ্চয়ই যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই অবুঝ।'[৫] হুজুরার ভিতর যেহেতু রাসুল সা. অবস্থান করছিলেন, আর তাকে বাহির থেকে অনাকাঙ্খিতভাবে ডাকাডাকি করা হচ্ছিল। তাঁর প্রিয় হাবিবের প্রতি এমন অসৌজন্য আচরণের এ বিষয়টা আল্লাহপাক বরদাশত করেননি। ফলে 'হুজুরাত' শব্দটার মাধ্যমেই সুরাটার নামকরণ করা হয়েছে।

সুরা আল-হুজুরাতের নামকরণের তাৎপর্য : মুফাসসিরগণ বিভিন্নভাবে সুরা আল-হুজুরাতের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

(১) সামাজিক নিয়ম-কানুন বর্ণনাকারী : আলোচ্য সুরায় 'আল-হুজুরাত' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। এটা 'হুজুরাতুন' শব্দের বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে 'হুজুরাত' বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী কারিম সা.-এর নয় জন বিবি ছিলিন। তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব হুজরায় তাশরিফ রাখতেন।[৬] কাজেই রাসুলুল্লাহ সা. যখন তাঁর বাসস্থানে অবস্থান করবেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকা, বিশেষত নাম উল্লেখপূর্বক অশালীনতার সাথে আহ্বান করা অত্যন্ত বেআদবি। আর রাসুল সা.-এর সাথে এরূপ বেআদবি পরিহার করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যা সুরা আল-হুজুরাতকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থগত কারণ : সাধারণত 'হুজুরাতুন' শব্দের অর্থ কক্ষ।[৭] আর এর বহুবচন হল 'হুজুরাত'। হযরত ইবন সা'দ আতা খুরাসানির বর্ণনায় লিখেন, এসব হুজরা খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কালো পশমী পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বুখারি রহ. 'আদাবুল-মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বাইহাকি দাউদ ইবন কাইসের উক্তি বর্ণনা করে তিনি বলেন, আমি এসব হুজরার যিয়ারত করেছি।[৮] মহানবী সা.-

---

৫. আল কুরআন, ৪৯ : ৪

৬. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*(মদীনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১২৭৭

৭. মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী, *আরবী বাংলা অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ডিসেম্বর, ১৯৯৩), পৃ. ১০৫

৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৭

এর সাথে তাঁর সাহাবিদের আচার-আচরণের নিয়ম ইতোপূর্বে কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যখন তিনি তাঁর বাসস্থানে বা কক্ষে অবস্থান করবেন তখন তাঁর সাথে আচরণ কিরূপ হবে তা অন্য কোথাও বর্ণিত হয়নি। এ সুরায় মহানবী সা.-এর বাসস্থানে থাকাকালীন তাঁর সাথে সাহাবিদের আচার-আচরণের পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে। তাই এ সুরার নাম 'হুজুরাত' হয়েছে।

(৩) ঐতিহাসিক কারণ : প্রাক ইসলামি যুগের অবস্থা বিবেচনায় আরবদের উপাধি ছিল 'আইয়ামে জাহিলিয়া' তথা অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধকার যুগ। এ যুগের মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ক রীতিনীতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে ভাল কিছুই অবগত ছিল না। বরং তাদের সমাজ ব্যবস্থায় যেসব কাজকর্ম হতো তা সমাজকে আরও অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। সুরা আল-হুজুরাত নাযিল হওয়ার পর মানুষ তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হয়। অতঃপর সেগুলো অনুসরণ করে একদিন তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। আর যেহেতু এসব কিছু মহানবী সা.-এর 'হুজরা'-কে কেন্দ্র করে হয়েছে, তাই আলোচ্য সুরার নাম 'আল-হুজুরাত' হয়েছে।

(৪) বিষয়বস্তুর নিরিখে : ইসলামি চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, সুরা আল-হুজুরাতে এমন কতিপয় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধান রয়েছে যা অনুসরণ করলে গোটা পরিবার এবং সমাজ শান্তিময় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠবে। কারণ, পারিবারিক সুখ-শান্তির উপরই সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি নির্ভরশীল। পরিবারে সুখ না থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সমাজে প্রতিফলিত হয়। এ কারণেই সুরা আল-হুজুরাতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর যেহেতু বিষয়টা রাসুল সা.-এর স্বীয় বাসস্থানকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল তাই আলোচ্য সুরার নাম আল-হুজুরাত রাখা হয়েছে।

সুরাটার নামকরণের অর্থবহ তাৎপর্য : আলোচ্য সুরাটার নাম সুরা আল-হুজুরাত। 'হুজুরাত' এর অর্থ হল ঘরের চার দেয়াল। সুরাটার চতুর্থ আয়াত যার অর্থ, 'নিশ্চয়ই যারা আপনাকে ঘরের চার দেয়ালের পিছন থেকে ডাকাডাকি করে' হতে সুরাটার নাম গৃহীত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত 'হুজুরাত' শব্দটাকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ সুরার নাম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এটা সে সুরা যাতে 'হুজুরাত' শব্দটা উল্লিখিত রয়েছে। কুরআন মাজিদের অপরাপর সুরাসমূহের ন্যায় এতেও 'সুরার অংশ বিশেষের দ্বারা গোটা বস্তুর নামকরণ'– এর নীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

সুরা হুজুরাতের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী সুরা আল-ফাতহতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, খাইবারের বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের সাথে জিহাদের উল্লেখ রয়েছে। যা খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে বিজয় বহন করে এনেছে। এরপর সাহাবায়ে কিরামের ফজিলত এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য সুরা আল-হুজুরাতে মুসলিমদের ইমানদার উপযোগী আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মু'মিনগণকে রাসুল সা.-এর উচ্চতম মর্যাদা রক্ষা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। প্রথমোক্ত পাঁচটা আয়াতে সাহাবি রা.সহ সকলকে আল্লাহপাক তাঁর রাসুলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

অতঃপর জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোন খবর শুনেই বিশ্বাস করে নেয়া এবং তার উপর ভিত্তি করে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। এরপর পরস্পরের প্রীতি-বন্ধন এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কারও দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ না করা এবং গিবত চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুনাগরিক হিসেবে আদর্শ, শান্তিময় ও সুন্দর সমাজ তথা রাষ্ট্র গড়ে তোলার পথ ও পন্থা শেখানো হয়েছে। বংশীয় ও গোত্রীয় অহংবোধ ভুলণ্ঠিত করা হয়েছে। পরস্পরের মধুর সম্পর্ক রক্ষা করার সঠিক ও বাস্তব পথ নির্দেশ করা হয়েছে। ইমানের মৌখিক দাবির অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। তদুপরি বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের এবং মানবতার মান উন্নয়নের নিয়ম-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এ সুরায় এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের মনকে আল্লাহপাক তাকওয়া পরহেজগারি অবলম্বনের জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। মূলত রাসুল সা.-এর সান্নিধ্য লাভের কারণে তারা আত্মসংশোধনের পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। এ সুরায় ১৮ আয়াত, ৩৪৩ বাক্য ও ১,৪৭৬ টা অক্ষর রয়েছে।[৯]

মূলত এ সুরার চতুর্থ আয়াতের একটা অংশে উল্লিখিত আছে إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ আর এ আয়াতে উল্লিখিত 'হুজুরাত' শব্দ থেকে এ সুরার নাম গৃহীত হয়েছে। এ সুরার সারকথা হলো মুসলিমদেরকে এমন সব শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়া, যা তাদের মু'মিনসুলভ স্বভাব-চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই। প্রতিটি সংবাদই যথাযথ যাচাই না করে তা বিশ্বাস করা ও সে অনুসারে কোন কর্মকাণ্ড করে বসা সঠিক নয়। মু'মিনদের দু'টি দল যদি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। কিছু নিন্দনীয় বিষয় থেকে মুসলিমদের আত্মরক্ষার নির্দেশও দেয়া হয়েছে; যা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং যার কারণে সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হতে পারে। সমস্ত মানুষ একই মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য। সুরার সবশেষে বলা হয়েছে সত্যিকার মু'মিন সে যে ইমানের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মানে, কার্যত অনুগত হয়ে থাকে এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে।

৯. *তানবিরুল মিকবাস মিন তাফসিরে ইবন আব্বাস*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯২), পৃ. ৪৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুরা আল হুজুরাত নাযিলের প্রেক্ষাপট

সুরা আল হুজুরাতের বিষয়বস্তু থেকে এ সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সুরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া হুকুম-আহকাম ও নির্দেশনাসমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। ঐ সব হুকুম-আহকামের বেশির ভাগই মাদানি যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। নিচে সুরা আল হুজুরাত নাযিলের আয়াত ভিত্তিক প্রেক্ষাপট প্রদত্ত হলো :

সুরা আল হুজুরাতের প্রথম আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : আলোচ্য আয়াতের অবতরণ সম্পর্কে ইমাম কুরতুবির ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টা ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযি আবুবকর ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লি রহ.সহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেন যে,

ইমাম বুখারি রহ. ইবন জুরাইজের সূত্রে আবু মুলাইকার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রা. বলেছেন, বনি তামিমের একটা কাফিলা হযরত রাসুলে কারিম সা.-এর খিদমতে হাজির হয়। তাদের মধ্যে কাকে আমির নিযুক্ত করা হবে এ বিষয়ে হযরত আবুবকর রা. আরজ করলেন, কা'কা ইবন মা'বাদকে তাদের আমির নিযুক্ত করুন। মতান্তরে, কা'কা ইবন হাকিমের[১০] নাম প্রস্তাব করেন। হযরত উমর রা. আরজ করলেন যে, না; বরং বনু মুজাশে গোত্রের[১১] আকরা ইবন হাবসকে তাদের নেতা নিযুক্ত করুন। হযরত আবুবকর রা. বললেন, আপনি তো আমার বিরোধিতা করতে চান? হযরত উমর রা. বললেন, আমার উদ্দেশ্য আপনার বিরোধিতা নয়। এভাবে উভয়ের কথা বাড়তে থাকে। এমনকি তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যায়, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

তাবারানি 'আল-আওসাতে' হযরত আয়িশা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক রমাদান মাস শুরু হওয়ার পূর্বে এমনকি, রাসুলে কারিম সা.-এর সিয়াম সাধনা পালনের পূর্বেই রোজা রাখা আরম্ভ করে, তখন আল্লাহপাক এ আয়াত নাযিল করেন।[১২]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত শা'বি রহ. জাবির রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিছুলোক কুরবানির দিন নামাজের পূর্বেই কুরবানি দিয়ে ফেলেছিল, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।

ইবন জারির তাবারি রহ. লিখেছেন, তাফসিরকার কাতাদা রহ. বলেছেন, প্রিয়নবী সা.-এর যুগে কিছু লোক বলেছিলেন, যদি অমুক বিষয়ে আল্লাহপাকের কোন হুকুম নাযিল হত, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। 'আল্লাহপাক ও তাঁর রাসুলের (অনুমতির) পূর্বে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহপাককে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কথা শ্রবণ করেন এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত।[১৩]

তাফসিরে জালালাইনে বর্ণিত আছে, নবী কারিম সা. খাইবর গমন করার সময় মদিনা মুনাওয়ারায় একজন লোককে খলিফা নিয়োগ করে যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত উমর রা. অন্য এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

---

১০. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৬

১১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

১২. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৬৬

১৩. আল্লামা জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি, *তাফসীরে আদদুররুল মানসুর*, খ.৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

হযরত ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারিম সা. চল্লিশজন সাহাবি রা.-কে দীনের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য বনি আমেরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনজন সাহাবি পিছনে পড়ে যায়। বনু আমের ঐ তিনজন ব্যতীত বাকি সকলকে শহীদ করে ফেলে। উক্ত তিনজন সাহাবি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে তাদের সাথে বনু সুলাইমের দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। তারা তাদেরকে বনু আমেরের পরিচয় দিলে সাহাবিত্রয় তাদের হত্যা করে ফেলে। পরে বনু সুলাইমের লোকেরা নবী কারিম সা.-এর নিকট তাদের লোককে হত্যা করার বিচার দাবি করলে নবী কারিম সা. তাদেরকে দিয়াত আদায় করে দিলেন। উক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১৪]

সুরা আল হুজুরাতের দ্বিতীয় আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : তাফসিরে জালালাইনে বর্ণিত আছে যে, কতিপয় লোক নবী কারিম সা.-এর সাথে কথাবার্তা বলার সময় নিজেদের পরস্পরের ন্যায় উচ্চস্বরে কথা বলত। তখন তাদের ব্যাপারে অত্র আয়াত নাযিল হয়।[১৫] প্রসিদ্ধ মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে সাবিত ইবন কায়িস ইবন সাম্মাসের সম্পর্কে। তার কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু হত। যখন এ আয়াত নাযিল হল তখন তিনি রাসুলুল্লাহ সা.-এর দরবারে একাধারে কয়েকদিন আসেননি, এক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! (হযরত আসিম ইবন আদি ইবন আজালান) আমি সাবিত ইবন কায়িস সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলব। ইবন জারির তাবারি হযরত সাবিত ইবন কায়িস ইবন সাম্মাসের সম্পর্কে এ কথাও লিখেছেন, হযরত রাসুল সা. হযরত আসিম রা.-কে আদেশ দিয়েছেন যে, সাবিতকে ডেকে আন। তিনি আসলে, হুজুর সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাবিত! তোমার ক্রন্দনের কারণ কি? তিনি আরজ করলেন, আমার স্বর উঁচু, আমার ভয় হয় এ আয়াত আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হুজুর সা. বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি অত্যন্ত প্রশংসনীয় জীবনযাপন করবে এবং শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করবে? হযরত সাবিত রা. আরজ করলেন, আমি আল্লাহপাক ও তাঁর রাসুল সা.-এর প্রদত্ত সুসংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আমি আল্লাহর রাসুল সা.-এর সম্মুখে কখনও আর উচ্চস্বরে কথা বলব না।[১৬]

আল্লামা বাগভি রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবুবকর রা. ও উমর রা. হুজুর সা.-এর সাথে অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, হুজুর সা. সব কথা শ্রবণ করতেও পারতেন না। দ্বিতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হত।[১৭]

এ জন্য মুফাসসিরগণ অত্র আয়াত এবং পূর্ববর্তী আয়াতের শানে নুযুল এক ও অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ অত্র আয়াত ও হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. ও হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর মধ্যকার বিতর্কের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।[১৮] এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রা. ও ইমাম বায়হাকি রহ.-এর বর্ণনাও অনুরূপ।

সুরা আল হুজুরাতের তৃতীয় আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : হযরত রাসুলে কারিম সা.-এর উচ্চতম মর্যাদার কারণে তাঁর প্রতি পূর্ণ তা'যিম এবং সম্মান প্রদর্শনকল্পে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে যারা কথা বলেন, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তাদের জন্য দু'টি সুসংবাদ রয়েছে। যেমন,

---

১৪. কাযি ছানাউল্লাহ আল মাযহারি, *তাফসির আল মাযহারি*(বৈরুত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি, ২০০৪), খ.৯, পৃ. ৫-৬

১৫. মাওলানা আবদুল মতিন ও অন্যান্য, *তানযীমুল কামালাইন-বাংলা জালালাইন*(নোয়াখালী : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ২০০৪), খ.১, পৃ. ৩৭৭

১৬. মাওলানা আবদুল মতিন ও অন্যান্য, *তানযীমুল কামালাইন-বাংলা জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

১৭. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৭৩

১৮. প্রাগুক্ত।

(ক) তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত (খ) আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাচাই করে নিয়েছেন। আল্লামা বাগভি রহ. লিখেছেন, হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, আমরা হযরত সাবিত ইবন কাইস রা.-কে আমাদের সম্মুখে আসা যাওয়া করতে দেখতাম এবং তাকে 'জীবন্ত জান্নাতি' মনে করতাম। তার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১৯]

সুরা আল হুজুরাতের চতুর্থ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : সা'লাবি হযরত জাবির রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসুল সা.-এর কক্ষের বাইরে থেকে যে দু'জন ব্যক্তি উচ্চস্বরে ডাক দিয়েছিলেন, তারা হলেন উয়াইনাহ ইবন হুসাইন এবং আকরা ইবন হাবস। এ দু'ব্যক্তি সত্তর জন লোক নিয়ে দ্বি-প্রহরে মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছেছিল। তখন রাসুল সা. তাঁর কক্ষে নিদ্রিত ছিলেন। এমন সময় তারা তাকে সম্বোধন করে বলেন, বাইরে আসুন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২০]

তাবারানি এ বর্ণনা সংকলন করেছেন যে, হযরত জায়িদ ইবন আরকাম রা. বর্ণনা করেছেন, কিছু গ্রাম্য লোক হযরত রাসুল সা.-এর নিকটে এসে তাঁর নাম নিয়ে ডাকতে আরম্ভ করে এবং তাকে ঘর থেকে বের হয়ে আসার জন্য বলতে থাকে। তারা ছিল যাযাবর। তাদের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান-বুদ্ধি, আদব-কায়দা কিছুই ছিলনা। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বাগভি রহ., তাফসিরকার কাতাদা রহ. এবং হযরত জাবির রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত বনি তামিম গোত্রের কিছু যাযাবর লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তারা রাসুলুল্লাহ সা.-এর কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করে। রাসুল সা. তাদের চিৎকার শুনে বাইরে আগমন করেন এবং তাদের কথার জবাব দেন। তাদের দলপতি আকরা ইবন হাবস তামিমি নবী কারিম সা.-এর নিকটে আসেন এবং মুসলিম হন। অতঃপর হযরত রাসুল সা. তাদেরকে কিছু পোশাক এবং নগদ উপহারস্বরূপ দান করলেন। তাদের মধ্যে আমর ইবন আসাম নামক একজন শিশু ছিল। হুজুর সা. তাকেও অন্যদের সমপরিমাণ দান করলে; কিছু লোক এ প্রশ্ন উত্থাপন করল যে, এ শিশুটা অত্যন্ত ছোট, তাকেও পূর্ণ অংশ দেয়া হল? এভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে একটু চিৎকার শোনা গেল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। 'হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু কর না।'[২১]

সুরা আল হুজুরাতের পঞ্চম আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : আরবের বনি তামিম গোত্রের কিছু যাযাবর লোকেরা হযরত রাসুল সা.-এর দরবারে অসময়ে হাজির হয়ে হুজুর পাক সা.-কে সম্বোধন করে তাকে কক্ষের পিছন থেকে ডাকতে থাকে। এ সময় রাসুল সা. তাঁর কক্ষে বিশ্রামরত ছিলেন। এ আরব বেদুইনরা সময়ের গুরুত্ব এবং প্রিয়নবী সা.-এর উচ্চতম শান ও মর্যাদা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের প্রতিটা মুহূর্তের কত গুরুত্ব ও মূল্য ছিল তা অনুধাবন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ, বনি তামিম গোত্রের লোকেরা তাকে এমন সময়ে এসে ডাকাডাকি করতে থাকে, যখন তিনি বিশ্রামরত ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। অত্র আয়াতও তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।[২২]

---

১৯. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৭৩
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৬
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩
২২. কাযি ছানাউল্লাহ আল মাযহারি, *তাফসীর আল মাযহারি*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ১১

সুরা আল হুজুরাতের ষষ্ট আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : ইবন জারির, মুজাহিদ রহ., হযরত উম্মে সালমা রা. ও ইবন আব্বাস রা. প্রমূখগণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, অত্র আয়াত ওয়ালিদ ইবন উকবাহ রা.-এর শানে নাযিল হয়েছে।[২৩]

মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ সালিহি বর্ণনা করেন, বনি তামিম গোত্রের লোকেরা যখন যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়, তখন হযরত রাসুলুল্লাহ সা. নবম হিজরির মুহাররম মাসে হযরত উয়াইনাহ ইবন হুসাইনের নেতৃত্বে বনি তামিমের বিরুদ্ধে একটা সৈন্যদল প্রেরণ করেন।[২৪]

ইমাম আহমদ রহ.-এর বর্ণনা হল, হারিস ইবন জিরার খাজায়ি বলেছেন, আমি হযরত রাসুলুল্লাহ সা.-এর খিদমতে হাজির হই, তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করি। হুজুর সা. আমাকে যাকাত আদায়ের আদেশ দিলেন, আমি তা মেনে নিলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রাসুল সা.! আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাব, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের এবং যাকাত আদায়ের জন্য আহ্বান জানাব। হারিস রা. চলে গেলেন এবং যাকাতের অর্থ একত্রিত করলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে যখন রাসুল সা.-এর প্রেরিত কোন লোক পৌঁছল না, তখন হারিস ধারণা করলেন রাসুল সা. হয়ত কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি যাকাতের অর্থ নিয়ে রাসুল সা.-এর খিদমতে রওয়ানা হলেন। এদিকে মহানবী সা. ওয়ালিদ ইবন আকাবাকে যাকাতের অর্থ নিয়ে আসার জন্য হারিসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি রওয়ানা হওয়ার পর ভীত হয়ে ফিরে আসেন এবং রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট আরজ করেন যে, হারিস যাকাত দিকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে, এজন্য আমি পালিয়ে এসেছি। রাসুলুল্লাহ সা. এসব কথা শুনে একদল লোক কে হারিসের নিকট প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে উভয় দলের সাক্ষাত হল। যা হোক, তারা হযরত রাসুলুল্লাহ সা.-এর খিদমতে হাজির হলেন, রাসুল সা. হারিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ? তিনি বললেন, শপথ! সে আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, এমন কিছুই হয়নি। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[২৫] উল্লেখ্য, হযরত হারিস ইবন জিরার রা. উম্মুল মু'মিনিন হযরত জুওয়াইরিয়া রা.-এর পিতা ছিলেন।[২৬]

আল্লামা বাগভি রহ. লিখেছেন, বনি মুস্তালিকের ব্যাপারে ওয়ালিদের বক্তব্যের সত্যতায় রাসুল সা.-এর ইয়াকিন হয়নি, তাই তিনি গোপনে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা.-কে কিছু সৈন্যসহ প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করলেন। আর এ আদেশ দিলেন যে, তুমি সেখানে গমন করে দেখ, তাদের মধ্যে মুসলিম হওয়ার কোন নিদর্শন আছে কি-না। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. এ হুকুম পালন করলেন, তিনি যখন সেখানে পৌঁছুলেন, তখন মাগরিব এবং ইশার নামাজের আযান শ্রবণ করলেন। নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত গ্রহণ করলেন এবং তাদের মধ্যে আনুগত্য ও কল্যাণ ব্যতীত কোন কিছুই দেখলেন না। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. ফিরে এসে হুজুর স.-এর নিকট প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করলেন। তাফসিরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ওয়ালিদ ইবন উকাবা সম্পর্কে।[২৭]

---

২৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৭৫

২৪. মওলানা আবদুল মতিন ও অন্যান্য, *তানযীমুল কামালাইন-বাংলা জালালাইন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৮৬

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-২৮২

২৭. সাইয়িদ মাহমুদ আল আলুসি রহ., *রুহুল মাআনি*(বৈরুত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি, তা.বি.), খ.২৬, পৃ. ১৪৪-১৪৭

সুরা আল হুজুরাতের সপ্তম ও অষ্টম আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : হযরত ওয়ালিদ ইবন আকাবা রা. যখন বনি মুস্তালিকের মুরতাদ হওয়ার কথা হুজুর সা.-কে জানালেন, তখন কিছু লোক বনি মুস্তালিকের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সা. তাদের সে পরামর্শ গ্রহণ করেননি; বরং সত্য উদঘাটনের জন্য ইবন ওয়ালিদ রা.-কে কিছু সৈন্যসহ প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করলেন। অনুসন্ধানের পর হযরত খালেদ ইবন ওয়ালিদ রা. সঠিক অবস্থার বিবরণ দান করেন।[২৮] ফলে প্রকৃত অবস্থা প্রিয়নবী সা. বুঝতে পারেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহপাকের দান এবং নি'আমত। তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

সুরা আল হুজুরাতের নবম ও দশম আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। যেমন–

সাইদ ইবন মানসুর এবং ইবন জারির রহ. হযরত আবু মালিক-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, দু'জন মুসলিমের মধ্যে ঝগড়া হয়, একে অন্যকে গালি দিতে থাকে এবং প্রত্যেকে তার নিজের গোত্রকে ডাকতে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘাত বেঁধে যায়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২৯]

ইবন জারির, ইবন আবি হাতিম হযরত সুদ্দি রহ.-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইমরান রা. নামক একজন সাহাবি ছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন উম্মে জায়িদ। তিনি তার পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তার স্বামী তাকে বাঁধা দিলেন এবং তাকে একটা ইমারতে রেখে দিলেন। স্ত্রীলোকটা তার পিতৃগৃহে সংবাদ দিল। গোত্রীয় লোকেরা এসে তাকে ঐ ইমারত থেকে বের করে নিয়ে যেতে লাগল। তখন তার স্বামী স্ব-গোত্রীয়দের তার সাহায্যের জন্য ডাকল। তারা এসে স্ত্রীকে যেতে বাঁধা দিলে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় ফলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।[৩০]

ইবন জারির এবং আল্লামা বাগভি রহ. উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে দু'জন আনসারি সাহাবির সম্পর্কে তাদের মধ্যে কারও হক সম্পর্কে ঝগড়া ছিল, তা লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৩১] হযরত কাতাদাহ রহ. অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, নবী কারিম সা. একবার গাধায় আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং ইবন রাহওয়াইহ রা.-এর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে হাতাহাতি, জুতা ছোড়াছুড়ি ও গাছের ডালপালা নিয়ে মারামারি আরম্ভ হয়। এ অবস্থায় নবী কারিম সা. গাধার পিঠ থেকে নেমে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৩২]

ইমাম বায়জাভি রহ. উল্লেখ করেছেন, অত্র আয়াত মদিনা মুনাওয়ারায় আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যকার সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়। মদিনা মুনাওয়ারায় আউস ও খাযরাজ নামক দু'টো গোত্র ছিল। প্রাক-ইসলামি যুগে এ দু'গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু একবার তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। রাসুল সা. সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৩৩]

সুরা আল হুজুরাতের একাদশ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : হযরত যাহহাক রা. হতে বর্ণিত আছে যে, বনি তামিমের একটা প্রতিনিধি দল মদিনায় নবী কারিম সা.-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিল।

---

২৮. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৮৪

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. সাইয়িদ মাহমুদ আল আলুসি রহ., *রুহুল মাআনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ১৫০-১৫১

৩২. মাওলানা আবদুল মতিন ও অন্যান্য, *তানযীমুল কামালাইন আরবী-বাংলা জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর মধ্যে কতিপয়ের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মধ্যে হযরত আম্মার, হযরত সুহাইব, হযরত খাব্বাব, হযরত ফুহাইরা, হযরত বিলাল, হযরত সালমান, ও হযরত সালিম রা. ছিলেন অন্যতম। বনি তামিমের লোকেরা তাদেরকে উপহাস করলে অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৩৪]

কুরতুবিতে হযরত ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত হযরত সাবিত ইবন কাইস ইবন শামআস রা.-এর শানে নাযিল হয়েছে। তিনি কানে কম শুনতেন। এ জন্য সাহাবায়ে কিরাম রা. সাধারণত নবী কারিম সা.-এর মজলিশে তাকে সামনের কাতারে বসার জন্য সুযোগ করে দিতেন। একদিন হযরত সাবিত ইবন কাইস রা. নামাযের পর নবী কারিম সা.-এর মজলিসে হাজির হয়ে দেখতে পান যে, আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সাবিত রা. সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য বললে সকলেই তাকে সামনে যাওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন। তিনি প্রায় নবী কারিম সা.-এর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছুলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে আর সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হল না। সাবিত রা. অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– এ ব্যক্তি কে? লোকজন তার নাম প্রকাশ করে দিল। সাবিত রা. তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বললেন, সে অমুক মহিলার পুত্র নাকি? জাহিলিয়াতের যুগে তাকে উক্ত নামে ডাকা হত। সাবিত রা.-এর কথায় সে অত্যন্ত লজ্জিত হল। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৩৫]

অপর এক বর্ণনায় আছে, ইকরামা ইবন আবি জাহল রা. মুসলিম হওয়ার পর মদিনায় আগমন করলে লোকজন তাকে বিদ্রুপ করল এবং বলল যে, এ উম্মতের ফির'আউনের ছেলে, ইকরামা রা. নবী কারিম সা.-কে তা জানালে অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৩৬]

উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় অংশের শানে নুযুল : আল্লামা বাগভি রহ. লিখেছেন, হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, উম্মাহাতুল মু'মিনিনদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা রা. অপেক্ষাকৃত বেঁটে ছিলেন। এজন্য কেউ তাকে বিদ্রুপ করেছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৩৭]

হযরত আয়িশা রা. হযরত উম্মে সালমা রা.-কে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি তার দিকে ইশারা করে বলেছিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! উম্মে সালমা রা. বেঁটে এবং খাটো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৩৮]

উক্ত আয়াতের শেষ অংশের শানে নুযুল : বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যর গিফারি রা. নবী কারিম সা.-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন এক বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল। হযরত আবু যর গিফারি রা. রাগান্বিত হয়ে তাকে বললেন– হে ইয়াহুদির বাচ্চা! তখন রাসুল সা. আবু যরকে বললেন– হে আবু যর! তুমি কি ঐ স্থানে লাল-কাল দেখতে পাও না? তাকওয়ার দৃষ্টিতে তুমি তার অপেক্ষা উত্তম নও। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৩৯] হাসান ও মুজাহিদ রহ. বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পরও কোন কোন ব্যক্তিকে কুফরির দিকে সম্পৃক্ত করা হত। যেমন বলা হত, হে ইয়াহুদি! হে খ্রিস্টান! ইত্যাদি। তাদেরকে সাবধান করে দেয়ার জন্য অত্র আয়াত নাযিল হয়।

---

৩৪. মাওলানা আবদুল মতিন ও অন্যান্য, *তানযীমুল কামালাইন আরবী-বাংলা জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

৩৬. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৯৩

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. মাওলানা আবদুল মতিন ও অন্যান্য, *তানযীমুল কামালাইন আরবী-বাংলা জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

সুরা আল হুজুরাতের দ্বাদশ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : আল্লামা বাগভি রহ. লিখেছেন, হযরত রাসুলে আকরাম সা. যখন কোন জিহাদে বা সফরে যেতেন, তখন একজন নিঃস্ব ব্যাক্তিকে দু'জন সম্পদশালী ব্যক্তির খিদমতে নিয়োগ করে দিতেন। একবার হযরত সালমান ফারসি রা.-কে দু'ব্যক্তির কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নিদ্রিত হয়ে পড়েন, ফলে উভয় সাথীর জন্য পানাহারের কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। ঐ দু'ব্যক্তি বললেন, তুমি রাসুল সা.-এর দরবারে হাজির হও। তিনি হাজির হলে রাসুল সা. তাকে বললেন, উসামার নিকট যাও এবং খাবারের কথা বল। তিনি গেলেন এবং খাবারের কথা বললেন। উসামা রা. জবাব দিলেন, আমার নিকট কিছুই নেই। সালমান ফারসি রা. তার সাথীদের এ কথা জানালে তারা বললেন, তোমাকে যদি এমন কূপে প্রেরণ করি, যার পানি প্রবাহিত রয়েছে, তবে তা-ও শুকিয়ে যাবে। এরপর যখন তারা রাসুল সা.-এর দরবারে হাজির হলে তিনি বললেন, কি হল? তোমাদের মুখ থেকে গোশতের খুশবু আসছে। আমি তা অনুভব করছি। তারা উভয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমরা আজ সারা দিনেও গোশত খাইনি। হুজুর সা. ইরশাদ করলেন, তোমরা ভুল বলছ, তোমরা সালমান এবং উসামার গোশত ভক্ষণ করেছিলে। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[৪০]

সহিহ বুখারিতে রয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সা. বলেন, মন্দ ধারণা থেকে আত্মরক্ষা কর। কারও সম্পর্কে মন্দ ধারণা রাখা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারও ছিদ্রান্বেষণ কর না, পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতায় যেও না, হিংসা, শত্রুতা এবং মনোমালিন্য থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর। সকলে মিলেমিশে আল্লাহপাকের বান্দা হয়ে পরস্পর ভাই ভাইরূপে জীবন যাপন কর।[৪১]

সুরা আল-হুজুরাতের ত্রয়োদশ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : আবু দাউদ রহ., ইমাম যুহরি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইবন আসাকির লিখেছেন যে, অত্র আয়াত আবুল হিন্দ-এর শানে নাযিল হয়েছিল। নবী কারিম সা. বনু বিয়াজাহ গোত্রকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা আবুল হিন্দের সাথে তোমাদের একটা কন্যাকে বিবাহ করিয়ে দাও। তারা বলল, আপনি কিভাবে আমাদেরই একজন আযাদ করা গোলামের সাথে আমাদের কন্যাকে বিবাহ দিচ্ছেন? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৪২]

আল্লামা বাগভি রহ. লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসুল সা.-এর নির্দেশে হযরত বিলাল রা. কা'বা শরিফের ছাদের উপর দণ্ডায়মান হয়ে আযান দেন। উবাইদ ইবন উসাইদ আযান শ্রবণ করে বলল, 'আল্লাহর শুকর এদিন দেখার পূর্বেই আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে।' হারিস ইবন হিশাম বলল, 'এ কালো কাক ব্যতীত মুহাম্মদ সা. কি আর কোন মুআজ্জিন পাননি!' সুহাইল ইবন আমর বলল, 'যদি আল্লাহর ইচ্ছে হয়, তবে তিনি অবস্থার পরিবর্তন করে দিবেন।' তখন হযরত জিবরাইল আ. অবতরণ করেন এবং যে যা বলেছে, সব কথা হুজুর সা.-কে জানিয়ে দেন। হুজুর সা. তাদেরকে তলব করে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৪৩]

---

৪০. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৯৭-২৯৮

৪১. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমর ইবন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*(রিয়াদ : দারুত তাইয়িবা, ১৯৯৯), খ.৭, পৃ. ৩৭৭-৩৮৫

৪২. মাওলানা আবদুল মতিন ও অন্যান্য, *তানযীমুল কামালাইন আরবী-বাংলা জালালাইন*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪০৭

৪৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ৩০২

আল্লামা বাগভি রহ. আরও লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেছেন, এ আয়াত হযরত সাবিত ইবন কাইস এবং তার সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত সাবিত ইবন কাইসকে তার আগে যেতে বাঁধা দেয়। সাবিত রা. ঐ ব্যক্তিকে বলল, তুমি তো অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র। তখন হুজুর সা. জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক স্ত্রীলোকের নাম কে নিয়েছে? সাবিত ইবন কাইস রা. বললেন, ইয়া রাসুল (স.)! আমি। প্রিয়নবী সা. বললেন, তুমি শুধু দ্বীন এবং তাকওয়া পরহেজগারির কারণে তাদের উপর মর্যাদা রাখ। বংশীয় মর্যাদা গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৪] মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, তোমাদের বংশ-পরিচয় কোন কাজে আসবে না, তোমরা সকলেই সমান, এক আদম আ.-এর সন্তান। কারও বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। তবে মর্যাদা হলো দ্বীনদারি এবং তাকওয়া পরহেজগারির। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কার্পণ্য করে এবং মন্দ ও অশ্লীল কথা বলে।

সুরা আল হুজুরাতের চতুর্দশ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : আল্লামা বাগভি রহ. লিখেছেন, ইবন আব্বাস রা. ও সা'ইদ ইবন জুবাইর রা. বর্ণনা করেছেন, বনি আসাদ ইবন খুযাইমা গোত্রের কিছু লোক দূর্ভিক্ষের বছর হযরত রাসুলে কারিম সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে প্রকাশ্যে মুসলিম হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইমান আনেনি।[৪৫] তারা মদিনার পথে মল-মূত্র ত্যাগ করে নোংরা করছিল। সকাল-সন্ধ্যা তারা হুজুর সা.-এর দরবারে আসত এবং বলত, অমুক গোত্র আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, আমরা যুদ্ধ করিনি। তারা এসব বলে হযরত রাসুল সা.-এর প্রতি তাদের ইহসানের কথা প্রকাশ করত। আর অধিক পরিমাণে সদকার অর্থ দাবি করত, তখন তাদের শানে অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৪৬] ইবন জারির রহ., মুজাহিদ ও কাতাদাহ রহ. হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুদ্দি রহ. বলেছেন, এরা হল যুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, আসজা এবং গিফার গোত্র। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'আরব বেদুইনরা বলে, আমরা ইমান এনেছি। কিন্তু আদৌ তারা ইমানদার নয়।'

সুরা আল হুজুরাতের পঞ্চদশ ও ষোড়শ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : পূর্ববর্তী আয়াতে আরব বেদুইনদের বলা হয়েছে, 'তোমরা সত্যিকার অর্থে ইমান আননি, তোমাদের অন্তরে ইমান প্রবেশ করেনি। তাই তোমরা বল, আমরা অনুগত হয়েছি।' সা'ইদ ইবন যুবাইর হযরত ইবন আব্বাস রা.-এর সূত্রে এবং ইবন আবি হাতিম হযরত হাসান বাসরি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিছু বেদুইন ব্যক্তি হযরত রাসুলে কারিম সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করেছিল, ইয়া রাসুলুল্লাহ সা.! আমরা নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করিনি। নবী কারিম সা. মন্তব্য করলেন– তাদের বোধশক্তি কম। শয়তান তাদের মুখ দিয়ে কথা বলছে। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। মুহাম্মদ ইবন কা'আব আল কুরাজি রহ. হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন, নবম হিজরিতে বনু আসাদের দশজন লোক নবী কারিম সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়। নবী কারিম সা. তখন মসজিদে নব্বীতে ছিলেন। তারা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল সা.! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। হে রাসুল! আমরা আপনার নিকট সদিচ্ছায় এসেছি। তাছাড়া আমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের হতে আমরা নিরাপদ। তখন আল্লাহপাক অত্র আয়াত নাযিল করেন।[৪৭]

---

৪৪. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ., ৩০২-৩০৩

৪৫. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমর ইবন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯

৪৬. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ৩০৫-৩০৬

৪৭. মাওলানা আবদুল মতিন ও অন্যান্য, *তানযীমুল কামালাইন আরবী-বাংলা জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

সুরা আল হুজুরাতের সপ্তদশ ও অষ্টদশ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : পূর্ববর্তী চৌদ্দ ও ষোলতম আয়াতের সূত্র ধরেই আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়। আরব বেদুইনরা যুদ্ধ না করেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা বলে তারা আল্লাহপাক ও তাঁর রাসুলের প্রতি যেন বড় অনুগ্রহ করে ফেলেছে বলে মনে করছে, আল্লাহপাক বলেন, হে রাসুল! আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা ইমান এনে আল্লাহপাক ও তাঁর রাসুলের উপর কোন অনুগ্রহ করনি, বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিয়ে তোমাদের প্রতি ইহসান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহপাক আসমান জমিনের সমস্ত গায়িবি বিষয়ের খবর রাখেন।

বস্তুত সুরা হুজুরাত রাসুল সা.-এর মাদানি জীবনের শেষাংশে নাযিল হয়েছে। এ সুরায় মু'মিনদেরকে প্রিয়নবী সা.-এর সাথে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তাঁর উচ্চতম মর্যাদা রক্ষা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুসলিমগণের পরস্পরের প্রীতি বন্ধন এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আদর্শ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার পথ ও উপায় শেখানো হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুরা আল হুজুরাতের আলোকে সামাজিক বিধি-বিধান

সুরা আল-হুজুরাতের আলোকে সুনাগরিক গঠনের উপযোগী গুণাবলী সম্বলিত যেসব সামাজিক বিধি-বিধান জানা যায় সেগুলো হলো নিম্নরূপ :

কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অগ্রগামী না হওয়া : এটা ইমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবি। যে ব্যক্তি আল্লাহপাককে তার রব এবং রাসুল সা.-কে তার নেতা তথা পথ প্রদর্শনকারী মানে আর সে যদি তার বিশ্বাসে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের মতামত, ধ্যান-ধারণাকে কখনও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সিদ্ধন্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারে না। বরং আল্লাহপাক ও তাঁর রাসুল ঐসব বিষয়ে কোন দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে কি দিয়েছেন সে বিষয়ে আগে জানার চেষ্টা করতে হবে। কোন মু'মিনের আচরণে এর ব্যতিক্রম কখনও হতে পারে না।

আয়াতে 'বাইনা ইয়াদায়ে'-এর আসল অর্থ দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এ যে, 'রাসুল সা.-এর সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না।'[৪৮] কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে কুরআনে তা উল্লেখ করা হয়নি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কথায় ও কাজে রাসুল সা. থেকে অগ্রণী হয়ো না। বরং তাঁর জবাবের অপেক্ষা কর। তবে তিনি যদি কাউকে জবাব দানের আদেশ করেন, তবে সে জবাব দিতে পারে। এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন, তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তাঁর আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা বা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা; যেমন, সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছুসংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ দেয়া হত।[৪৯] আল্লাহতা'আলা বলেছেন, يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللهِ وَرَسُوْلِه وَاتَّقُوْا اللهَ ط. 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহপাক ও তাঁর রাসুলের (অনুমতির) পূর্বে কোন বিষয়ে অগ্রগামী হয়ো না।'[৫০] সুরা আহযাবে এসেছে, 'যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ের ফয়সালা করে দেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ফয়সালা করার কোন অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে সে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।[৫১] কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মহানবী সা.-এর উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য এ আয়াতে আল্লাহপাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসুলের কথার আগে কোন কথা বলা আল্লাহ তা'আলার কথার আগে কথা বলারই নামান্তর। কেননা, আল্লাহপাকের দরবারে রাসুল সা.-এর মর্যাদা এতই বেশি যে তাঁর তা'জিম যেন আল্লাহপাকেরই তা'জিম এবং রাসুল সা.-এর সঙ্গে বেআদবি আল্লাহপাকের সঙ্গে বেআদবির অর্ন্তভূক্ত। যেমন, সুরা ফাতহে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, '(হে রাসূল সা.!) নিশ্চয়ই যারা আপনার হাতে হাত

---

৪৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৬

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. আল কুরআন, ৪৯ : ১

৫১. আল কুরআন, ৩৩ : ৩৬

রেখে বাই'আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহপাকের হাতেই বাই'আত গ্রহণ করে।'[৫২] এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসুল সা.-এর আদেশ পালন করাই আল্লাহপাকের আদেশ পালন করা। আর এ জন্যই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আগে বাড়াতে চেষ্টা কর না, নিজেদের অভিপ্রায়কে প্রাধান্য দিও না; বরং নিজের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়কে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ইচ্ছা ও মর্জিকে কার্যকর কর, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দরবারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ কর, শুধু এ পন্থাতেই তোমাদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'[৫৩] তাফসিরকার হযরত যাহহাক রহ. বলেছেন, জিহাদ এবং দ্বীনের নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর হুকুমের পূর্বে তোমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি রহ. লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ফরমান জারি হওয়ার পূর্বে কোন ব্যাপারে তোমরা কথায় ও কাজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না।[৫৪]

এ নির্দেশ শুধু তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুসলিমদের সরকার, বিচারালয় ও পার্লামেন্ট কোন কিছুই এ আইন থেকে মুক্ত নয়। যেমন, 'হযরত মা'আজ ইবন জাবাল রা.-কে যখন প্রিয়নবী সা. তাঁর দূত নিযুক্ত করে ইয়ামেনে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিসের ভিত্তিতে আদেশ দিবে? তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআনের আলোকে, প্রিয়নবী সা. পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, পবিত্র কুরআনে যদি তা না পাও? হযরত মা'আজ রা. আরজ করলেন, তবে সুন্নাতে রাসুল সা.-এ সমস্যার সমাধান খুঁজব, প্রিয়নবী সা. পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তাতেও না পাও? হযরত মা'আজ রা. আরজ করলেন, তবে ইজতিহাদ করব। তখন প্রিয়নবী সা. হযরত মা'আজ রা.-এর বক্ষে তাঁর হাত মুবারক স্থাপন করে বললেন, 'আল্লাহপাকের শুকর, যিনি আল্লাহর রাসুলের দূতকে এমন তাওফিক দান করেছেন, যাতে আল্লাহর রাসুল সন্তুষ্ট হন।'[৫৫] এটাই হল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুমতির পূর্বে কোন বিষয়ে অগ্রণী না হওয়া। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই তাগিদ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেছেন, কখনও কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন কথা বলবে না।[৫৬] মুজাহিদ রহ. বলেছেন, এর অর্থ হল, কোন বিষয়ে যতক্ষণ আল্লাহর রাসুল সা. কিছু না বলেন, ততক্ষণ তোমরা নীরব থাক।[৫৭] আল্লামা ইবন কাসির রহ. বলেন, স্বীয় মতকে কিতাব ও সুন্নাহর আগে স্থান দেয়াই হল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আগে বেড়ে যাওয়া।[৫৮] যেটা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। তাই আলিমগণ বলেন যে, উস্তাদ, পির, আলিম, ধর্মীয় নেতা বা মাশাইখের সাথেও এ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা, তারা নবীগণের উত্তরাধিকারী। নিম্নোক্ত একটা ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘটনাটা হলো– একদিন রাসুলুল্লাহ সা. হযরত আবুদারদা রা.-কে আবুবকর রা.-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন, তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার অপেক্ষা

---

৫২. আল কুরআন, ৪৮ : ১০

৫৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৬৮

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ . ২৬৮

৫৫. ইমাম আবু দাউদ রহ. *আবু দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪, হাদিস নং ৩৫৫৩, পৃ. ৪৪৯

৫৬. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৬৮

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

৫৮. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমর ইবন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯

শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন, দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে নবীগণের পর হযরত আবুবকর রা. থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।[৫৯]

রাসুলের সাথে কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখা : যারা রাসুলুল্লাহ সা.-এর মজলিসে উঠাবসা ও যাতায়াত করতেন তাদেরকে এ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল নবী কারিম সা.-এর সাথে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় যেন মু'মিনগণ তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ্য রাখেন। কারো কণ্ঠস্বর যেন তাঁর কণ্ঠস্বরের থেকে উঁচু না হয়। তাকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেউ যেন ভুলে না যায় যে, তিনি কোনও সাধারণ মানুষ বা সমকক্ষ কাউকে নয়, বরং আল্লাহর রাসুলকে সম্বোধন করে কথা বলছে। সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর রাসুলের সাথে কথাবার্তার পার্থক্য থাকতে হবে এবং কেউ তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলবে না। নবী কারিম সা.-এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ সা.-এর সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করা বা উঁচুস্বরে কথা বলা– যেমন পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, তা এক প্রকার বেআদবি ও ধৃষ্টতা। কুরআনে এসেছে, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু কর না, আর নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল না।'[৬০] এ আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবুবকর রা. নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসুল সা.! আল্লাহর কসম! এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব।[৬১]

হযরত উমর ইবন খাত্তাব রা. এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, তাঁর কথা প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হত। হযরত সাবিত ইবন কাইস রা. এ আয়াত শুনে ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করে ফেললেন।[৬২] কুরআনে এসেছে,

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط.

'(হে মুসলিমগণ!) তোমরা রাসুলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না।[৬৩] কাযি আবুবকর ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা.-এর সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব।[৬৪] কোন কোন আলিম বলেন, তাঁর পবিত্র রওজা মুবারকের সামনেও বেশি উচ্চস্বরে সালাম করা আদবের খিলাপ বা মাকরুহ।[৬৫] অনুরূপ যে মজলিসে রাসুল সা.-এর হাদিস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টোগোল করা বেআদবি। কেননা, তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হত তখন তা সবার জন্য চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরি ছিল। আলিমগণের মজলিসে এত উঁচুস্বরে কথা বলা যাবে না, যাতে তাদের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।[৬৬] অপরপক্ষে, সমাজে

---

৫৯. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুরআন*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২০০৩), খ.৪, পৃ. ১৪৫

৬০. আল কুরআন, ৪৯ : ২

৬১. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমর ইবন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৬৭

৬২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৬

৬৩. আল কুরআন, ২৪ : ৬৩

৬৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৩১

৬৫. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমর ইবন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৬৮

৬৬. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৬

শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ রেখে সাক্ষাত ও কথাবার্তা বলা উচিত। তবে দ্বীন ইসলামে রাসুল সা.-এর ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও মহত্ত্বের স্থান কি তা এ বাণী থেকে জানা যায়। রাসুল সা.-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সামান্য শিথিলতাও এতবড় গুনাহ যে, তাতে যে কোন ব্যক্তির সারা জীবনের সঞ্চিত 'আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। নবী সা.-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তা'যিম রক্ষা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শামিল, যিনি তাকে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে অবহেলার অর্থ স্বয়ং আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ত্রুটি বা অবহেলার পর্যায়ভূক্ত।[৬৭] তাই এ বিষয়ে সকলকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে।

সাক্ষাতে রাসুল সা.-এর দরবারের সার্বিক আদব রক্ষা করা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উচ্চতম মর্যাদার কারণে তাঁর প্রতি পূর্ণ তা'যিম এবং সম্মান প্রদর্শন কল্পে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে যারা নিম্নস্বরে কথা বলেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুসুংবাদ দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়া পরহেজগারির জন্য বাচাই করে নিয়েছেন।' ইমাম বায়জাভি রহ. লিখেছেন এর অর্থ হল– আল্লাহপাক তাদের অন্তরকে তাকওয়া-পরহেজগারির প্রতি আকৃষ্ট করেছেন।[৬৮]

যেভাবে স্বর্ণকে কষ্টি পাথরে যাচাই করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে যারা রাসুল সা.-এর দরবারের আদব তামিজ রক্ষা করে, নিম্নস্বরে তাদের আরজি পেশ করে তাদের অন্তরকে আল্লাহপাক পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছেন, পাপাচার থেকে রক্ষা করেছেন। অথবা এর অর্থ হল, বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদে ফেলে সাহাবায়ে কিরামের অন্তরকে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। আর যেহেতু রাসুল সা.-এর দরবারের তা'যিম করা, আদব রক্ষা করা, তাঁর সম্মুখে নিম্নস্বরে কথা বলা আল্লাহপাক অত্যন্ত পছন্দ করেন, তাই তাদের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার হল, 'তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহান পুরস্কার।'[৬৯] পৃথিবীর জীবনে তাদের দ্বারা যেসব গুনাহ হয়েছে, তা আল্লাহ মাফ করে দিবেন। এটাই হল মাগফিরাত, আর আখিরাতে আল্লাহপাক তাদের দান করবেন মহান পুরস্কার, আর তা হল জান্নাতের অনন্ত অসীম নি'আমত, যা কোন দিন কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তর কল্পনা করেনি। আল্লামা ইবন কাসির রহ. লিখেছেন, একদা হযরত উমর রা. দেখলেন, দু'ব্যক্তি মসজিদে নব্বীতে উচ্চস্বরে কথা বলে। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জান না যে, তোমরা কোথায় আছ? এরপর তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন স্থানের অধিবাসী? তারা বলল, 'তাইফের'। তখন হযরত উমর রা. বললেন, যদি তোমরা মদিনা মুনাওয়ারার অধিবাসী হতে, তবে আমি তোমাদেরকে পূর্ণ শাস্তি দিতাম। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, প্রিয়নবী সা.-এর দরবারের আদব রক্ষা করার আদেশ শুধু তাঁর জীবদ্দশার জন্যই প্রযোজ্য নয়; বরং তাঁর ওফাতের পরও এ আদেশ বহাল রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ আদেশ বহাল থাকবে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রহ. লিখেছেন, চারটা বিষয় শীর্ষতম, বিশেষ সম্মানের অধিকারী। যেমন– (১) আল্লাহপাকের কালাম, পবিত্র কুরআন, (২) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সা., (৩) কা'বা শরিফ ও (৪) সালাত।[৭০] যারা এ শীর্ষতম বিষয়সমূহের সম্মান রক্ষা করে চলবে, আল্লাহপাক তাদের অন্তরকে

---

৬৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫ পৃ. ৬৯

৬৮. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৭৪

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৬

তাকওয়া পরহেজগারি দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ করে দিবেন। সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের অন্তরকে তাকওয়া পরহেজগারির জন্য আল্লাহপাক বাছাই করে নিয়েছেন। কোন কোন আলিম বলেন, ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ বা বুযুর্গ পিরের সাথে ধৃষ্টতা ও বেআদবি কারও কাম্য নয়। কারণ, এর পরিণামে ইমানের সম্পদ ও আমল বিনষ্ট করে দিতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে আজও সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

সাক্ষাতে ভদ্রতা ও সৌজন্যতা বজায় রাখা : '(হে রাসূল !) নিশ্চয়ই যারা কক্ষের পিছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশের কাণ্ডজ্ঞান নেই।' এ আয়াতে নবী কারিম সা.-এর প্রতি তৃতীয় আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তাশরিফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকা, বিশেষতঃ গোয়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহ্বান করা বেআদবি। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নবী কারিম সা.-এর যুগে যারা তাঁর সাহচর্যে থেকে ইসলামি আদব-কায়দা, ভদ্রতা ও শালীনতা এবং শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তারা সদা-সর্বদা নবী কারিম সা.-এর সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি দ্বীনের মেহনতে কতটা ব্যস্ত জীবন-যাপন করতেন এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল। শত-ব্যস্ততার মধ্যে কিছু সময় তাঁর বিশ্রামের জন্য, কিছু সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এবং কিছু সময় পারিবারিক কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যও থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এজন্য তারা তাঁর সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য এমন সময় গিয়ে হাজির হতেন যখন তিনি ঘরের বাইরে অবস্থান করতেন। অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া তাকে বাইরে আসার জন্য কষ্ট দিতেন না।

আরবের সে জাহিলিয়াতের পরিবেশে যেখানে সাধারণভাবে মানুষ কোন শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ পায়নি। সেখানে বারবার এমন সব অশিক্ষিত লোকেরা নবী কারিম সা.-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে হাজির হত। যাদের ধারণা ছিল ইসলামি কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়ন ও মানুষকে হিদায়াতের জন্য যারা দা'ওয়াতের কাজ করেন তাদের কোন বিশ্রামের অধিকার নেই। তারা সাধারণভাবে সাক্ষাত না পেলে মহানবী সা.-এর স্ত্রীদের হুজরার[৭১] চারিদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ডাকতে থাকত। সাহাবিগণ হাদিসে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। লোকজনের এ অনাকাঙ্খিত আচরণে রাসুলুল্লাহ সা. খুব কষ্ট পেতেন। কিন্তু স্বভাবগত ধৈর্যের কারণে তিনি এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন। এমনি পরিস্থিতিতে আল্লাহপাক এমন শিষ্টাচারহীন কাজের জন্য লোকজনকে তিরস্কার ও সাবধান করে আয়াত নাযিল করলেন। বরং যখন কেউ সাক্ষাতের জন্য এসে তাকে পাবে না তখন চিৎকার করে তাকে ডাকাডাকি না করে ধৈর্যের সাথে বসে থাকবে যখন তিনি নিজেই তাদের সাক্ষাত দানের জন্য বেরিয়ে আসবেন। সাহাবি ও তাবি'য়িগণ তাদের আলিম ও মাশাইখের সাথেও এ আদব রক্ষা করেছেন।

সহিহ বুখারিতে হযরত ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, আমি যখন কোন আলিম সাহাবির কাছ থেকে কোন হাদিস লাভ করতে চাইতাম, তখন তার গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার

---

৭১. 'হুজুরাতুন' শব্দটা 'হুজুরাত' এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে হুজুরাত বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী কারিম সা.-এর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব হুজুরায় অবস্থান করতেন। ইবন সা'দ রহ. আতা খুরাসানির বর্ণনাক্রমে লিখেন, এসব হুজরা খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কালো পশমি পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বুখারি রহ. 'আদাবুল-মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকি দাউদ ইবন কায়সের উক্তি বর্ণনা করে বলেন, 'আমি এসব হুজরায় যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা যে, হুজুরার দরজা থেকে ছাদ বিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয়-সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল।' ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিকের রাজত্বকালে তারই নির্দেশে এসব হুজুরা মসজিদে নব্বীর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। মদিনার লোকেরা সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেননি। দ্র. মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার, *মদীনা শরীফের ইতিহাস*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), পৃ. ৭২-৭৩

কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তার কাছে হাদিস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন, হে রাসুল সা.-এর চাচাতো ভাই! আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবন আব্বাস রা. তখন উত্তরে বলতেন, আলিম কোন জাতির জন্য পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তার বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।[৭২] হযরত আবু উবাইদা রা. বলেন, আমি কোনদিন কোন আলিমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দেইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব।[৭৩] এছাড়া অপরের গৃহে প্রবেশের বিধান সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন নির্দেশনা এসেছে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ . فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে তাদের অনুমতি গ্রহণ করবে এবং ঐ গৃহের অধিবাসীদের প্রতি সালাম প্রদান না করে প্রবেশ করবে না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। অতঃপর যদি সে গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এতে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম। আর তোমরা যা কর, আল্লাহপাক তা ভালভাবে অবগত আছেন।'[৭৪] অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ق.

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাস-দাসী এবং তোমাদের মধ্যে যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, তারা যেন তোমাদের কাছে (আসার আগে তিনটা সময়ে) অনুমতি প্রার্থনা করে– (১) ফজরের নামাজের পূর্বে, (২) দ্বি-প্রহরে, যখন তোমরা নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র শিথিল কর এবং (৩) ইশার নামাজের পর।'[৭৫]

আল্লাহপাক আরও বলেছেন,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

'আর যখন তোমাদের সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তারা যেন তোমাদের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা করে যেমনিভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর বিধি-বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন এবং আল্লাহপাক মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।'[৭৬]

রাসুল সা. বলেছেন, 'অনুমতি তিনবার চাওয়া যায়। যদি তোমাকে অনুমতি দেয়, তাহলে ভিতরে প্রবেশ করবে নচেৎ ফিরে যাবে।'[৭৭] হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারিম সা.-এর

---

৭২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৭

৭৩. সাইয়িদ মাহমুদ আল আলুসি রহ., *রুহুল মাআনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ১৩৭

৭৪. আল কুরআন, ২৪ : ২৭-২৮

৭৫. আল কুরআন, ২৪ : ৫৮

৭৬. আল কুরআন, ২৪ : ৫৯

৭৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ১৯৯৪), খ.৯, হাদিস নং ৫৮১১, পৃ. ৫১৯

কাছে এসে দরজায় করাঘাত করতাম। তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন, 'আমি, আমি! (বর্ণনাকারী বলেন) যেন তিনি কথাটাকে অপছন্দ করলেন।'[৭৮]

প্রাপ্ত খবরের সত্যতা যাচাই করে নেয়া : যখন কোন বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যাবে, তখন সে সংবাদের ভিত্তিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। সংবাদ দাতা যদি ফাসিক লোক হয় বা তার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই যদি প্রতীয়মান হয় যে, তার কথা নির্ভরযোগ্য নয়, তাহলে প্রকৃত ঘটনা কি হতে পারে তা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। আল্লাহর এ হুকুম থেকে শারি'আতের একটা নীতি পাওয়া যায়, যার প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এ নীতি অনুসারে যার চরিত্রে দূর্বলতা ও কাজে-কর্মে নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের উপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামি সরকারের জন্য বৈধ নয়। এ নীতির ভিত্তিতে হাদিস বিশারদগণ হাদিস শাস্ত্রে 'জারাহ ওয়াত তা'দিল'-এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে ফকিহগণ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, এমন কোন ব্যাপারে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না যার দ্বারা শারি'আতের কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন মানুষের উপর কোন অধিকার বর্তায়। আল্লাহপাক বলেন, 'হে মু'মিনগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা তোমরা খুব ভাল করে যাচাই-বাছাই করে নিও, যাতে করে তোমাদের অজ্ঞতাবসতঃ কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, অতঃপর, নিজেদের আচরণের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হয়।'[৭৯]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ফাসিক[৮০] ও পাপাচারির খবর গ্রহণ করা এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়িয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, এ আয়াতের অন্য এক কিরাআত অনুযায়ী আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে– তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি কর না; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক।[৮১] ফাসিকের খবর কবুল করা যখন নাজায়িয তখন তার সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়িয হবে। কেননা, সাক্ষ্য এমন একটা খবর, যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। একারণেই অধিকাংশ আলিমের মতে, ফাসিকের খবর অথবা সাক্ষ্য শারি'আতে গ্রহণযোগ্য নয়।[৮২] বস্তুত, উপরোক্ত আয়াতে গুজবে কান না দেয়ার এবং খবরকে সঠিকভাবে যাচাই না করে কোন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ না করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে; কেননা, খবরের সত্যতা যাচাই না করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে কোন দূর্ঘটনা ঘটতে পারে, সংঘর্ষ বাঁধতে পারে। সকল প্রকার অঘটনকে এড়িয়ে চলার প্রকৃষ্ট পন্থা হল খবরের সত্যতা যাচাই করা।

অন্যথায় কোন দুষ্টবুদ্ধি লোকের মিথ্যা রটনায় অথবা কোন সরল প্রাণ লোকের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত সংবাদের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিলে অবশেষে নিজেদেরই আক্ষেপ করতে হয়। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে মুসলিম জাতিকে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।[৮৩] আল্লামা ইবন কাছির রহ. লিখেছেন, এ

---

৭৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, হাদিস নং ৫৮১৬, পৃ. ৫২১

৭৯. আল কুরআন, ৪৯ : ৬

৮০. 'ফাসিক' বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে, কাবিরা গুনাহ করে , আর এমন ব্যক্তিকেও 'ফাসিক' বলা হয় যে, সর্বদা সাগিরা গুণাহে লিপ্ত থাকে এবং তওবা করে না।

৮১. ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবন আলি আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*(বৈরুত : দারু ইহয়াতুত তুরাসিল আরাবি), খ.৫, পৃ. ২৭৮-২৭৯

৮২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৯

৮৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৮৩

আয়াতে আল্লাহপাক আদেশ দিয়েছেন যে, কোন পাপাচারী ব্যক্তির প্রদত্ত খবরে বিশ্বাস কর না, যে পর্যন্ত না ঐ খবরের সত্যতা ভালভাবে যাচাই কর। মূলত কোন সংবাদ শোনার পর এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ও সুপরামর্শ দেয়া জরুরি। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সাধারণত পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটা খবরই যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান করা এবং খবরদাতা নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরি নয়। কারণ, আয়াতে 'নাবা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটা সব রকম খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধু গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে ফকিহগণ বলেন, সাধারণ ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে এ নীতি খাটে না। কোন কোন ব্যাপারে ফাসিকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। যেমন, কোন ফাসিক বরং কোন কাফিরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এ খবর সত্য বলে মেনে নেয়া জায়িয।[৮৪] আজকের এ আধুনিক যুগে কুরআনের এ আয়াতের আলোকে আমরা তথ্য সন্ত্রাস ও হলুদ সাংবাদিকতার ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা পাই।

যেমন, আল্লাহপাক বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না।'[৮৫] রাসুল সা. বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে, (বিনা বিচারে) তা বলে বেড়ায়।'[৮৬] আজকের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে ইসলাম বিদ্বেষী, নাস্তিকবান্ধব গণমাধ্যম ও সংবাদ কর্মীদের উপর কুরআনের এ নির্দেশ ও হাদিসটার প্রয়োগ কতইনা বাস্তব! সত্যিই ইসলাম চির আধুনিক, চিরবিস্ময়কর।

মু'মিনদের দু'টো দল যদি বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া : মুসলিমদের পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিবাদ করা ও লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া নীতি বা স্বভাব নয় এবং উচিতও নয়। তারা একে অপরের সাথে লড়াই করবে এটা কখনও কাম্যও নয়। তবে কখনও যদি এরূপ ঘটে যায়, তবে অন্য মুসলিমরা নিষ্ক্রিয় থেকে তামাশা না দেখে অবশ্যই তাদেরকে বিরত করার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। মূলত মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে যদি ঝগড়া-ফ্যাসাদ, বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়, আর এ বিবাদ পরস্পরের লড়াইয়ে রূপ নেয়, তবে অন্য মুসলিমের কর্তব্য হবে, যেকোন মূল্যে উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া, সন্ধি স্থাপন করা। কিন্তু যদি একপক্ষ অন্য পক্ষের উপর অত্যাচার অব্যাহত রাখে এবং কোন অবস্থাতেই তারা শান্তি ও সমঝোতা এবং মীমাংসার পথে না আসে, এমন অবস্থায় মুসলিমদের কর্তব্য হবে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহপাকের হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পণ করবে, সে পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা আল্লাহপাকের হুকুম পালনে সম্মত হবে এবং যুলুম অত্যাচার বন্ধ করবে, সে মুহূর্তে তাদের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করা এবং মুসলিম ভাই হিসেবে পরস্পরের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দেয়া। পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য, ইমানের সোনালি সূত্রে পৃথিবীর মুসলিমগণ গ্রথিত, এ পবিত্র বন্ধনের সংরক্ষণ একান্ত কর্তব্য, এটা ইমানের দাবি।[৮৭] এ সময় মুসলিমদের যা করণীয় তাহলো :

---

৮৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৯

৮৫. আল কুরআন, ১৭ : ৩৬

৮৬. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারি ২০১৫), খ.১, মুকাদ্দিমা, বাবুন নাহি আনিল হাদিস বিকুল্লি মা সামি'আ, পৃ. ৩৮-৩৯

৮৭. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৮৯

প্রথমত : সংঘর্ষরত উভয় দলকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য প্রস্তুত করা, আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, 'আর তোমরা পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ো না।' যদি উভয়ের মধ্যে একতা না থাকে তবে দুশমনের অন্তরে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ভয়-ভীতি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে যাবে। অতএব, মুসলিমদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখা।

দ্বিতীয়ত : মীমাংসার চেষ্টার পরও যদি একদল রাজি না হয়, তবে কর্তব্য হল সম্মিলিতভাবে ঐ দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে হলেও তাকে বা তাদেরকে এ অসম লড়াই থেকে নিবৃত করা।

তৃতীয়ত : যদি উভয়ে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে তবে অবশ্যই তাদের ভিতর সন্ধি স্থাপন করা ও ন্যায় বিচার করা। কেননা, পরস্পরের ঝগড়া বিবাদ আল্লাহপাকের দরবারে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। কুরআনে বলা হয়েছে, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ. فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. 'নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই; সুতরাং তোমাদের ভাইদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও।"[৮৮] রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'আল্লাহপাক সে সব বান্দার প্রতি রহমত করেন, যারা মানুষের প্রতি দয়া করে।' হযরত ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সা. ঘোষণা করেছেন,

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَخبره أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الْمسلم أَخو الْمسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أَخيه كان الله في حاجته.

'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তাকে অত্যাচার করবে না এবং তাকে শত্রুর নিকট সমর্পণও করবে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহপাক তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন।'[৮৯] যদি লড়াই করতেই হয় আল্লাহপাক যেহেতু নির্দেশ দিয়েছেন তবে তা করা ওয়াজিব এবং জিহাদ হিসেবে গণ্য। মুসলিমদের নিজেদের মধ্যকার সে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে যা উভয় পক্ষের মধ্যে গোত্রপ্রীতি, জাহেলি সংকীর্ণতা এবং পার্থিব ও ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে সংগঠিত হয় এবং দু'পক্ষের কেউই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত দলের সহযোগিতার যে যুদ্ধ করা হয় তা ফিৎনায় অংশগ্রহণ করা নয়; বরং আল্লাহর আদেশ মান্য করা। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত এমনকি কিছু সংখ্যক ফকিহ একে জিহাদের চেয়েও উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের যুক্তি হল, হযরত আলি রা. তার গোটা খিলাফত কালে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়ে দিয়েছেন।[৯০] আল্লামা বাগভি রহ. লিখেছেন, হযরত আলি রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জামাল এবং সিফফিনের যুদ্ধে যারা আপনার বিরুদ্ধে ছিল, তারা কি মুশরিক ছিল? তিনি বলেছেন, না। তারা তো শিরক থেকে পলায়ন করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

এরপর তাকে প্রশ্ন করা হল, তবে কি তারা মুনাফিক ছিল? তিনি বললেন, না। কেননা, মুনাফিকরা তো আল্লাহপাককে স্মরণ করে না। এরপর প্রশ্ন করা হয়, তারা কি ছিল? হযরত আলি রা. বলেন, তারা আমার ভাই ছিল, যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।[৯১] ইবন উমর রা. নিজেই বলেছেন, 'কোন

---

৮৮. আল কুরআন, ৪৯ : ১০

৮৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৬), খ.৪, হাদিস নং ২২৮০, পৃ. ২৪৩

৯০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫ পৃ. ৭৫

৯১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল হাকিম আন নিশাপুরি, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া), খ.৩, হাদিস নং ৪৬৫২, পৃ. ১৪৩

বিষয়ে আমার মনে এতটা খটকা লাগেনি যতটা এ আয়াতের কারণে লেগেছে যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমি ঐ বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।'[৯২] সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ এটা যে, তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য তাদের অত্যাচার নিরসন করা। আর শুধু সন্ধি নয় বরং ন্যায় ইনসাফের সাথে ও সমতার ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। আয়াতের শিক্ষা আসলে যুদ্ধ ও জিহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে।[৯৩] পরোক্ষভাবে সকল মুসলিমকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, আমির, সরদার, অথবা বাদশাহ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবদমান উভয়পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারও বিরোধিতা এবং কারও পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না।[৯৪]

মুসলিমদের দুই দলের যুদ্ধের প্রকারভেদ : (ক) উভয় দল ইমামের শাসনাধীনে হতে পারে, (খ) উভয় দল ইমামের শাসনাধীনে নাও হতে পারে, (গ) একদল শাসনাধীনে এবং অন্যদল শাসনাধীনে না হতে পারে।

প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে উপদেশের মাধ্যমে উভয়দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামি সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে 'কিসাস' ও রক্ত বিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয়পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ব্যবহার করতে হবে। আবার এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ যুলুম, অত্যাচার অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে 'আদিল' বলা হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাগিদ করেছে।[৯৫] যদি মুসলিমদের কোন শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ বা ভুল বুঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। যদি খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলিমদের কর্তব্য হবে এ দলের সাহায্য ও সহযোগিতা করা, যাতে ইমাম যুলুম থেকে বিরত হয়।

ইমাম শাফে'ই রহ. বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলিমদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়িয হবে না। নবী কারিম সা.-এর যুগে মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার মত কোন ঘটনাই কখনও ঘটেনি যে, তাঁর কাছ থেকে এ বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। পরে হযরত আলি রা.-এর খিলাফত কালে যখন মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হয় তখন বিশেষ করে হযরত আলি রা.-এর নীতি ও কর্মপন্থা এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদদের কাছে মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়। এ বিধানের একটা সার-সংক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হলো :

মুসলিমদের পারস্পরিক যুদ্ধের কয়েকটা ধরণ এবং এর বিধান[৯৬] **:** (ক) যুদ্ধরত দু'টো দল যখন কোন মুসলিম সরকারের প্রজা হবে তখন তাদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া। কিংবা তাদের মাঝে

---

৯২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৭৬

৯৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

৯৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮০

৯৫. প্রাগুক্ত।

৯৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৭৭

কোন দলটা সীমালঙ্ঘনকারী তা নির্ণয় করা এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সত্য ও ন্যায় গ্রহণে বাধ্য করা সরকারের দায়িত্ব।

(খ) যুদ্ধরত দু'পক্ষই যদি বড় দু'টো শক্তিশালী দল হয় কিংবা দু'টো মুসলিম সরকার হয় এবং পার্থিব স্বার্থে লড়াই করে, তখন মু'মিনদের কাজ হল, এ ফিৎনায় অংশগ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা এবং উভয় পক্ষকেই আল্লাহর ভয় স্মরণ করিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া।

(গ) যুদ্ধরত দু'পক্ষের একটা পক্ষ যদি ন্যায়ের উপর অধিষ্টিত হয় আর অপর পক্ষ যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকে বা মীমাংসায় রাজি না হয় সেক্ষেত্রে মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়পন্থীদের পক্ষ অবলম্বন করা।

(ঘ) যদি উভয় পক্ষের একটা পক্ষ প্রজা হয় এবং তারা মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে তাহলে ফিকাহবিদগণ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী এ দলকেই বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

ইমাম সারাখসি রহ. লিখেছেন, মুসলিমগণ যখন কোন শাসকের ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করে এবং তার কারণে শান্তি লাভ করে এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলিমদের কোন গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যার যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এমন লোকদের ঐ শাসকের সাথে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব।[৯৭] মুসলিম ফিকাহবিদদের একটা বড় দল বিদ্রোহীদের কেবল তখনই বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন যখন তারা ন্যায়নিষ্ট ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আবুবকর জাস্‌সাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, ইমাম আবুহানিফা বনি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়িদ ইবন আলির বিদ্রোহে যে শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা করতে উপদেশ দিয়েছেন।[৯৮] সে যুদ্ধকে তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন।[৯৯]

ইব্‌ন হুমাম হিদায়ার শরাহ ফাতহুল কাদিরে লিখেছেন, 'সাধারণভাবে ফিকাহবিদদের মতে, বিদ্রোহী সে যে ন্যায়পরায়ণ ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।' ইবন আকিল ও ইবনুল জাওযি ন্যায়নিষ্ট নয় এমন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়িয বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তারা হযরত হুসাইনের বিদ্রোহকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।[১০০] ইমাম শাফি'ই রহ. তার 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে সে ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলে মত প্রকাশ করেছেন, যে ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।[১০১] মুদাওয়ানা গ্রন্থে ইমাম মালিকের মত উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিদ্রোহী যদি ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে।[১০২] কাযি আবুবকর ইবনুল আরাবি আহকামুল কুরআনে তার এ উক্তিটা উদ্ধৃত করেছেন, যদি কেউ হযরত উমর ইবন আবদুল আযিযের মত ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। তিনি আরও বলেন, 'সত্যের অনুসারীগণ যাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেন তাকে ছাড়া আর কারও জন্য আমরা যুদ্ধ করব না।'

(ঙ) বিদ্রোহীরা যতক্ষণ তাদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস অথবা সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহাত্মক ও শত্রুতামূলক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতে থাকবে ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা বা বন্দি করা যাবে না। যখন তারা কার্যত স্বশস্ত্র বিদ্রোহ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে।[১০৩]

---

৯৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৭৮

৯৮. ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবন আলি আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৭৯-২৮০

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

১০১. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদরিস আশ শাফি'য়ি রহ., *কিতাবুল উম্ম*(রিয়াদ : দারুল ওয়াফা, ২০০১), খ.৪, পৃ. ১৩৫

১০২. ইমাম মালিক বিন আনাস রহ., *আল মুদাওয়ানা আল কুবরা*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯৪), খ.১, পৃ. ৪০৭

১০৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শাইবানি, *আল মাবসুত (আল আসল)*(বৈরুত : দারু ইবন হাযম, ২০১২), খ.৭, পৃ. ৫১৮-৫১৯

(চ) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কুরআনের নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে ইনসাফ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার আহ্বান জানান হবে। তা সত্ত্বেও যদি তারা বিরত না হয় এবং তাদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধ শুরু করা হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে।[১০৪]

(ছ) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রা.-এর বর্ণনাসূত্রে হাকিম, বাযযার বর্ণিত নবী কারিম সা.-এর হাদিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

নবী কারিম সা. হযরত ইবন মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উম্মে আবদের পুত্র! এ উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কি তা কি জান? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, তাদের আহতদের উপর আঘাত করা হবে না, বন্দীদের হত্যা করা হবে না, পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা যাবে না, তাদের সম্পদ গনিমতের সম্পদ হিসেবে বণ্টন করা হবে না।'[১০৫]

এ নীতিমালার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হযরত আলি রা.-এর উক্তি ও কর্ম যার উপর সমস্ত ফিকাহবিদ নির্ভর করেছেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি বললেন, 'পলায়নপরদের পিছু ধাওয়া কর না, আহতদের আক্রমণ কর না, বন্দীদের হত্যা কর না, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে নিরাপত্তা দান কর এবং কোন নারীর উপর হাত তুলবে না।' হযরত আলির সেনাদলের কেউ দাবি করল যে, বিদ্রোহী ও তাদের সন্তানদের দাস বানিয়ে বণ্টন করে দেয়া হোক। হযরত আলি রা. একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে উম্মুল মু'মিনিন আয়িশা রা.-কে তার নিজের অংশে নিতে চাও।[১০৬]

(জ) হযরত আলি রা.-এর অনুসৃত নীতি থেকে বিদ্রোহীদের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে যে বিধান গৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের সম্পদ সেনাবাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাক কিংবা বাড়িতে থাক এবং সম্পদের মালিক জীবিত বা মৃত হোক কোন অবস্থায়ই তা গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না। পুনরায় তাদের বিদ্রোহ করার আশংকা না থাকলে ঐসব জিনিস ও তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। শুধু ইমাম আবু ইউসুফের মত হচ্ছে, সরকার ঐ সব সম্পদ গনিমত হিসেবে গণ্য করবেন।[১০৭]

(ঝ) পুনরায় বিদ্রোহ করবে না এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদের বন্দীদেরও মুক্ত করে দেয়া হবে।

(ঞ) নিহত বিদ্রোহীদের মাথা কেটে প্রদর্শন করা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। রাসুল সা. এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এক রোমান বিশপের মাথা কেটে হযরত আবুবকর রা.-এর কাছে আনা হলে তিনি তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, রোমান ও ইরানিদের অন্ধ অনুসরণ আমাদের কাজ নয়। সুতরাং কাফিরদের সাথে যেখানে এরূপ আচরণ করা গ্রহণযোগ্য নয়; সেখানে মুসলিমদের সাথে এরূপ আচরণ আরও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।[১০৮]

(ট) বিদ্রোহীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যেসব বিচারালয় কায়িম করেছিল তার বিচারক যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন এবং শারি'আত অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন তাহলে তাদের নিয়োগকারীরা বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হলেও তাদের বহাল রাখা হবে। তাছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত

---

১০৪. ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবন আলি আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৮৪

১০৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৭৭

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১০৭. ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবন আলি আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৮৩

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

বিচারালয়সমূহের পক্ষ থেকে জারি করা 'ওয়ারেন্ট' বা হুকুমনামা সরকারের আদালতে গৃহীত হবে না।[১০৯]

(ঠ) ইসলামি আদালতে বিদ্রোহীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ন্যায় ও ইনসাফের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 'ফাসিকি'র অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ করবে এবং ন্যায়ের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহে লিপ্ত হবে ততক্ষণ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, সুরা আল হুজুরাতের আলোকে সুনাগরিক গঠনের উপযোগী গুণাবলী সম্বলিত যেসব সামাজিক বিধি-বিধান রয়েছে তার সারকথা হলো– কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অগ্রগামী হওয়া যাবে না, রাসুলের সম্পর্কে কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখতে হবে, ন্যায়নিষ্ঠ নেতার সাথেও ভদ্রতা ও সৌজন্যতা বজায় রাখতে হবে, যে কোন প্রাপ্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে হবে, মু'মিনদের দু'টো দল যদি কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিতে হবে এবং সমগ্র মানব জাতি একই উৎস থেকে সৃষ্ট। অতএব একে অপরের উপর গর্ব ও অহংকার করার কিছুই নেই।

১০৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শাইবানি, *আল মাবসুত (আল আসল)*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৫১৭-৫১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরা আল হুজুরাতের দৃষ্টিতে সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সুনাগরিক একটা জাতির গৌরব। সমাজজীবনের কল্যাণ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সুনাগরিক একান্ত অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অপরিহার্য গুণাবলি যে নাগরিকের মধ্যে আছে তাকেই সুনাগরিক বলা হয়। অনেকে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলে অভিহিত করেছেন। এখানে সুরা আল হুজুরাতের দৃষ্টিতে সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করা হলো :

এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করা : মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' মহান প্রভু আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্ট। কাজেই কারও শারীরিক বা অন্য কোন ত্রুটির জন্য কাউকে উপহাস বা বিদ্রুপ করা বৈধ নয়। আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল– সমাজ, জাতি। এর মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। অভিধানবেত্তাগণ বলেছেন, শুধু পুরুষদের দলকেই 'কওম' বলা হয়। এ জন্য আয়াতে 'কওম' শব্দ দ্বারা পুরুষদের দলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যে 'নিসাউ' বলে বিশেষভাবে মেয়েদের উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কুরআনুল কারিমের অন্য আয়াতে 'কওমে লুত' 'কওমে হুদ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।[১১০] ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, কোন ব্যক্তিকে হেয় বা অপমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে অন্যের সম্মুখে উল্লেখ করা যা শুনে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে উপহাস বলা হয়। কারও কোন কাজের অভিনয় করা, তার প্রতি ইঙ্গিত করা, তার কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোন ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যের হাসি পায়।[১১১] কুরআনের বর্ণনা মতে এ সব কিছুই অবৈধ কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ বা উপহাস না করে, হতে পারে যাকে বিদ্রুপ করা হয়, সে বিদ্রুপকারীর চেয়ে উত্তম হবে এবং কোন নারীও যেন একে অন্যকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে যাকে বিদ্রুপ করা হয়, সে বিদ্রুপকারিণীর চেয়ে উত্তম হবে।'[১১২] তেমনিভাবে কাউকে ছোট মনে করা বা হেয় প্রতিপন্ন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, একে অন্যকে তিরস্কার না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১১৩] আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি রহ. আল্লামা বাগভি রহ.-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত ইকরামা রা. বলেছেন, যদি কোন লোককে 'হে মুনাফিক!' 'হে ফাসিক!' বা 'হে কাফির!' বলা হয়, তবে তাই হবে মন্দ নামে ডাকা। মুসনাদে বাজ্জারে রয়েছে, 'তোমরা সকলেই আদমসন্তান, আর আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। হে লোক সকল! নিজেদের বাপ-দাদার নামে গৌরব করবে না, অন্যথায় আল্লাহপাকের দরবারে বালুর স্তুপ এবং পানির পাখির চেয়েও হালকা হয়ে যাবে।'[১১৪]

হযরত হাসান বাসরি রহ. বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানরা ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু লোক তাদেরকে 'হে ইয়াহুদি', 'হে খ্রিস্টান' বলে ডাকত। আয়াতে এসব কিছু নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১১৫] পরচর্চাকারীর প্রতি আল্লাহপাকের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা

---

১১০. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৯৩

১১১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৭৪

১১২. আল কুরআন, ৪৯ : ১১

১১৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৯৪

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'সে ধ্বংস হোক যে পশ্চাত্যে ও সম্মুখে পরনিন্দা করে ও কুৎসা রটনা করে।'[১১৬]

ইবন কাসির রহ. বলেন, لُمَزَة হয় কাজ দ্বারা هُمَزَة হয় কথা দ্বারা।[১১৭] হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, 'মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেছেন, যদি কারও দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়ে যায়, এরপর সে তাওবা করে, তারপরও লোকেরা ঐ অন্যায়ের জন্য তাকে লজ্জিত করে, এমন আচরণও অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। ইবন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, মহানবী সা. বলেছেন, 'যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১১৮] একথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় বা তার জুতা, এসব সুন্দর হোক (তাহলে সেটা কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?) তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায়কে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।'[১১৯]

কুরআনে এক পুরুষ অপর পুরুষকে এবং এক নারী অন্য নারীকে উপহাস করা হারাম ঘোষণা করেছে। এছাড়াও এক পুরুষ অন্য নারীকে, এক নারী অপর পুরুষকে ও উপহাস করা হারাম। এ আয়াত পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই।[১২০] হযরত আমর ইবন শুরাহবিল রা. বলেন, কোন ব্যক্তিকে বকরির স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কখনও আমিও এরূপই না হয়ে যাই।[১২১] কেননা, আল্লাহ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তর্গত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। তাই যে ব্যক্তিকে আমরা মন্দ অবস্থা ও কুকর্মে লিপ্ত দেখি, তার এ অবস্থাকে মন্দ মনে করি; কিন্তু তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত মনে করার অনুমতি নেই।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন, ليس الْمؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء. 'পরনিন্দুক, উপহাসকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও নির্লজ্জ চরিত্রের মানুষ মু'মিনদের পর্যায়ভুক্ত নয়।'[১২২] সকল প্রকার অশ্লীলতা মুখকে অপবিত্র করে, মনকে কলুষিত করে, মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে এবং মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। তাই সব ধরনের অশ্লীলতাকে কুরআন ও হাদিসে হারাম করা হয়েছে।

একে অন্যের প্রতি দোষারোপ না করা : পরস্পরের প্রতি নিন্দাবাদ, পরিহাস, একে অপরের প্রতি কুৎসা রটনা প্রভৃতি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এতে মানুষের মনে চরম কষ্ট হয়। রাসুলে কারিম সা. ইরশাদ করেছেন, 'যে কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়, আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে যেন

---

১১৬. আল কুরআন, ১০৪ : ১

১১৭. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন কাছির রহ., *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*(রিয়াদ : দারু তাইয়িবা, ১৯৯৯), খ.৮, পৃ. ৪৮১

১১৮. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদিস নং ১৬৮, পৃ. ১৩৬

১১৯. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৬৭

১২০. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮২

১২১. প্রাগুক্ত।

১২২. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ. অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, হাদিস নং ১৯৮২, পৃ. ৩৯৬

আল্লাহপাককে কষ্ট দেয়।'[১২৩] অতএব যে আচরণে কোন মুসলিমের কষ্ট হয়, তা থেকে বিরত থাকা প্রতিটা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। হযরত আয়িশা রা. বলেন, আমি একদিন বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, সাফিয়্যা তো এতটুকু এক মহিলা। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে বেঁটে বলে দেখালেন। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি এমন এক কথা দ্বারা তোমার আমলকে মিশ্রিত করে ফেললে যে কথা সমুদ্রের পানির সাথে মিলালেও তা তাকে দুষিত করে ফেলবে।'[১২৪]

আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে, وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ 'তোমরা নিজেদের দোষ বের কর না।'[১২৫] এ বাক্যটা وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ এর মতই। যার অর্থ তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা কর না। নিজেদের দোষ বের করার অর্থ হল, একে অন্যের দোষ বের করা। لمز এর অর্থ কারও দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা, এবং দোষের কারণে ভর্ৎসনা করা। এছাড়া শব্দটা চোখ টেপা, কটাক্ষ করা, নিন্দা করা, দূর্নাম করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১২৬] ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে দেয়া। وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ এর অর্থ তা-ই। কোন কোন বিজ্ঞ আলিম বলেন যে, وفيك عيوب وللناس أعين 'তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষেরও চক্ষু আছে।' তারাও তোমার দোষ দেখে। তুমি কারও দোষ বের করলে সেও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সে কথাই বলতে হবে যে, মুসলিম ভাইয়ের দূর্নাম নিজেরই দূর্নাম।[১২৭] সাইয়েদ কুতুব বলেন, 'লামায' শব্দটার অর্থ দোষ।

তবে এ শব্দটা থেকে এমন একটা ঝংকৃত হয় এবং অন্তরে তা এমন রেখাপাত করে যে, একে একটা অনুভবযোগ্য আবর্জনা মনে হয়, সূক্ষ্ম ও মানসিক দোষ বলে মনে হয় না।[১২৮] রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة.

'অধিক অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবে না।'[১২৯] মূল আয়াতে 'লামায' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটার মধ্যে বিদ্রুপ ও কুৎসা ছাড়াও আরও কিছু অর্থ বিদ্যমান। যেমন– উপহাস করা, অপবাদ আরোপ করা, দোষ বের করা, ইশারা-ইঙ্গিতে কাউকে তিরস্কার করা। এসব কাজও যেহেতু পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এসব কাজও হারাম করা হয়েছে।[১৩০]

জারির ইবন আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসুল সা. আমার থেকে তিনটা বিষয়ে 'বাই'আত' গ্রহণ করেছেন– (১) নামায কায়িম করা, (২) যাকাত আদায় করা ও (৩) প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করা।[১৩১]

আল্লাহপাক বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ ط.

'নিশ্চয়ই যারা মু'মিন লোকদের মধ্যে অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা ও দুঃচরিত্রমূলক কাজের চর্চা ও প্রসারতাকে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবী ও আখিরাতে পীড়াদায়ক শাস্তি।'[১৩২] পবিত্র কুরআনে বর্ণিত

---

১২৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৯৪

১২৪. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ., *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, হাদিস নং ২৫০৪, পৃ. ৭১১

১২৫. আল কুরআন, ৪৯ : ১১

১২৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুল রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ৮৩৫

১২৭. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮২

১২৮. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

১২৯. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৬৩৭৫, পৃ. ১২৩

১৩০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৮৪

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

হয়েছে, وَإِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ 'যখন পরনিন্দা ও নির্লজ্জ কথা শুনবে, তখন তা বাঁধা দিবে বা তা করা থেকে বিরত থাকবে।'[১৩৩] ইবন মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন,

عن ابن مسعود رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الْمؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذىء.

'সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে সর্বদা পরনিন্দা করে বেড়ায়, যে অভিসম্পাতকারী, যে অশ্লীল কথা বলে এবং যে নির্লজ্জ।'[১৩৪] একদা হযরত আয়িশা রা.-এর এক প্রশ্নের জবাবে রাসুল সা. বলেন,

إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه (روتركه) الناس اتقاء فحشه.

'হে আয়িশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য হবে, যাকে লোকজন তার দুর্ব্যবহারের জন্য পরিত্যাগ করে।'[১৩৫] আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুল সা. বলেছেন, 'কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকি এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরি।'[১৩৬]

হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুল সা. বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জান, মাল ও সম্মান (নষ্ট করা) হারাম।'[১৩৭] নু'মান ইবন বশির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়ার্দ্রতা সহমর্মিতার দিক দিয়ে মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটা মানব দেহের মত। যখন তার একটা অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ তাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে।'[১৩৮]

কাউকে মন্দ বা খারাপ নামে না ডাকা : আল্লাহ পাক বলেছেন, وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ 'তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ কর না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেক না।'[১৩৯] কোন ব্যক্তিকে এমন নামে ডাকা বা এমন উপাধি দেয়া যা সে অপছন্দ করে এবং তার জন্য অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন, কাউকে ফাসিক, মুনাকিক বলা বা অন্ধ, খোঁড়া বা কানা বলা। কাউকে তার নিজের কিংবা পিতামাতার অথবা বংশের কোন দোষ-ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত করে উপাধি দেয়া ইত্যাদি। যেমন, মুসলিম হওয়ার পরও কোন ব্যক্তির পূর্বের অনুসৃত ধর্মের কারণে তাকে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান বা চোর, ব্যভিচার বা শরাবি বলা। এ সকল কাজই হারাম।[১৪০] হযরত ইবন আব্বাস রা. বলেন, 'কেউ কোন গুনাহ অথবা মন্দকাজ করে তাওবা করার পরও তাকে সে মন্দ কাজের নামে ডাকা। যেমন, যে ব্যক্তি চুরি, যিনা, মদপান ইত্যাদি থেকে তাওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেয়া ও হেয় করা হারাম। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে এমন গুনাহ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তাওবা করেছে, তাকে সে গুনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন।'[১৪১] হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি নিজের (মুসলিম) ভাইকে কাফির বলল, তা দু'জনের যে কোন একজনের উপর বর্তাবে।'[১৪২] কারও প্রতি বিদ্রুপ করা, তিরস্কার করা, মন্দ নামে

---

১৩২. আল কুরআন, ২৪ : ১৯
১৩৩. আল কুরআন, ২৮ : ৫৫
১৩৪. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ. অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, হাদিস নং ১৯৮২, পৃ. ৩৯৬
১৩৫. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৬৩৬০, পৃ. ১১৯
১৩৬. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদিস নং ৪৬, পৃ. ৩৭
১৩৭. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৬৩০৯, পৃ. ১০১
১৩৮. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৬৩৫০, পৃ. ১১৬
১৩৯. আল কুরআন, ৪৯ : ১১
১৪০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৭৫
১৪১. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮২
১৪২. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৯৫

কাউকে ডাকা এসবই 'ফিসক' বা বড় গুনাহ। যারা এমন মন্দ কাজ থেকে তাওবা করবে না তারা যালিম বলে বিবেচিত হবে। আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যারা পাপাচার থেকে তাওবা করে না, তারা যালিম বলে বিবেচিত হয়, কেননা তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতিই যুলুম[১৪৩] করে। আল্লাহপাক বলেছেন, 'ইমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যারা এমন আচরণ থেকে তাওবা করে না তারাই প্রকৃত যালিম।'[১৪৪] মূলত এভাবে মহানুভব ও ভদ্র সমাজের মনস্তাত্ত্বিক আচরণবিধি রচনা করা হয়েছে।[১৪৫]

কোন কোন নামের ব্যতিক্রম : কোন কোন লোক এমন নাম খ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ। কিন্তু এ মন্দ নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় বা লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এ নাম ধরে ডাকা জায়িয। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত। যেমন, কোন কোন মুহাদ্দিসের নামের আগে أحدب، أعرج ইত্যাদি খ্যাতি রয়েছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সা. জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবিকে ذو اليدين নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়– হাদিসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু পদবি যুক্ত হয়; যেমন, مروان الأخضر، سليمان الأعمش، حميد الطويل ইত্যাদি। এসব পদবী উল্লেখ করা জায়িয কি-না? তিনি বললেন, দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জায়িয।[১৪৬] যদি একই নামের কয়েকজন লোক থাকে; যেমন, করিম এবং তাদের মধ্যে একজন অন্ধ হয় তাহলে তাকে চেনার সুবিধার জন্য 'অন্ধ করিম' বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নাম ভালবাসা ও স্নেহ বশত রাখা হয়েছে এবং যাদের এ উপাধি বা উপনামে ডাকা হয় তারা নিজেরাও তা পছন্দ করে।[১৪৭] যেমন, 'আবু হুরাইরা[১৪৮] এবং আবু তুরাব।' এ কারণে মুহাদ্দিসগণ আসমাউর রিজালে[১৪৯] সুলাইমান আল-আ'মাশ এবং ওয়াসিল আল-আহদাব[১৫০] এর মত নামের উল্লেখ জায়িয রেখেছেন।[১৫১]

ভাল নামে ডাকা সুন্নাত : মানুষের অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। মহানবী সা. বলেছেন, 'যখন মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন তার একটা সুন্দর নাম রাখ।' তাই মানুষকে সুন্দর নামে ডাকা সুন্নত। রাসুল সা. আরও বলেন, 'মু'মিনের হক অপর মু'মিনের উপর এ যে, সে তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। এ কারণে আরবে ডাকনামের প্রচলন ছিল। রাসুল সা. পছন্দ করে সাহাবিদের কিছু

---

১৪৩. 'যুলুম' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিস কে তার স্থান থেকে অন্যত্র পৌঁছে দেয়া। যেমন– মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করা, তা না করে বরং তার স্থলে নাফরমানি করা যুলুম।

১৪৪. আল কুরআন, ৪৯ : ১১

১৪৫. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

১৪৬. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮২-৮৩

১৪৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৭৫

১৪৮. আবু হুরাইরা অর্থ– ছোট বিড়ালের পিতা বা জনক। একদা বিখ্যাত সাহাবি আবদুর রহমান বা আব্দুল্লাহ মহানবী সা.-এর নিকটে আসলে হঠাৎ তাঁর পোষা বিড়ালটা জামার পকেট থেকে বের হয়ে পড়ে, তখন রাসুল সা. তাকে 'আবু হুরাইরা' বলে সম্বোধন করেন। এরপর থেকে তিনি আবু হুরাইরা নামে সমধিক পরিচিত লাভ করেন। রাসুল সা.-এর এ উপনাম তিনি খুবই পছন্দ করতেন। দ্র. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৩৮৪০, পৃ. ৩৫৮

১৪৯. 'হাদিসের রাবিদের পরিচয়মূলক শাস্ত্রকে আসমায়ে রিজাল বলে।' দ্র. শাইখুল ইসলাম আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান আল রাযি, *কিতাবুল জারাহ ওয়াত তা'দিল*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৫৩), খ.১, পৃ. ৭

১৫০. 'সুলায়মান আল-আ'মাশ অর্থ– ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন সুলায়মান এবং ওয়াসিল আল-আহদাব অর্থ-কুঁজো ওয়াসিল।' দ্র. আল মুত্তাকিন জামালুদ্দিন আল মুজ্জি, *তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৭), খ.১১, পৃ. ৬; প্রাগুক্ত, খ.৩০, পৃ. ৪০০

১৫১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৭৫

পদবী দিয়েছিলেন, হযরত আবু বকর রা.-কে 'সিদ্দীক' ও 'আতিক', উমর রা.-কে 'ফারুক', আলি রা.-কে 'আসাদুল্লাহ', এবং খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা.-কে 'সাইফুল্লাহ' পদবী দান করেছিলেন।[১৫২] কাজেই সুন্দর নামের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো গুণবাচক সুন্দর নাম রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় দু'টো নাম হলো– 'আবদুল্লাহ' ও 'আবদুর রহমান'।

খারাপ ধারণা পোষণ বর্জন করা : আলোচ্য আয়াতে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা পরস্পরের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উপকরণ হয়। যেমন, কারও ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা, কারও দোষ অন্বেষণ করা, কারও কুৎসা রটনা করা, এসবই নিন্দনীয় কাজ এবং পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বকে বিনষ্ট করে। পরস্পরের ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি বা মীমাংসার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয় খারাপ ধারণার কারণে। কারও সম্পর্কে মন্দ ধারণা করলে তার গুণগুলোও দোষ মনে হয়। পবিত্র কুরআন এমন মন্দ ধারণা থেকে আত্মরক্ষা করা নির্দেশ দেয়। এসব আচরণকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মারাত্মক শত্রু বললেও অত্যুক্তি হবে না। এজন্য পবিত্র কুরআন এসব নিন্দনীয় চরিত্র বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। প্রিয়নবী সা. কা'বা শরিফ তাওয়াফ করার সময় বলেছিলেন, তুমি কত পবিত্র গৃহ! তুমি কত সুগন্ধময়! তোমার সম্মান ও মর্যাদা কত বেশি! সে পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদ সা.-এর জীবন, মু'মিনের সম্মান এবং তার অর্থ-সম্পদ ও প্রাণের সম্মান এবং তার সাথে ভাল ধারণা রাখা আল্লাহপাকের দরবারে তোমার সম্মানের চেয়ে বেশি গুরুত্বের অধিকারী।[১৫৩] এ বিষয়ে মহানবী সা.-এর নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বুখারি শরিফে রয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সা. ইরশাদ করেছেন,

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.

'তোমরা মন্দ ধারণা থেকে আত্মরক্ষা কর ও সাবধান হও! কারও সম্পর্কে মন্দ ধারণা রাখা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। আর অপরের দোষ বা ছিদ্রান্বেষণ কর না, গুপ্তচরবৃত্তি ও পরস্পরের সাথে কলহ-বিবাদ কর না, পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতায় কর না। পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ কর না, অপরকে ঘৃণা কর না এবং একে অপরের ক্ষতি করার জন্য পিছনে লাগিও না; বরং তোমরা সকলেই মিলেমিশে একই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও।'[১৫৪] মূলত আয়াতে ইসলামি সমাজের বা নগরিকদের আরও একটা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যা তাদের মর্যাদা ও অধিকারের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এটা থেকে কিভাবে মানুষের বিবেক ও আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা যায় তা শেখান হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط 'হে মু'মিনগণ! তোমরা অনেক মন্দ ধারণা থেকে দূরে থাক, নিশ্চয়ই কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে।'[১৫৫]

সুরা হুজুরাতের আয়াতে মু'মিনদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে ধারণার আধিক্য পরিহার করে চলতে এবং নিজ নিজ মনকে অপরের সন্দেহ-সংশয় ও ধারণার লীলাভূমিতে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

১৫২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮৩

১৫৩. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৯৫

১৫৪. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৬৩০৬, পৃ. ১০০

১৫৫. আল কুরআন, ৪৯ : ১২

আর এর কারণ হলো– 'কিছু কিছু ধারণা পাপ।' এমনকি ধারণার ভিত্তিতে তদন্তেও অগ্রসর হওয়া যাবে না।[১৫৬] রাসুল সা. বলেছেন, 'যখন কোন ধারণা পোষণ করবে, তখন তদন্ত চালাবে না।' হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সা. বলেছেন, 'তোমরা অনুমান করা থেকে সাবধান হও! কেননা, অনুমান সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথার তুল্য।'[১৫৭] একেবারেই ধারণা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং খুব বেশি ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে এবং সব রকম ধারণার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে কোনরূপ যাচাইহীন ধারণাকে অপবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এরূপ অপবাদ ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। কেননা, তা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৫৮]

ধারণার প্রকারভেদ : সুরা হুজুরাতের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ।' (ظن অর্থাৎ প্রবল ধারণা) এ থেকে জানা যায় যে প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়; বরং কিছু কিছু ধারণাকে ইসলাম বৈধ হিসেবে সমর্থন দেয়।[১৫৯] অতএব, কোন ধারণা পাপ আর কোন ধারণা বৈধ সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইমাম আবুবকর জাসসাস চার প্রকার ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) প্রথম প্রকার ধারণা হারাম, (২) দ্বিতীয় প্রকার ধারণা ওয়াজিব, (৩) তৃতীয় প্রকার ধারণা মুস্তাহাব এবং (৪) চতুর্থ প্রকার ধারণা জায়িয।[১৬০]

প্রথম প্রকার ধারণা হারাম : হারাম ধারণা এ যে, আল্লাহর প্রতি এমন কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দিবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। জাবির রা.-এর বর্ণনায় রাসুল সা. বলেন, لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 'তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।' হাদিসে কুদসিতে আছে, أنا عند ظن عبدي بي 'আমি আমার বান্দার সাথে তেমন ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক।'[১৬১] এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ভাল ধারণা রাখা ফরজ এবং খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম। আল্লাহপাক এবং তাঁর প্রিয় রাসুল সা. ও তাদের অনুগত মুত্তাকিদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় ও প্রশংসিত।

দ্বিতীয় প্রকার ধারণা ওয়াজিব : এ প্রকার ধারণা বাদ দিয়ে বাস্তব জীবনে চলার উপায় নেই। যেমন, যেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনত জরুরি এবং সে সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই; সেখানে প্রবল ধারণা করা ওয়াজিব। যেমন, পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও মুকাদ্দামার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে মুকাদ্দামা দায়ের করা হয়, তার জন্য ফয়সালা দেয়া জরুরি ও ওয়াজিব; এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও মিথ্যা বলতে পারে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণামাত্র। সে অনুযায়ী এ ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যদি কোন জায়গায় কিবলার দিক অজ্ঞাত থাকে সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব।

---

১৫৬. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

১৫৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, হাদিস নং ৫৬৪০, পৃ. ৪৩২

১৫৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮৩

১৫৯. প্রাগুক্ত।

১৬০. ইমাম আবুবকর আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৮৭

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

তৃতীয় প্রকার ধারণা মুস্তাহাব : প্রত্যেক মুসলিমের উপর সুধারণা রাখা মুস্তাহাব। এ জন্য সাওয়াবও পাওয়া যায়। ইমাম কুরতুবি বলেন, কুরআনে মু'মিনদের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করার তাগিদ আছে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বনি মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবন উবাই কর্তৃক হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রা.-কে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করায় আল্লাহতা'আলা কর্তৃক সুরা আন-নুরে তাকে নিঃকলুষ প্রমাণ করে বলা হয়েছে, 'তোমরা যখন একথা শুনলে তখন মু'মিন নারী-পুরুষ কেন তাদের নিজস্ব লোক সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করেনি এবং বলেনি যে, এটা তো সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ?'[১৬২]

চতুর্থ প্রকার ধারণা জায়িয : নামাজ পড়ার মধ্যে রাক'আত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাক'আত পড়া হয়েছে, না চার রাক'আত? এমতাবস্তায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়িয। এছাড়া যদি সে ব্যক্তি প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ তিন রাক'আত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাক'আত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়িয। এছাড়া এক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত খারাপ ধারণা হলেও বৈধ প্রকৃতির। যেমন, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চরিত্র ও কাজ-কর্মে কিংবা তার দৈনন্দিন আচার-আচরণে এমন কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না। বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের একাধিক যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান, তবে সেটাও জায়িয।[১৬৩] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যখনই কোন ব্যাপারে ধারণার ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে তখন ভালভাবে যাচাই করে দেখে নেয়া উচিৎ যে ধারণা পোষণ করা হচ্ছে তা পাপাচারের অর্ন্তভুক্ত কি না? লাগামহীন ধারণা পোষণ এবং আখিরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে উদাসীনতা কোন মু'মিন-মুসলিমের জীবন নয়।

মানুষের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান না করা : সুরা হুজুরাতের অত্র আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে, تجسس অর্থাৎ কারও দোষ অনুসন্ধান করা। এ শব্দে দু'টো কিরাআত আছে– (১) لا تجسسوا জিম সহকারে এবং (২)لا تحسسوا হা সহকারে। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, বুখারি ও মুসলিম শরিফের এক হাদিসে এ দুইটা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, لا تجسسوا، لا تحسسوا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আখফাশ রহ. উভয়ের মধ্যে এ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জিম সহকারে تجسس এর অর্থ কোন গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হা সহকারে تحسس এর অর্থ সাধারণ বিষয় সন্ধান করা।[১৬৪]

ইবন কাসির রহ. বলেন, همزة সাধারণত মন্দের উপরই হয়ে থাকে আর لُمزة এর প্রয়োগ ভাল কিছু সন্ধানের উপর হয়ে থাকে।[১৬৫] যেমন, আল্লাহ তা'আলা সুরা ইউসুফে হযরত ইয়াকুব আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত ইয়াকুব আ. তার সন্তানদের বলেছিলেন, يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَأَخِيْهِ 'হে আমার পুত্ররা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর।'[১৬৬] আয়াতে এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

---

১৬২. আল কুরআন, ২৪ : ১২

১৬৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৮৬

১৬৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮৪

১৬৫. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমর ইবন কাছির রহ., *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ৪৮১

১৬৬. আল কুরআন, ১২ : ৮৭

لا تغتابوا الْمسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
'কোন মুসলিমের গিবত কর না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান কর না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহপাক যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।'[১৬৭] বায়ানুল কুরআনে আছে, গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারও কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ; যা تجسس এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলিমের হিফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দূরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়িয। মানুষের ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র পড়া, মোবাইলে ব্যক্তিগত তথ্য, ই-মেইল দেখা, দু'জনের কথোপকথন কান পেতে শোনা, প্রতিবেশির ঘরে উঁকি দেয়া এবং বিভিন্ন পন্থায় অন্যদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিষয়াবলি খোঁজ করে বেড়ানো বড়ই অনৈতিক কাজ। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা হচ্ছে, মানুষের গোপন বিষয় তালাশ কর না। অন্যদের যে সব বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে তা জানার চেষ্টা করা মু'মিনের কাজ নয়।[১৬৮] এ কারণে প্রিয়নবী সা. তাঁর খুৎবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছিলেন,

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان فلبه لا تتبعوا عورات الْمسلمين فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
'হে লোক সকল! যারা মৌখিক ইমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে তাদের ইমান নেই (অর্থাৎ মুনাফিক), তোমরা মুসলিমদের কুৎসা রটনা কর না, তাদের গোপন রহস্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়ো না, যারা মুসলিমদের গোপন রহস্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হবে, আল্লাহপাক তাদের গোপন কথাগুলো প্রকাশ করে দিবেন। আর আল্লাহপাক যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে অপমানিত করে ছাড়েন।'[১৬৯] হযরত মু'আবিয়া রা. বলেন, আমি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছি,

إنك ان اتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم.
'তুমি যদি অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ কর, তবে তুমি যেন তার ক্ষতি করলে এবং এর ফলে সে আরও বিগড়ে যেতে পারে (অর্থাৎ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশের পর, সে তা নির্ভয়ে করতে থাকবে)।'[১৭০] রাসুল সা. আরও বলেছেন, إذا ظننتم فلا تحققوا 'তোমাদের মনে কারও সম্পর্কে সন্দেহ হলে, তা অন্বেষণ কর না।'[১৭১] রাসুল সা. আরও বলেছেন, من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة 'কেউ যদি কারও গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেন একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যা সন্তানকে জীবন দান করল।'[১৭২] দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধুমাত্র ব্যক্তির জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইসলামি সরকারের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। একটা উন্নত, উদার, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক মহানুভব ইসলামি সমাজে মানুষ পরিপূর্ণ মৌলিক নিরাপত্তা ভোগ করে থাকে। এমনকি ইসলামি রাষ্ট্রে অপরাধ তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকেও মানুষের উপর গোয়েন্দাগিরি পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়নি।[১৭৩] আবু দাউদ শরিফে

---

১৬৭. ইমাম আবূ দাঊদ রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ৪৮০২, পৃ. ৫০০
১৬৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৮৭
১৬৯. ইমাম আবূ দাঊদ রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ৪৮০২, পৃ. ৫০০
১৭০. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৮০৮, পৃ. ৫০৩
১৭১. আল্লামা আলাউদ্দিন আল হিন্দি, *কানযুল 'উম্মাল*, প্রাগুক্ত, খ.৩, হাদিস নং ৭৪৪১, পৃ. ৪৬১
১৭২. ইমাম আবূ দাঊদ রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ৪৮১১, পৃ. ৫০৪
১৭৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

উল্লেখ আছে, ইবন মাসউদ রা.-কে বলা হয়েছিল যে, অমুকের দাঁড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা মদ টপকাতে দেখা গেছে। তখন তিনি বললেন, আমাদের গোয়েন্দাগিরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে কোন অপরাধ প্রকাশিত হয়ে পড়লে আমরা তার ব্যবস্থা নিব।'[১৭৪] কারও দোষ অন্বেষণ কর না বা অনুসন্ধান কর না। কারণ তা অত্যন্ত গর্হিত ও নিকৃষ্ট অপরাধ।

এ উক্তির জবাবে মুজাহিদ রহ. বলেন, যে দোষ প্রকাশ পায় তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নাও, আর আল্লাহ তা'আলা যা গোপন রেখেছেন, তা তোমরাও গোপন রাখ। রাসুল সা. বলেছেন, إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم 'শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।'[১৭৫] ইবন মাসউদ রা. বলেছেন,

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده فقال النبي لهذا الرجل، تخلد فقال ومما اتخلد، ما أكلت لحما، قال إنك أكلت لحم أخيك.

'আমরা নবী কারিম সা.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মজলিসের বাইরে চলে গেল। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি সে লোকটা সম্পর্কে অপমানকর কথা বলল। তখন নবী কারিম সা. ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি খিলাল কর। লোকটা বলল, আমি কেন খিলাল করব, আমি তো কোন গোশত খায়নি। নবী সা. বললেন, তুমি এইমাত্র তোমার ভাইয়ের গোশত খেয়েছ।'[১৭৬] তবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খোঁজ-খবর নেয়া ও অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে– যেমন, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণে বিদ্রোহের কিছুটা লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলে সরকার তাদের গতিবিধির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে।[১৭৭] সাড়ে চৌদ্দশত বছর পরেও আধুনিক বিশ্বে এটার বাস্তব অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটা ন্যায়নীতি ও ইনসাফভিত্তিক সুখী এবং সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলামের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যম ছাড়া অন্য পদ্ধতির বাস্তবায়ন করে একটা ন্যায়নীতি ও ইনসাফভিত্তিক সুখী এবং সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অলিক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গণতন্ত্রের উত্তরাধিকার, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের দাবিদার রাষ্ট্রগুলোতে এর কতটুকু পাওয়া যাবে তা বিবেচ্য বিষয়।

কারও প্রতি গিবত না করা : গিবত মানব চরিত্রের একটা খারাপ বৈশিষ্ট্য। সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারী একটা ঘৃণ্য অপরাধ। গিবত আরবি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ– পরনিন্দা করা, পরচর্চা করা, অসাক্ষাতে বা অগোচরে দূর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা, অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা, অভিনয় বা ইশারায় কারও কিছু প্রকাশ করা বা লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরা ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলা হয়, Backbiting, Slander, Calumniation, calumny, Malicious gossip ইত্যাদি। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা বা তার দোষ বর্ণনা করা (Unpleasant or cruel talk about someone who is not present)।

ইসলামি শারি'আতের পরিভাষায় গিবত হল– কারও অগোচরে তার এমন দোষ বর্ণনা করা যা সে গোপন করে রেখেছে এবং তা প্রকাশ করাকে সে অপছন্দ করে। যদি তার মধ্যে বর্ণিত দোষ বর্তমান থাকে তাহলেই সেটা হবে গিবত। আর যদি দোষটি তার মধ্যে না থাকে তাহলে তা হবে মিথ্যা অপবাদ।[১৭৮]

---

১৭৪. ইমাম আবূ দাউদ রহ., *আবূ দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ৪৮১০, পৃ. ৫০৪

১৭৫. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৮০৯, পৃ. ৫০৩-৫০৪

১৭৬. ড. মোঃ রহিম উল্যাহ, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১৭৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ., পৃ. ৮৯

১৭৮. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আবদুল মুন'ইন, *মু'জামুল মুসতালাহাতিল আলফাযিল ফিকহিয়্যাহ*(কায়রো : দারুল ফদিলাহ, ১৯৯৯), খ.৩, পৃ. ২১-২২

'কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কারও সাথে এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করে তাই গিবত।' স্বয়ং রাসুল সা. থেকে এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।[১৭৯] হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি রহ. বলেছেন, গিবত হচ্ছে তুমি তোমার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি এমনভাবে উল্লেখ করলে তা যদি তার কানে পৌঁছে তবে সে তা অপছন্দ করবে।[১৮০] সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.

'তুমি তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বললে যা সে উপস্থিত থাকলে অপছন্দ করত, এটাই গিবত। প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসুলুল্লাহ সা.! আমি যে কথা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে? উত্তরে রাসুল সা. বলেন, তুমি যা বললে তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে এটা গিবত, আর যদি না থাকে তাহলে সেটা মিথ্যা অপবাদ।'[১৮১] ইমাম মালিক রহ. তার মুআত্তা গ্রন্থে হযরত মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ে আর একটা হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, যার ভাষা নিম্নরূপ :

أن رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ فقال أن تذكر من الْمرء ما يكره أن يسمع، فقال يا رسول الله وإن كان حقا؟ قال إذا قلت باطلا فذلك البهتان.

'এক ব্যক্তি রাসুল সা.-কে জিজ্ঞেস করল, গিবত কাকে বলে? তিনি বললেন, কারও সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বলল, হে রাসুল! যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেন, তোমার কথা মিথ্যা হলে সেটা তো বুহতান (অপবাদ)।'[১৮২] হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الْمؤمنين.

'আমরা নবী সা.-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন খুব দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হল। তিনি বললেন, তোমরা জান, এটা কিসের বাতাস? এটা মু'মিনের যারা গিবত করে তাদের বাতাস।[১৮৩]

এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা-ইঙ্গিতে করা হোক সর্বাবস্থায় হারাম। হযরত মাইমুন বর্ণনা করেন, একদিন আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্নে একজন আবিসিনিয়াবাসীর মরা-পঁচা লাশ আমার সম্মুখে আনা হল, কেউ আমাকে বলল, এটা খাও। আমি বললাম, কেন খাব? লোকটা বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির গোলামের গিবত কেন করছিলে? আমি আরজ করলাম, আল্লাহর শপথ! আমি তার সম্পর্কে ভালও বলিনি, মন্দও বলিনি। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি তার কুৎসা শুনেছিলে এবং তা পছন্দও করছিলে। এরপর থেকে মাইমুন কারও গিবত তো করতেনই না এবং অন্য কোন লোককে তার সম্মুখে গিবত করতেও দিতেন না।[১৮৪] সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোন ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলা

---

১৭৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৮৯

১৮০. ড. এ আর এম আলী হায়দার, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

১৮১. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৬৩৫৭, পৃ. ১১৮

১৮২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৮৯-৯০

১৮৩. ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল রহ., *আল মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১১, হাদিস নং ১৪৭২০, পৃ. ৫৪০

১৮৪. ড. মোঃ রহিম উল্যাহ, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

গিবত যা সে অপছন্দ করে। এ নিন্দাবাদ সত্য ও বাস্তবভিত্তিক হলে তা গিবত, মিথ্যা হলে অপবাদ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলে চোগলখুরী। ইসলামি শারি'আহ এ তিনটা জিনিসকেই হারাম করেছে।[১৮৫] অন্য একটা হাদিসে বর্ণিত আছে,

عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس الْمؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ.

'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি পরনিন্দা করে না, অভিসম্পাত করে না, অশ্লীলতা করে না এবং কটূভাষী হয় না।'[১৮৬] এ কাজকে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত গর্হিত কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা একে অপরের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা অবশ্যই এটা ঘৃণা করবে।'[১৮৭] কুরআনের এ'ই নির্দেশাবলী মুসলিম সমাজে এমনভাবে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন যে, তা মানুষের মর্যাদা রক্ষায় এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীরের রূপ ধারণ করে এবং মানুষের অন্তরে এক সুগভীর সদাচার-বিধি বদ্ধমুল করে দেয়।[১৮৮] অধিকন্তু কুরআনের অনুসৃত গিবতের বিরুদ্ধে ঘৃণা, আতংক ও ভয়াবহতার নির্দেশনার এ অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করে রাসুল সা. আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

রাসুল সা. কিয়ামতের ভয়াবহ দিন গিবতকারীর পরিণাম সম্পর্কে বলেন,

عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق أراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال.

'হযরত মু'আজ ইবন আনাস জুহানি রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী কারিম সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিকের হাত থেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাবেন যে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করে তা প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ জাহান্নামের পুলের উপর ততক্ষণ আটকিয়ে রাখবেন, যতক্ষণ না ঐ কথার (দোষ-ত্রুটির) ক্ষতিপূরণ হয়।[১৮৯]

গিবতের শাস্তি সম্পর্কে হযরত আনাস ইবন মালিক রা. বর্ণনা করেন, মহানবী সা. বলেছেন, 'যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি এমন কিছু লোকের পার্শ্ব অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, আর ঐ নখ দিয়ে তারা তাদের চেহারা এবং গোশতকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি জিবরাইল আ.-কে বললাম, এরা কারা? জিবরাইল আ. বললেন, এরা সে সব লোক, যারা পৃথিবীতে মানুষের গোশত ভক্ষণ করত অর্থাৎ গিবত করত এবং তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।'[১৯০] হাদিস

---

১৮৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৮১

১৮৬. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, হাদিস নং ১৯৮৩, পৃ. ৩৯৬

১৮৭. আল কুরআন, ৪৯ : ১২

১৮৮. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

১৮৯. ইমাম আবূ দাউদ রহ., অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ৪৮০৫, পৃ. ৫০১-৫০২

১৯০. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৮০১, পৃ. ৫০০

শরিফে গিবতকে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ হিসেবে সাবধান করা হয়েছে। এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হল যে, গিবতের মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট হয়।[১৯১] হযরত আবু সা'ইদ খুদরি রা. এবং জাবির রা. বর্ণনা করেন, হযরত রাসুল সা. বলেছেন,

عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، قالوا يا رسول الله، وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: إن الرجل قد يزني، ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه.

'গিবত যিনা তথা ব্যভিচার থেকেও নিকৃষ্ট ও অধিকতর মন্দ। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল সা.! গিবত ব্যভিচার থেকে মন্দ কি করে হতে পারে? তিনি বললেন, মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, এরপর তাওবা করলে আল্লাহপাক তাকে মাফ করেন, কিন্তু গিবতকারীকে আল্লাহ সে পর্যন্ত মাফ করেন না, যে পর্যন্ত যার গিবত করেছে সে মাফ না করে।[১৯২] তাই ইসলামি সমাজে প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে– যদি তার সামনে অন্য কোন ব্যক্তির উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয় তাহলে সে যেন তা চুপ করে না শোনে, বরং তার প্রতিবাদ করে এবং আল্লাহকে ভয় করতে ও তাঁর রাসুলের নির্দেশনা মানতে উপদেশ দিবে। এটাই মু'মিনের দায়িত্ব।

মানুষ সামাজিক জীব। তার সহজাত প্রবৃত্তি হল সব সময় নিজেকে বড় করে দেখা। এ অহম বা আমিত্বের আরেক নাম আত্মপূজা। সমাজে সাধারণত এ কাজটা সর্বদা করা হয়। দু'জন এক স্থানে হলেই তৃতীয় আর একজনকে নিয়ে কথা বলা হয়। সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারী এ মন্দ অভ্যাস অধিকাংশ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্দ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা শুরু হয়ে গেলে আত্মপ্রীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যেটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। তখন তার আত্মত্যাগের মত মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলো দূরীভূত হতে থাকে। ফলে এ স্থানে দানা বাঁধে হিংসা-বিদ্বেষ ও অপরের প্রতি কুধারণা, যা মানুষকে গিবত করতে বাধ্য করে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গিবত থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, অনেক সময় এটাই সকল অশান্তির মূল হয়ে দাঁড়ায়।

গিবত থেকে বেঁচে থাকার উপায় : এ ভয়ঙ্কর নিন্দনীয় চরিত্র থেকে বেঁচে উপায়গুলো হল– (ক) অপরের অপরাধকে ক্ষমা করে দেয়া,[১৯৩] (খ) গিবত করার ইচ্ছা জাগ্রত হলে, আল্লাহর নির্দেশ ও রাসুল সা.-এর সাবধান বাণী স্মরণ করা, (গ) আত্মত্যাগ করা অর্থাৎ যে কোন প্রয়োজনে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়া। যেমন, আল্লাহর বাণী, 'তারা নিজের উপর অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অনটনের মধ্যে থাকে।'[১৯৪] (ঘ) মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী অধ্যয়ন করা অর্থাৎ তাদের ত্যাগের কথা স্মরণ করা, (ঙ) অপরের কল্যাণ কামনা করা। প্রিয়নবী সা. বলেছেন, 'দ্বীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা করা।' (চ) যখনই মনের ভিতর কারও গিবত করার ইচ্ছা হবে, তখন নিজের দোষ-ত্রুটিসমূহ স্মরণ করা।

গিবতের ব্যতিক্রম পন্থা অর্থাৎ যাদের দোষ বর্ণনা করা যায় : কোন কোন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গিবতকেই হারাম করা হয়নি, বরং কতক গিবতের অনুমতি আছে। কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরি হলে তা গিবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে প্রয়োজন

---

১৯১. আল্লামা আলাউদ্দিন আল হিন্দি, *কানযুল 'উম্মাল*, প্রাগুক্ত, খ.৩, হাদিস নং ৮০২৫, পৃ. ৫৮৬

১৯২. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৮০২৬

১৯৩. ইমাম আয যাহাবী রহ., *কুরআন সুন্নাহর আলোকে গীবত*(চট্টগ্রাম : বাইতুশ শরফ একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০৮), পৃ. ৪৪-৪৫

১৯৪. আল কুরআন, ৫৯ : ৯

ও উপকারিতাটা শারি'আহ সম্মত হতে হবে। যেমন, কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ফাতওয়া গ্রহণ করার জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলিমদের কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা ইত্যাদি দোষণীয় নয়।

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গিবতের মধ্যে শামিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তা মাকরুহ।[১৯৫] এসব মাসআলায় অভিন্ন বিষয় এ যে, কারও দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা না হওয়া আবশ্যক; বরং প্রয়োজন বশতই আলোচনা হওয়া উচিত। আর এটাই ইমানের বাস্তবতা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।'[১৯৬] আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'তারা (মু'মিনরা) অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে।'[১৯৭] যেসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় যা শারি'আতের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গিবত ছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না, আর ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্য গিবত না করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এমন ক্ষেত্রসমূহে গিবত হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসুল সা. এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেন, إن من أربى الربا، الاستطالة في عرض الْمسلم بغير حق 'কোন মুসলিমের মান-মর্যাদার উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম জুলুম।'[১৯৮] এ বাণীতে 'অন্যায়ভাবে' কথাটা বলে শর্তযুক্ত করাতে বুঝা যায় যে, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়িয। নবী কারিম সা. নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটা নজির আছে। যা থেকে জানা যায় ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি পরিস্থিতিতে ও প্রয়োজনে গিবত করা জায়িয হতে পারে। যেমন,

(ক) আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত আছে, একদা এক বেদুইন এসে নবী কারিম সা.-এর পিছনে নামাজে শামিল হল এবং নামাজ শেষ হওয়া মাত্রই এ কথা বলে প্রস্থান করল যে, হে আল্লাহ! আমার উপর রহম কর এবং মুহাম্মদের উপর রহম কর। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরিক কর না। নবী কারিম সা. সাহাবিদের বললেন, ألم تسمعوا إلى ما قال أتقولون هو أضل أم بعيره؟ 'তোমরা কি বল, এ লোকটাই বেশি বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শোননি সে কী বলেছিল?'[১৯৯] নবী কারিম সা.-কে তার অনুপস্থিতিতে একথা বলতে হয়েছিল। কারণ, সালাম ফিরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। রাসুল সা.-এর উপস্থিতিতেই সে একটা ভুল কথা বলে ফেলেছিল। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারত যে, সময় বিশেষে এরূপ কথা বলা হয়ত জায়িয। তাই রাসুল সা. কর্তৃক এ কথার প্রতিবাদ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

(খ) ফাতিমা বিনতে কাইসকে আবু জাহম ইবন হুযাইফা ও মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রা. উভয়েই বিয়ের প্রস্তাব দিলে ফাতিমা বিনতে কাইস নবী কারিম সা.-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন, আবু

---

১৯৫. সাইয়িদ মাহমুদ আল আলুসি রহ., *রুহুল মা'আনি*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ১৬১

১৯৬. আল কুরআন, ১৭ : ৩৬

১৯৭. আল কুরআন, ২৩ : ৩

১৯৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৯১

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

জাহম তো হলো এমন ব্যক্তি যে মহিলাদের থেকে তার লাঠি সরায় না। আর মু'আবিয়া তো দরিদ্র। তার তো ধন-সম্পদ নেই। বরং তুমি উসামাকে বিয়ে কর।[২০০] এখানে একজন নারীর ভবিষ্যত জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে নবী কারিম সা.-এর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরি মনে করলেন।

(গ) একদিন প্রিয়নবী সা. হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রা.-এর ঘরে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, এ ব্যক্তি তার গোত্রের অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি বাইরে গেলেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে কথাবার্তা বললেন। রাসুল সা. ঘরে ফিরে আসলে হযরত আয়িশা রা. বললেন, আপনি তো তার সাথে ভালভাবে কথাবার্তা বললেন। অথচ যাওয়ার সময় আপনি তার সম্পর্কে ঐ কথা বলেছিলেন। জবাবে রাসুল সা. যা বললেন নিচের হাদিস থেকে তা জানা যায়,

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أئذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل عليه ألان له القول، قالت عائشة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ له الذي قلتَ ثم ألنتَ له القولَ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه.

'হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি নবী কারিম সা.-এর কাছে প্রবেশেরে অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও। সে তো সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তি (অথবা বললেন) সে তার গোত্রের সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক। সে যখন রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে প্রবেশ করল তখন তিনি তার সঙ্গে নম্র ভাষায় কথা বললেন। তখন আয়িশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো তার সম্বন্ধে যা বলার বললেন। এরপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললেন? তিনি বললেন, হে আয়িশা! কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য হবে, যাকে লোকজন তার দুর্ব্যবহারের জন্য করে।'[২০১] এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী কারিম সা. তার সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলেছেন এ জন্য যে, নবীর উত্তম স্বভাব এটাই দাবি করে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি এ আশংকা করলেন, লোকটার সাথে তাকে দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখে তার পরিবারের লোকজন তাকে তাঁর বন্ধু বলে মনে করে বসতে পারে। তাহলে পরে কোন সময় সে এর সুযোগ নিয়ে কোন অবৈধ সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তিনি হযরত আয়িশা রা.-কে সতর্ক করে দিলেন যে, সে তার গোত্রের জঘন্যতম মানুষ। এ হাদিস দ্বারা ইমাম বুখারি রহ. ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের গিবত করার বৈধতা প্রমাণ করেছেন।[২০২]

(ঘ) এক সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে রাসুল সা.-কে বলল, 'আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না।'[২০৩] স্বামীর অনুপুস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গিবতের

২০০. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, হাদিস নং ১১৩৫, পৃ. ৪১৬-৪১৭

২০১. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৬৩৬০, পৃ. ১১৯

২০২. ইমাম আবূ দাঊদ রহ., অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ৪৮০৭, পৃ. ৫০৩

২০৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, হাদিস নং ৪৯৭৩, পৃ. ১০০

পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু রাসুল সা. তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ, যুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মাযলুমের রয়েছে। রাসুল সা.-এর সুন্নাতের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকিহ ও হাদিস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গিবত তখনই বৈধ যখন শারি'আতের দৃষ্টিতে বৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গিবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এ বিধির উপর ভিত্তি করে আলিমগণ নিম্নরূপ গিবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন–[২০৪]

এক. যে ব্যক্তি যুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায় এমন ব্যক্তির কাছে যালিমের বিরুদ্ধে মাযলুমের ফরিয়াদ।

দুই. সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তির কাছে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা যে তার প্রতিকার করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

তিন. ফাতওয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত কাজকর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

চার. যেসব লোক গুনাহ ও পাপকার্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে অথবা বিদ'আত ও গুমরাহির প্রচার চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও যুলুম-নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।

পাঁচ. মানুষকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমন, হাদিস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দূর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে শুধু জায়িযই নয়; বরং ওয়াজিব। কেননা, এ ছাড়া শারি'আতকে ভুল বর্ণনার প্রচারণা ও বিস্তার থেকে, আদালতসমূহকে বেইনসাফি থেকে এবং জনসাধারণকে গুমরাহি থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ছয়. যেসব লোক কোন মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোন নাম বলে বা উপাধি দ্বারা তাদেরকে আর চেনা যায় না, তাদের মর্যাদাহানির উদ্দেশ্য নয়; বরং পরিচয় দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা বৈধ। এ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অসাক্ষাতে কারও নিন্দাবাদ একেবারেই হারাম। মহানবী সা. বলেছেন,[২০৫]

ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته ، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته.

সকল ধরনের গোড়ামি ও সংকীর্ণতা পরিহার করা : আবহমান কাল ধরে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টির মূল কারণ মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ, বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ, জাতীয়তার গোড়ামি ও সংকীর্ণতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ সাধারণত মানবতাকে উপেক্ষা করে তাদের চারপাশে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত টেনেছে। এ বৃত্তের মধ্যে জন্ম গ্রহণকারীদের সে তার আপনজন এবং বাইরে জন্ম গ্রহণকারীদের পর বলে মনে করেছে। কোন যৌক্তিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে এ বৃত্ত টানা হয়নি; বরং টানা হয়েছে জন্মের ভিত্তিতে, গোত্র বা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে, কোথাও ভৌগোলিক এলাকা, বিশেষ বর্ণ এবং বিশেষ ভাষাভাষী জাতির ভিত্তিতে। এসব ভিত্তির উপর নির্ভর করে আপন-পরের বিভেদ টানা হয়েছে। আইন ও নৈতিক নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।

---

২০৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৯২

২০৫. ইমাম আবূ দাউদ রহ., অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ৪৮০৬, পৃ. ৫০২

এমন দণ্ডে যাদের আপন বলে মনে করা হয়েছে, পরদের তুলনায় তাদের কেবল অধিক ভালবাসা বা সহযোগিতার মধ্যেই থাকেনি, বরং এ বিভেদনীতি, ঘৃণা, শত্রুতা, তাচ্ছিল্য ও অবমাননা এবং যুলুম-নির্যাতনের জঘন্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। বিভিন্ন জাতি এটাকে তাদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ভিত্তিতেই ইয়াহুদিরা নিজেদের আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি বলে মনে করেছে এবং সর্বক্ষেত্রে অ-ইসরাইলিদের তাদের অধিকার ও মর্যাদা থেকে নিম্নপর্যায়ে রেখেছে। এ ভেদনীতিই হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের জন্ম দিয়েছে। যার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উচ্চ বর্ণের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নিচ ও অপবিত্র সাব্যস্ত করে শুদ্রদের চরম লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কাল ও সাদার মধ্যে পার্থক্য টেনে আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর যে স্টিমরোলার চালান হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান হয়ে আছে। ইউরোপের মানুষ আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড ইন্ডিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর সাথে যে আচরণ করেছে তা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই; বরং আজ এ শতাব্দীর প্রতিটা মানুষ তা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছে।

তারা নিজের দেশ ও জাতির গণ্ডির বাইরে জন্ম গ্রহণকারীদের জান-মাল ও সম্ভ্রম নষ্ট করে তাদের লুট করা ও ক্রীতদাস বানানো এবং প্রয়োজনে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার নিজেরা বানিয়ে নিয়েছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জাতিপূজা এক জাতিকে অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য যেভাবে পশুতে পরিণত করেছে তার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে সংগঠিত যুদ্ধসমূহে দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে নাৎসি জার্মানিদের গোষ্ঠী দর্শন ও নরডিক প্রজাতির শ্রেষ্ঠতের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে ভয়াবহ ফল দেখিয়েছে তা থেকে অতি সহজেই অনুমেয় যে, তা কত বড় এবং ধ্বংসাত্মক গুমরাহি। এ সকল প্রকার গুমরাহির সংশোধনের জন্যই কুরআনের এ আয়াত উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ط إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

'হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরে তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অন্যের পরিচয় পাও, আর তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক মুত্তাকি, তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি।'[২০৬] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন।[২০৭]

এক. তোমাদের সকলের মূল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং নারী থেকে গোটা মানবজাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। পৃথিবীতে যত বংশধারা দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে তা একটামাত্র বংশধারার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা মাত্র। এ সৃষ্টি ধারার মধ্যে কোথাও বিভেদ এবং উঁচু-নিচুর কোন ভিত্তি নেই।

দুই. মূল উৎসের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। একথা স্পষ্ট যে সমগ্র বিশ্বে গোটা মানব সমাজের একটা মাত্র বংশধারা আদৌ হতে পারত না। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন খান্দান ও বংশধারার সৃষ্টি হওয়া এবং এসব খান্দানের সমন্বয়ে গোত্র ও জাতিসমূহের পত্তন হওয়া অপরিহার্য ছিল। বরং সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আকারে বিন্যস্ত করেছেন এ জন্য যে, সমগ্র পৃথিবীতে তাদের আবাদ হবে, পারস্পরিক জানা-শোনার মাধ্যমে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই-ভাই হয়ে বসবাস করবে।

---

২০৬. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

২০৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৯৬-৯৭

তিন. মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থেকে থাকে তা হচ্ছে তার নৈতিক চরিত্র। যে মূল জিনিসের উপর ভিত্তি করে একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে তাহল– কে অধিক মুত্তাকি– আল্লাহভীরু ও পরহেজগার। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ, প্রাচ্যে জন্মলাভ করুক বা পাশ্চাতে তাতে কিছুই এসে যায় না। এ অকাট্য সত্য কথাগুলো আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা. তাঁর বিভিন্ন ভাষণ ও উক্তিতে বিষয়টা আরো স্পষ্ট করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ সা. স্বীয় উষ্ট্রী 'কাসওয়া'-এর পিঠে আরোহী অবস্থায় কা'বার তাওয়াফের পর যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার এক অংশ হল এমন,

يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بابائها فالناس رجلان : بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب.

'হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা জাহিলি যুগের অন্ধ অহমিকা এবং পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার প্রথা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। মানুষ হল দু'ধরনের। এক প্রকার হল সৎ, পরহেযহার এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান। আরেক প্রকার হল অসৎ, বদবখত এবং আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট। সমস্ত মানুষ হল আদমের সন্তান। আল্লাহ তা'আলা আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।'[২০৮]

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরিকের মাঝামাঝি সময়ে নবী কারিম সা. ভাষণ দান কালে বলেন,[২০৯]

يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ... ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فليبلغ الشاهد الغائب.

'সকল মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। কারও প্রতি কারও বিশেষ কোন মর্যাদা নেই, তবে মর্যাদা হল তাকওয়া পরহেজগারির ভিত্তিতে।'[২১০] বুখারি শরিফে রয়েছে, হুজুর পাক সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কে? তিনি বললেন, 'যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার।' অন্যত্র নবী কারিম সা. বলেছেন,

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

'আল্লাহপাক তোমাদের চেহারা এবং তোমাদের অর্থ-সম্পদের দিকে দেখেন না। তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর এবং আমল।'[২১১] আল্লামা বাগভি রহ. লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেছেন, 'একদা হযরত সাবিত ইবন কাইস রা. এক ব্যক্তিকে 'তুমি তো অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র' বলে হেয় করার চেষ্টা করলে হুজুর সা. হযরত সাবেত ইবন কাইস রা.-কে আদেশ দিলেন, লোকদের চেহারাগুলো দেখ। সাবিত রা. আদেশ পালন করলে নবীজি বললেন, কি দেখলে? সাবিত রা. আরজ করলেন, কাউকে গৌরবর্ণ, কাউকে লাল আর কাউকে দেখলাম কাল। তখন রাসুল সা. বললেন, তুমি শুধু দ্বীন এবং পরহেজগারির কারণে তাদের উপর মর্যাদা রাখ; বংশীয় মর্যাদা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা প্রাধান্য লাভের মানদণ্ডও নয়।'[২১২] বংশ-বর্ণ, অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা কোন কিছুই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয় না, তবে দ্বীনদারি এবং পরহেজগারি মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে। এটাই মর্যাদা লাভের একমাত্র মানদণ্ড।

---

২০৮. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ৩২৭০, পৃ. ৫৩০

২০৯. ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল রহ., *আল মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১৭, হাদিস নং ২৩৪৮৯, পৃ. ৪৭

২১০. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ৩০৩

২১১. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৬৩১১, পৃ. ১০২

২১২. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ৩০২-৩০৩

রাসুল সা. হযরত আবুজর রা.-কে বলেছিলেন, 'মনে রেখ, তুমি কোন লাল বা কৃষ্ণবর্ণের মানুষের প্রতি বিশেষ কোন ফযিলত রাখ না, তবে তাকওয়া, পরহেজগারিতে এগিয়ে যাও, তাহলে তোমার সম্মান সর্বাধিক হবে।[২১৩] এজন্য আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শেষ অংশে বলেছেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ط 'আল্লাহর দরবারে সে বেশি সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার।' ইবন জারির লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

عن ابن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ط.

'আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশি আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।'[২১৪] কেননা, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর সংবাদ রাখেন। কুরআন ও হাদিসের এসব শিক্ষা কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সে শিক্ষা অনুসারে ইসলাম মু'মিনদের সমন্বয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যেখানে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ, কাল, জাতীয়তার কোন ভেদাভেদ নেই। যেখানে উঁচু-নিচ, ছুত-ছাত এবং বিভেদ ও পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই এবং যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশেরই হোক না কেন, সেখানে মানুষ সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে শরিক হতে পারে এবং হয়েছে। ইসলাম বিরোধীদেরও এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের নীতিমালাকে ইসলাম যেভাবে সফলতার সাথে বাস্তবে রূপদান করেছে বিশ্বের আর কোনও ধর্ম ও আদর্শে কখনও তার নজির পরিলক্ষিত হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ইসলামের মধ্যেই আছে সে আদর্শ, যা বিশ্বের সমগ্র অঞ্চল ও আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠীকে একত্রিত করে একটা জাতি সত্তায় মিলিয়ে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের আলোচ্য সুরা আল হুজুরাতের শিক্ষা বাস্তব জীবনে রাসুলে কারিম সা. রূপায়ন করে দেখিয়েছেন যে, কত সুন্দর ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন সম্ভব। তাই বর্তমানে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিকগণ এসব গুণাবলিতে গুণান্বিত হয়ে সুনাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হলে একটা উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গঠন সম্ভব। আর তা অনুসরণ করলে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও সময় উপযোগী পদক্ষেপ ও সার্থক হবে বলে আশা করা যায়।

---

২১৩. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমর ইবন কাছির রহ., *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৩৮৬

২১৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., অনূ. মাওলানা মুজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৯৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুরা আল হুজুরাতে বর্ণিত ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত আলোচনা

ইসলাম চিরকালীন শান্তি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলামি সমাজ সমগ্র বিশ্বকে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। পৃথিবীর অন্য কোন আদর্শ, পথ বা মতের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতত্বের বন্ধন পাওয়া যায় না; বরং তা অলিক কল্পনা মাত্র। যা শুধুমাত্র মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া যায়। 'উখুওয়াত' শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভ্রাতৃত্ব, হৃদ্যতা, সৌহার্দ, সুসম্পর্ক ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দমূলক নিবিড় সম্পর্ক, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, একে অপরের সাথে গভীর বন্ধন, বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ককেই উখুওয়াত ভ্রাতৃত্ব বলে। এ সম্পর্ক বিভিন্নভাবে গড়ে উঠে। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ককেও ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। ভ্রাতৃত্ব বা বন্ধুত্ব বাংলা ভাষায় বিশেষণ শব্দ। ভ্রাতা বা ভাই থেকেই ভ্রাতৃত্ব শব্দের উৎপত্তি।[২১৫] ভ্রাতৃত্বকে আরবিতে 'ইখওয়ান' বা 'উখওয়াহ' বলা হয়।[২১৬] উভয় শব্দই আখুন-এর বহুবচন।[২১৭] ভ্রাতৃত্ব শব্দটাকে আরবিতে উখুওয়াতও বলা হয়। ভ্রাতৃত্বকে Fraternity, Brotherhood, Friendship বলা হয়। ঔরসজাত দু'সহোদর ভ্রাতার মধ্যে যে হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি এবং ঐকান্তিকতা তা ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব। উখুওয়াতের উৎপত্তি এখান থেকেই। এ সম্পর্ক বৈবাহিক কারণেও হতে পারে, আবার উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আচার-ব্যবহার ও আদর্শিক কারণে হতে পারে। এটা যেকোন ভ্রাতৃত্বের অর্থ প্রদান করে থাকে। ইবন আরাফিহ বলেন, উখুওয়াতুন হিসেবে ব্যবহৃত হলে তখন এটা ঔরসজাত ভ্রাতৃত্বের অর্থ প্রদান করে না, বরং যে-কোন ভ্রাতৃত্বের অর্থ প্রদান করে থাকে। যেমন, বলা হয় 'ঘুম মৃত্যুর ভাই।'[২১৮] ইংরেজিতে ভ্রাতৃত্বের সমার্থক, বিপরীতার্থক ও এতদসংক্রান্ত যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো :

Brotherhood (Synonyms) :[২১৯] board, association, chamber, club, college, congress, consortium, council, fellowship, fraternity, guild (also gild), institute, institution. **Antonyms** : ill will, malevolence, venom. **Near Antonyms** : forlornness, loneliness, lonesomeness. **Related Words :** collective, commune, community, cooperative; alliance, bloc, camp, coalition, partnership; body, cadre, group; circle, clan, clique, coterie, junta, junto, klatch, lot, set; crew, outfit, cabal, party, squad, team; branch, chapter, local; faithful, fold,gang, membership; sisterhood, sorority; camarilla, camorra, ring.

আরবি অভিধানবেত্তাগণ সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃত্ব বুঝাতে 'উখুওয়াত' এবং বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতার সম্পর্কযুক্ত ভ্রাতৃত্ব বুঝাতে 'ইখওয়ান' শব্দ ব্যবহার করলেও সাধারণভাবে 'উখুওয়াত' সকল ভ্রাতৃত্বকেই বুঝায়। এজন্যই 'মিসবাহুল লুগাত' গ্রন্থে পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে উখুওয়াত বলা হয়েছে।[২২০]

---

২১৫. আহমদ শরীফ, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬), পৃ. ৪৪১

২১৬. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আজহারী, *আরবী বাংলা অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৮৪), খ.১, পৃ. ৯০; ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*(বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুলাসিল আরাবি, ১৯৯৫), খ.১, পৃ. ৯০-৯১; ড. ইবরাহিম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসিত*(দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, এপ্রিল ১৯৯৫), মাওলানা অহিদুজ জামান কাসিমি, *আল কামুসুল জাদিদ*(দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, ১৯৯৫), পৃ. ১৬৩

২১৭. A.S. Horn, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*(New York : Oxford University Press, 2001), p. 160

২১৮. Edward William Lane, *Arabic English Lexion*(Bairut : Librairic Duliban, 1980), Vol.I, pp. 32-34

২১৯. www.merriam-webster.com/dictionary, visited on 10.02.2018

২২০. ড.এ আর এম আলী হায়দার, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : অক্ষর-পত্র প্রকাশনী, জুন ২০১৬), পৃ. ২৫৯

সাধারণভাবে ভ্রাতৃত্ব বা উখুওয়াত ছয় প্রকার।[২২১] যেমন, (১) আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব, (২) বিশ্বভ্রাতৃত্ব, (৩) মূলগত ভ্রাতৃত্ব, (৪) কৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব, (৫) রক্তসম্পর্কীয় ভ্রাতৃত্ব ও (৬) আঞ্চলিক ভ্রাতৃত্ব।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই সুনাগরিক গঠনের মূলমন্ত্র। যেখানে দেহ অনেক আত্মা এক। ইসলামি শারি'আতের পরিভাষায় সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদ, রোগ-শোক, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথাবার্তা, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষ পরস্পর ভাইয়ের ন্যায় একে অপরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করাকেই ভ্রাতৃত্ব বলে।

সুরা আল হুজুরাতে বর্ণিত ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত আলোচনা

ইসলামের ব্যবহারিক দিক থেকে সাধারণত দুই ধরনের ভ্রাতৃত্বকে স্বীকার করা হয়।[২২২] যথা, (১) ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও (২) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব : ইসলামি আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে যারা ইসলামের অনুকরণ ও অনুসরণ করে এবং কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ঘটায় তারাই পরস্পর ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের প্রতি আপন ভাই বা সহোদরের মত আচার-আচরণ ও সুম্পর্ক বিদ্যমান থাকাই ইসলামি ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্য। বস্তুত ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এমন একটা ভ্রাতৃত্ব যা এক জনের স্বার্থ, লাভ, ক্ষতি, ভাল-মন্দ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

একের সুখে সুখী, এক জনের দুঃখে দুঃখী, একে অন্যের আনন্দে আনন্দিত আর ব্যথায় ব্যথিত হওয়াই হচ্ছে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি।[২২৩] মহান আল্লাহ এ ভ্রাতৃত্ববোধের মূলমন্ত্র ঘোষণা করে বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا ۚ.

---

২২১. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ সম্পাদিত, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড, জুন ২০১৫), পৃ. ২৪৯

২২২. অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিমগণ বর্ণিত দুই প্রকার ভ্রাতৃত্ব ছাড়াও সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে আরও চার প্রকার ভ্রাতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সেগুলো হলো– **(ক) ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব :** একই পিতা-মাতার গর্ভে যে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে যে হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ঐকান্তিকতা ও সহমর্মিতা থাকে তাকেই ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সন্তান তৈয়ব ও তাহের। তাঁদের উভয়ের পিতা হযরত মুহাম্মদ (স.) আর উভয়ের মাতা বিবি খাদিজা (রা.)। তৈয়ব ও তাহের উভয়ে পরস্পর ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব। বস্তুত এ ভ্রাতৃত্বকে আপন বা সহোদর ভ্রাতৃত্ব ও বলা হয়। **খ. কৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব :** কোনো রক্ত সম্পর্কীয় সম্বন্ধ ছাড়াই কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভ্রাতৃত্বের আন্তরিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। কোন নির্দিষ্ট বংশ, বর্ণ বা অঞ্চলে জন্ম ও বসবাসের কারণে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে তাকে কৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব বলে। মূলত প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন অঞ্চল, এলাকা বা সমাজে বসবাস করে। বিভিন্ন গোত্র, বংশ বা গোষ্ঠীর মানুষ একই সমাজে বসবাসের কারণে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়। এ ভ্রাতৃত্ব কোন কিছুর প্রভাবে উৎসারিত হয় না। একমাত্র উঠাবসা, চলাফেরা, মেলা-মেশা, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন প্রভৃতির মাধ্যমেই ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। আর এ ভ্রাতৃত্বই কৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব। বস্তুত, আধুনিক বিশ্বে কৃত্রিম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কীয় লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। **(গ) মূলগত ভ্রাতৃত্ব :** বিশ্বের সকল মানুষ একই মূল সূত্র থেকে উৎসারিত। সকলের আদি পিতা ও মাতা একই। হযরত আদম আ. ও মাতা হযরত হাওয়া আ.। এ হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে মূলগত ভ্রাতৃত্ব। **(ঘ) আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব :** একটা নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সম্পর্কের উদ্ভব হয় সেটাই আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব। যেমন, ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহতা'আলা কর্তৃক মনোনীত শাশ্বত জীবনাদর্শ। বিশ্বের সমস্ত জনগোষ্ঠী যে কোন বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও এলাকার হোক না কেন, তারা কোন না কোন আদর্শে বিশ্বাসী। মূলত কোন এক আদর্শে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী পরস্পর ভাই ভাই। আর তারা কোন না কোন আদর্শে বিশ্বাসী। আর এরূপ সম্পর্ককেই আদর্শগত বা আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। বিশ্বে ছোট-বড় বিভিন্ন ধর্ম, গোষ্ঠী বা আদর্শ রয়েছে। বস্তুত, আদর্শগত ভ্রাতৃত্ব যখন ইসলামি আদর্শের অনুসারী বা ভিত্তি হয় তখন তাকে ইসলামি উখুওয়াত বা ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বলে। অনুরূপ, খ্রিস্টান ধর্মের আদর্শে বিশ্বাসী হলে তাকে খ্রিস্টান ভ্রাতৃত্ব, ইয়াহুদি ধর্মের আদর্শে বিশ্বাসী হলে তাকে ইয়াহুদি ভ্রাতৃত্ব, পৌত্তলিক ধর্মের আদর্শে বিশ্বাসী হলে তাকে পৌত্তলিক ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। এছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের আদর্শে বিশ্বাসী হলে তাকে সে দলের সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট ভ্রাতৃত্ব বলে। যেমন, দল হিসেবে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ ভ্রাতৃত্ব, বিএনপি ভ্রাতৃত্ব, জাতীয় পার্টি বা জাকের পার্টি ভ্রাতৃত্ব, জামায়াত ভ্রাতৃত্ব, তাবলীগ ভ্রাতৃত্ব, ভারতের কংগ্রেস বা সিপিএম ভ্রাতৃত্ব, ইরাকের কুর্দি বা শিয়া ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। সমগ্র বিশ্বে অন্যান্য ভ্রাতৃত্বের তুলনায় আদর্শগত ভ্রাতৃত্বের লোক সংখ্যা অনেক বেশি। কেননা, গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে দল বা জনসাধারণ।

২২৩. মাওলানা খন্দকার আবুল ফজল, *ইসলামী জীবনের সংক্ষিপ্ত রুপরেখা*(ঢাকা : আল হেরা প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ৫৮-৫৯

'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে (ইসলাম গ্রহণের পর) তোমাদের অন্তরে আল্লাহ সম্প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। এরপর তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।'[২২৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।'[২২৫] আল্লাহপাকের ঘোষণা, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً 'মানবজাতি একটামাত্র উম্মত।'[২২৬] মূলত এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই হওয়ার কারণে কখনই পরস্পরের ক্ষতিসাধন করবে না, একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, চুরি, রাহাজানি ও হত্যার মত জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হবে না বা কাউকে সাহায্য ও করবে না। তাই সে দেশি হোক কিংবা বিদেশি হোক, সাদা বা কালো, ধনী কিংবা গরিব হোক, আরবি বা আজমি হোক, আশরাফ বা আতরাফ, কৃষক-শ্রমিক প্রমূখ যেই হোক না কেন, অপর ভাইয়ের অনিষ্ট করা থেকে বিরত থেকে ভাই ভাই হয়ে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকাই ইসলামি ভ্রাতৃত্বের মৌলিক দাবি।

একমাত্র ইসলামি ভ্রাতৃত্বই আর্তমানবতার পরিপূর্ণ মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। কখনই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। পবিত্র কুরআনে মুসলিম ও মু'মিনদের অপর মুসলিম ও মু'মিনের সঙ্গ ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বী ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক ও পাপাচারীর সাথে বন্ধুত্ব করতেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَه ۗ.

'মু'মিনগণ যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।'[২২৭] আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী কোন মানুষ পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে বসবাস করলেও একে অপরের পরস্পর দ্বীনি ভাই।[২২৮] আল্লাহপাক কুরআনুল কারিমে বারবার মুসলিম জাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুত করার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে বলেছেন, كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ 'এরা যেন সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়।'[২২৯] যা অতিশয় সুন্দর ও মজবুত।

বস্তুত, গোটা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়তা সম্পর্কিত এ আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাসুল সা. বলেছেন, 'মু'মিন মু'মিনের জন্য ইমারতের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে রাখে।'[২৩০] মুসলিমগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মুসলিমদের পৃথিবীর জীবন বিনষ্ট হবে এবং বিধর্মীরা তাদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন ও নির্যাতনের সুযোগ পাবে। তাই কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন না হয়ে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা উচিত।[২৩১] অপর হাদিসে মহানবী সা. বলেন,

---

২২৪. আল কুরআন, ৩ : ১০৩
২২৫. আল কুরআন, ৪৯ : ১০
২২৬. আল কুরআন, ২ : ২১৩
২২৭. আল কুরআন, ৩ : ২৮
২২৮. আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ১৯৮৭), পৃ. ৮৫
২২৯. আল কুরআন, ৬১ : ৪
২৩০. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, হাদিস নং ৫৬০১, পৃ. ৪১৩-৪১৪
২৩১. আবু রিফাত, *মহানবী (স.)-এর ভ্রাতৃত্ববোধ*(ঢাকা : মাসিক মদিনা, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, বর্ষ ৩৬, সংখ্যা-৩, জুন ২০০০), পৃ. ১৪

عن النعمان بن بشير يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ترى الْمؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.

হযরত নু'মান ইবন বাশির রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেছেন, 'তুমি মু'মিনদের পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন, পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা প্রদর্শন এবং পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের দিক দিয়ে একই দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের কোন একটা অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে, তখন গোটা দেহই নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।'[২৩২]

বস্তুত, মুসলিমগণ একটা শরীর তুল্য, কাজেই পৃথিবীর যে কোন স্থানের মুসলিমই নির্যাতিত ও যুলুমের স্বীকার হোক না কেন তাদের সহানুভূতি ও সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে এটাই ইমানের দাবি।[২৩৩] তাই মহানবী সা. ঘোষণা করেছেন, الْمسلم أخو الْمسلم 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই।'[২৩৪] বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসুলেপাক সা. পৃথিবীর সকলকে ভাই ভাই সম্পর্কে জুড়ে দিয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৩৫] বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগি ও উৎসব পালনের সময় মুসলিমরা তাই একত্রে ভাই ভাই হিসেবে একাকার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'অতঃপর, তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি সম্পর্কীয় ভাই।'[২৩৬] ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা কেবল প্রচার প্রপাগান্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বাস্তব জীবনেও তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রমাণ করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। বস্তুত, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ইসলামের চিরন্তন সোনালী অধ্যায়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বয়ং মহানবী সা. তাঁর জীবনে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের মিশন প্রতিষ্ঠা করে যে প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন তা ইসলামের ইতিহাসে বিরল।[২৩৭] পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে তিনি মদিনায় হিজরতের পর আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্কে গড়ে দিয়ে সহাবস্থানের ব্যবস্থা করে অন্যন্য ইতিহাস রচনা করেছিলেন।[২৩৮] মূলত এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিল সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।[২৩৯] প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন সক্রিয় উদ্যোক্তা। তিনি বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে এক অভিনব চুক্তি সম্পাদন করেন।'[২৪০] মহানবী সা. বিদায় হজ্জের[২৪১] ঐতিহাসিক ভাষণে প্রায় লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে ঘোষণায় বলেন, 'জেনে রেখ, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই।'

---

২৩২. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, হাদিস নং ৫৫৮৫, পৃ. ৪০৭-৪০৮

২৩৩. Abdus Salam M. Haroon, *Tahjib Sirat Ibn Hisham*(Cairo : Al-Falah Foundation, 2000), p. 105

২৩৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, হাদিস নং ২২৮০, পৃ. ২৪৩

২৩৫. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম*(ঢাকা : আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ৫৮

২৩৬. দৈনন্দিন পাঁচ বার নামাজ আদায়, সিয়াম সাধনা, জুমু'আ ও দু'ঈদের নামাজ, হজ্জ প্রভৃতি মুসলিমদের অন্যতম ইবাদত। এ সকল ইবাদত ইসলামি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। দ্র. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা*(ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ৩য় সং., মে ১৯৯৪), পৃ. ৪৬-৪৭

২৩৭. Fyzee, *Outlines of Muhammadan law*(London : Oxford University Press), p. 13

২৩৮. মদিনার সকল গোত্র এবং আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে একটা ন্যায়নীতি ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠন করে তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়; ভাষা ও বর্ণের স্বাদেশিকতা কিংবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতেও নয়; বরং তা গড়ে উঠেছিল একমাত্র দ্বীনের ভিত্তিতে। তারা সকলেই ছিলেন একই দ্বীনে বিশ্বাসী, একই আদর্শের অনুসারী, একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও একই লক্ষ্যের পথযাত্রী, পরস্পর ভাই ভাই। এ ক্ষেত্রে হাবসার বিলাল রা., রোমের শুয়াইব রা., পারস্যের সালমান রা., মক্কার আবুবকর ও উমর রা. এবং মদিনার আনসারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০২), পৃ. ১৫৭

২৩৯. হযরত মাওলানা হাকীম আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, অনূ. মাওলানা আ.ছ.ম মাহমুদুল হাসান খান ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, *আসাহহুস সিয়ার*(ঢাকা : ইফাবা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬), পৃ. ১২০

২৪০. Sayed Ali Ahsan, *Muhammad sm.,* (Dhaka : Special Publication, September 2002) p.129; আবূ সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*(ঢাকা : নাকীব পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০০১), পৃ. ৮২

আর সকল মুসলিমকে নিয়ে গঠিত হল এক ও অভিন্ন ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সমাজ।'[২৪২] শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায় 'ইসনা আশারিয়ার' ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিক[২৪৩] বলেন, ভাই হয়ে অপর ভাইয়ের প্রতি সাতটা করণীয় ও পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।[২৪৪] সেগুলো হলো :

(১) প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তোমার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে। আর তোমার নিজের জন্য যা অপছন্দ কর, তোমার ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দ করবে। (২) তার কোন ওয়াদা ও দা'ওয়াত যথারীতি পালন ও কবুল করবে। অসুস্থ্য হলে দেখতে যাবে, মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় উপস্থিত হবে। তার কোন প্রয়োজন অনুভূত হলে দ্রুততার সাথে প্রয়োজন পূরণ করবে। (৩) তোমার ভাইয়ের প্রতি কখনও রাগান্বিত হবে না বরং তার জন্য সুখ-শান্তি কামনা করবে। (৪) তুমি অন্তর, মুখ ও হাত দ্বারা সর্বদা সহযোগিতা করবে, তার ইচ্ছাসমূহ পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা করবে। (৫) তোমার ভাই যখন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বা বিবস্ত্র অবস্থায় থাকবে, তখন তুমি পেট ভরে খাবে না, পান করবে না। নতুন পোশাক পরিধানও করবে না। অর্থাৎ গরিব ভাইয়ের মতই হবে তোমার জীবন-যাপন। (৬) যদি তুমি কাজ নিজে করতে পার, তাহলে তোমার অপর ভাইকে চাকর রাখবে না। তুমি তার জামা-কাপড় পরিষ্কার করে দিবে, তাকে খাবার দিবে ও নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী দিবে। (৭) জীবনে চলার পথে তার কোন ত্রুটি ধরা পড়লে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করবে এবং সঠিক ও সৎপথে চলার দিক নির্দেশনা দিবে। ইসলামি ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

إن أحدكم مرأة أخيه فإن راى به أذًى فليمطه عنه.

'নিশ্চয় তোমার এক ভাই অন্য ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। কাজেই কেউ যখন অপরের মধ্যে খারাপ কিছু দেখে তখন যেন সে তা দূর করে দেয়।'[২৪৫] রাসুল সা. আরও বলেছেন, 'এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য ভাই স্বরূপ। কাজেই একজন মুসলিমের উচিত অপর মুসলিমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এবং তার অনুপস্থিতিতে সে ব্যক্তির জান-মাল রক্ষা করা।'[২৪৬] ইসলামি ভ্রাতৃত্ব মহান আল্লাহর তাওহিদ ও মহানবী সা.-এর রিসালতের যোগসূত্রে গ্রোথিত। এটা পরস্পরের প্রতি গভীর স্থিতিশীল ও প্রেমের আবেগময় বন্ধনে আবদ্ধ। এ বন্ধনে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা ইমানের পরিপন্থী।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব : নিখিল বিশ্ব মানবতা মূলত একই উৎস হতে উৎসারিত। একই স্রষ্টার সৃষ্টি। একই আদি পিতা হযরত আদম আ. ও আদি মাতা হাওয়া আ.-এর সন্তান হিসেবে সমগ্র বনি আদম একই জাতিসত্তার

---

২৪১. মহানবী সা. একাধিক বার হজ্জব্রত পালন করেছেন। জীবনের সর্বশেষ ১০ম হিজরির জিলহজ্জ মাসে হজ্জব্রত পালন শেষে আরাফার ময়দানে যে ভাষণ প্রদান করেন তা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। মূলত হজ্জ গোটা মুসলিম বিশ্বের মহাসম্মিলন। সকলেই সমবেতভাবে অনুভব করেন যে, সকল মানুষই সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সমানাধিকার নিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত হজ্জ ছাড়া সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের এমন অপূর্ব দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না। জীবনের শেষ হজ্জব্রত পালন শেষে মহানবী সা. বিশাল জনতাকে লক্ষ্য করে ভাই ভাই ঘোষণা দিয়ে বিশ্বসাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাস্তব নিদর্শন রেখে গেছেন। দ্র. শামসুল হক, *বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৪), পৃ. ১৩২-১৩৩

২৪২. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*(ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, অক্টোবর ১৯৯৬), পৃ. ২৫৬; বেগম আয়েশা বাওয়ানী, *ইসলাম : প্রথম ও চূড়ান্ত ধর্ম*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৪), পৃ. ১৫২-১৫৪

২৪৩. শিয়া সম্প্রদায় বারো ইমামে বিশ্বাসী। শিয়াদের প্রধানতম তিনটা সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায় 'ইসনা আশারিয়া'দের বারো ইমামের মধ্যে 'ইমাম জাফর আস-সাদিক' হলেন অন্যতম; দ্র. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০০৭), পৃ. ১৯২; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*(ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, জুলাই ১৯৯২), পৃ. ২২

২৪৪. আবু জিবরান, *মুসলিম ভ্রাতৃত্ব*(ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম, বর্ষ ৩১, সংখ্যা-২০১, ১২ আগষ্ট ২০০৫), পৃ. ১২

২৪৫. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী, অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, হাদিস নং ১৯৩৫, পৃ. ৩৭৩

২৪৬. ইমাম আবূ দাউদ রহ., অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৪), খ.৫, হাদিস নং ৪৮৩৮, পৃ. ৫১৫-৫১৬

অন্তর্ভুক্ত ও পরস্পর ভাই ভাই। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় কুরআন মাজিদে, يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى 'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি।'[২৪৭] এ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে মহানবী মুহাম্মদ সা. ঘোষণা করেছেন, كلكم من آدم وآدم من تراب 'তোমরা সকলেই এক আদম আ. হতে উৎসারিত, আর আদম হলেন মাটির তৈরি।' এ মর্মে কুরআনের ঘোষণা হলো, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً 'মানবজাতি একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।'[২৪৮] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ

'তোমরা মূলত একই দলভূক্ত, আর আমি তোমাদের প্রভূ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করে চল।'[২৪৯] ইসলামি আদর্শে দীক্ষিত ও উজ্জীবিত সকল মানবগোষ্ঠী বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সদস্য। মূলত ভৌগোলিক সীমারেখা, দেশ, বর্ণ-ভাষা, গোত্র তথা সকল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের গণ্ডি পেরিয়ে এ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি। আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا 'হে রাসুল সা.! আমি আপনাকে বিশ্ব মানবতার জন্য শুভ-সংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।'[২৫০] বিশ্বনবী সা. বলেন,

بعثتِ الأنبياء إلى أقوامهم وبعثتُ إلى الناس كافةً.

'অপরাপর নবীগণ তাদের নিজ-নিজ কওম বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য।' ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অগ্রপথিক। কুরআনুল কারিমে উম্মতে ওয়াহিদা, নফসে ওয়াহিদা এবং ইয়া আইয়ুহান নাস! বলে সম্বোধন করে বিশ্বের সকল মানুষের উৎস যে এক ও অভিন্ন তা বুঝানো হয়েছে।[২৫১]

সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এক আদম আ.-এর সন্তান হিসেবে যে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ সেটাই হচ্ছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।[২৫২] আল্লাহপাক বলেন, 'সমস্ত মানুষ গোড়াতে একই জাতিতে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।'[২৫৩] অথচ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আকাঙ্খা হচ্ছে বিশ্ব জোড়া প্রেম, ভালবাসা, সম্প্রীতির নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করা। মহাকবি আল্লামা ইকবালের ভাষায় বলতে হয়–

'জগত জোড়া ভ্রাতৃত্ব মোর, বিশ্ব জোড়া ভাব;
দেশ-বিদেশে থাকবে নাকো সম্প্রীতির অভাব।'

কবির ভাষায় :

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসে নাই কেহ অবনি পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

---

২৪৭. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩
২৪৮. আল কুরআন, ২ : ২১৩
২৪৯. আল কুরআন, ২৩ : ৫২
২৫০. আল কুরআন, ৩৪ : ২৮
২৫১. উল্লেখ্য যে, 'ইয়া আইয়ুহান নাস!' বলে মূলত সমগ্র মানব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এ সম্বোধনে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সমগ্র বনি আদম একই জাতি এবং একই আদি পিতা-মাতার থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
২৫২. ড. ওয়াহবা বিন মোস্তফা আয-যুহাইলি, আত *তাফসিরুল মুনির*(বৈরুত : দারুল ফিকরিল মু'আসির, ১৪১৮ হি.), খ.৩, পৃ. ২২৩
২৫৩. আল কুরআন, ১০ : ১৯

অবশ্য বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষের পারস্পরিক পরিচিতি লাভ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। কেউবা শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ, কেউ লম্বা বা খর্বকায়, কারও ভাষা আরবি, কেউ বা বাংলা ভাষী নামে পরিচিত। মানুষ যে দেশের এবং যে প্রকৃতিরই হোক না কেন সকলেরই সৃষ্টিমূল এক হওয়ার কারণে প্রত্যেকেই একে অপরের ভাই। আর অন্তরে এ ধারণার বদ্ধমূলই হচ্ছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ বলে কিছু নেই। আল্লাহর দ্বীনে সব মানুষই সমান, এক আল্লাহর বান্দাহ ও এক আদম আ.-এর সন্তান।[২৫৪] মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, 'তোমাদের বংশ-পরিচয় কোন কাজে আসবে না, তোমরা সকলেই সমান, হযরত আদম আ.-এর সন্তান।'[২৫৫] মহানবী সা. ছিলেন শান্তি, শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার রূপকার ও আদর্শ মহামানব। তিনি মদিনায় হিজরত করে তথায় বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। মদিনায় হিজরতের পর সেখানকার সকলের সমন্বয়ে একটা মৈত্রি-চুক্তি সম্পাদন করার পরিকল্পণা করেন।[২৫৬] অবশেষে মুসলিম, ইয়াহুদি ও পৌত্তলিকসহ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে 'মদিনা সনদ' নামে মুক্তি মন্ত্র তৈরি করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা করেন।[২৫৭]

মূলত, এ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সুবাদে উজ্জীবিত হয়ে 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রদ্বয়ের দীর্ঘ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।[২৫৮] সকলে মিলেমিশে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে রাসুল সা.-এর অমীয় বাণী :

أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى، كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمإ، سقاه الله من الرحيق الْمختوم.

'যে মুসলিম কোন বস্ত্রহীন মুসলিমকে বস্ত্র পরাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমি বস্ত্র পরিধান করাবেন। আর যে কোন ক্ষুধার্ত মুসলিমকে আহার করাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে মুসলিম কোন তৃষ্ণার্ত মুসলিমকে পানি পান করাবে মহামহিম আল্লাহ তাকে জান্নাতের পবিত্র প্রতীকধারী মদ পান করাবেন।'[২৫৯]

এ মর্মে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অন্য আর একটা ঘোষণা, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিমগ্ন

---

২৫৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৮৭), পৃ. ৯৩; Cf. Ignas Golziher, *Muslim Studies*(London : George Allen & Unwin Ltd, 1967), vol. I, p. 99; অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *কোরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসূল (স.)*(চট্টগ্রাম : কামরুল প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ৭১

২৫৫. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নূরুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ৩০৪

২৫৬. মহানবী সা. মদিনায় হিজরত করে স্বহস্তে ও স্বউদ্যেগে সেখানকার সকল অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার, যুলুম-নিপীড়ন, দূর্নীতি প্রভৃতি কুসংস্কার ও অসামাজিক কার্যকলাপ ও রীতিনীতি দুর করে একটা ন্যায়নীতি ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র তথা ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়িম করেন। দ্র. মাহমুদ শাকের, *আত তারিখুল ইসলামি*(বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৭ম সং., ১৪১১ হি.), খ.১, পৃ. ২১০

২৫৭. মোঃ নূরুন্নবী, *ইসলামের ইতিহাস*(ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫), পৃ. ৫৩-৫৬; মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*(ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, আগষ্ট ১৯৯২), পৃ. ৬২; ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী ও মোঃ মফিজ উদ্দীন, *মদীনার সনদ : পর্যালোচনা*(ঢাকা : ইফাবা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, বর্ষ-৩৬, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৭), পৃ. ১৪-১৬

২৫৮. ইমাম তাবারি, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *তাফসীরে তাবারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৪), খ.৬, পৃ. ১৩৩-১৩৪

২৫৯. ইমাম আবূ দাউদ রহ., অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবূ দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ২০১৩), খ.২, হাদিস নং ১৬৮২, পৃ. ৪৪৫

থাকে।[২৬০] বস্তুত, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর মত এমন যুগশ্রেষ্ঠ মহানায়ক আর দ্বিতীয়টা বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, আপদ-বিপদে, সুখে-দুঃখে, সাধ্যমত সকলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আর এটাই বিশ্বের মানুষ পরস্পরের প্রতি উৎসর্গিত ও নিবেদিত প্রাণ। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'এরা নিজেদের মধ্যে অতীব বিনম্র-হৃদয় ও পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[২৬১] وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا 'আর তারা আল্লাহর প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দরিদ্র, ইয়াতিম ও বন্দীদের খাদ্য দান করে।'[২৬২]

মহানবী সা. বলেছেন, إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 'তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আকাশে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করবেন।'[২৬৩] রাসুল সা. আরও বলেছেন, الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله 'সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহপাকের পরিবার, সৃষ্টির মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়জন, যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের সৃষ্ট পরিবারের প্রতি বেশি সদয়।'[২৬৪] মহানবী সা. আরও বলেছেন, من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহপাক ও তার প্রতি রহম করেন না।'[২৬৫] তিনি আরও বলেছেন, خير الناس من ينفع الناس 'যিনি মানুষের উপকার করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মানুষ।'[২৬৬] এভাবে ইসলামি ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় থেকে সুদৃঢ় করা হয়েছে। যার ভিত্তি হচ্ছে– ইমান ও মতবাদের ঐক্য, আশা ও আকাঙ্খার ঐক্য, সংকল্প ও লক্ষ্যের ঐক্য এবং হৃদয় ও মনের ঐক্য। কারণ, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের মূলমন্ত্র হচ্ছে, لا إله إلا الله محمد رسول الله 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসুল।'

পরিশেষে বলা যায় যে, মাত্র আঠারোটি আয়াত বিশিষ্ট সুরা হুজুরাত রাসুল সা.-এর মাদানি জীবনের শেষাংশে নাযিল হয়েছে। এ সুরার মধ্যে সুনাগরিক গঠনের উপযোগী গুণাবলী সম্বলিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিধি-বিধান রয়েছে। কুরআনের আলোচ্য সুরা আল হুজুরাতের শিক্ষা বাস্তব জীবনে রাসুলে কারিম সা. স্বীয় জীবদ্দশায় বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন যে, এসব গুণাবলীর মাধ্যমে কত সুন্দর ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন সম্ভব। তাই বর্তমানে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিকগণ এসব গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে সুনাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হলে একটা উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও সুরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষাগুলোর আলোকে সুনাগরিক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা হবে সময় উপযোগী পদক্ষেপ ও তাতে জাতি সফল ও সার্থক হবে বলে আশা করা যায়।

---

২৬০. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদিস নং ৬৬০৮, পৃ. ২০৫-২০৬

২৬১. আল কুরআন, ৪৮ : ২৯

২৬২. আল কুরআন, ৭৬ : ৮

২৬৩. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ. অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, হাদিস নং ১৯৩০, পৃ. ৩৭১

২৬৪. আহমাদ বিন আলি বিন মুসান্না আত তামিমি, *মুসনাদে আবি ইয়ালা*(দামিশক : দারুছ ছাকাফাতিল আরাবিয়া, ১৯৯২), খ.৬, হাদিস নং ৩৩১৫, পৃ. ৬৫

২৬৫. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৫, হাদিস নং ৫৮২৩, পৃ. ৩০৯

২৬৬. আলাউদ্দিন আলি আল মুত্তাকি আল হিন্দি, *কানযুল 'উম্মাল*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, হাদিস নং ৪৩০৬৫, পৃ. ৭৭৭

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলার প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের বর্তমান পরিচিতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দেশ ও জনগোষ্ঠীর পরিচয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের নামকরণ

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলার প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক পরিচয়

বর্তমান বাংলাদেশের পরিচয় জানার আগে বাংলার প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত সম্পর্কে জানা জরুরি।[১] কেননা, অতীত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বর্তমান। আর বর্তমানকে নিয়েই ভবিষ্যতের আলপনা রচিত হয়। মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও কীর্তিকলাপ এবং তার অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্রের কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। মানুষের অতীত কার্যক্রমের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল নির্ধারণ করা আবশ্যক। এ আবশ্যকতা স্বীকার করেন ভূগোলবিদ এবং ইতিহাসবিদ।[২] যেহেতু মানুষের কর্মকাণ্ড এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে সংগঠিত হয়, তাই ভূগোলই ইতিহাসের ভিত্তি।[৩] এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভৌগোলিক পরিচয় দানের প্রয়াস। বাংলার প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক পরিচয় পুনর্গঠনের তথ্য অপ্রতুল। তখন 'বাংলা' বলতে কোন ভূখণ্ডকে বুঝানো হত তা স্পষ্ট নয়।[৪] আদিকাল থেকে ১৪০০ খ্রি. পর্যন্ত সে সময়ের প্রায় শেষদিকে 'বাংলা' বলতে যে বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বুঝানো হত তা নিয়েই এখানে আলোকপাত করা হল।

বাংলার প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক পরিচয়

প্রাথমিক পর্যায়ে একই ভূখণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের অবস্থিতি ছিল। মোটামুটিভাবে ১৯৪৭-এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূখণ্ডই আমাদের আলোচনার বিষয়; বর্তমানে এ ভূখণ্ড বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এবং ভূগোলবিদগণও এ উপমহাদেশের মধ্যে 'বাংলা'কে একটা ভৌগোলিক অঞ্চল বলে স্বীকার করেছেন।[৫] প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এ বাংলা। পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল তরাই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোটনাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ বিস্তৃত সমভূমির দক্ষিণ দিক সাগরাভিমুখে ঢালু এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার জলরাশি দ্বারা বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি সাগরে উৎসারিত হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নভূমি জঙ্গলাকীর্ণ। এর পিছনেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল সমভূমি, যার গঠনে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্রবাহের অবদান রয়েছে। এ বিস্তৃত সমতলভূমির মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চল (৩০০০ বর্গমাইল) নিকটবর্তী প্লাবন ভূমির তুলনায় গড়ে ৬ ফুট উঁচু আর

---

১. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*(ঢাকা : বর্ণায়ন, মার্চ ২০০২), পৃ. ১১

২. H.P.R. Finberg, *Approaches to History*(London : Routledge & Kegan Paul, 1962), pp. 127-156

৩. ibid, p. 155

৪. Dr. Abdul Momin Chowdhury, *Bangladesh Historical Studies and Itihas Samiti Patrika on Geography of Ancient Bengal : An Approach to its Study*(Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1977), vol. III, 1977, pp. 31-53

৫. A.T.A. Learmonth & B. H. Farmer, *India, Pakistan and Ceylon, The Regions*(London : B.I. Publications, 1972), pp. 571-599

এর মাঝামাঝি রয়েছে ময়নামতি পাহাড়। সিলেট অঞ্চলেও গড়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচু এবং এরই দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত প্লাইস্টোসিন যুগে সুগঠিত মধুপুর উচ্চভূমি। এ উচ্চভূমির উত্তর-পশ্চিম বিস্তৃতিই হচ্ছে 'বরেন্দ্র' বা 'বারিন্দ' এলাকা। পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পাহাড় সংলগ্ন উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত প্লাইস্টোসিন ভূভাগ রয়েছে।[৬] নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়– 'এ প্রাকৃতিক সীমাবিবৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুন্ড্র, বরেন্দ্রি, রাঢ়া, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ-বঙ্গাল ও হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগিরথি, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এ ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির কর্ম-কৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম ও নর্মভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য– ইহাই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য।[৭] এখানে 'বাংলা' নামটার উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিবৃত হল।

ইংরেজ শাসনকালের 'বেঙ্গল' (Bengal), যা ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত প্রযুক্ত ছিল, যা উপরে আলোচিত ভূখণ্ডকেই বুঝাতো। ইংরেজদের 'বেঙ্গল' অন্যান্য ইউরোপীয়দের (বিশেষ করে পর্তুগিজদের) 'বেঙ্গালা' থেকেই নেয়া হয়েছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরাপীয়দের লেখনীতে 'বেঙ্গালা' নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিজার ফ্রেডারিক 'বেঙ্গালা' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চাটিগামের ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত 'সোন্দিব' দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। দুজারিক প্রায় ২০০ লিগ উপকূল বিশিষ্ট 'বেঙ্গালা' দেশের উল্লেখ করেছেন। স্যামুয়েল পর্চাস-এর বর্ণনায়ও 'বেঙ্গালা' রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে।[৮] র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ 'বেঙ্গালা' দেশে 'চাটিগান', 'সতগাম' (সপ্তগ্রাম), 'হুগেলি' (হুগলি) এবং 'তান্ডা' (রাজমহলের নিকটবর্তী) শহরের উল্লেখ করেছেন।[৯] পূর্ববর্তী ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা 'বেঙ্গালা, বেঙ্গেলা, বাঙ্গালা' রাজ্য ও ঐ নামের একটা শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। মার্কোপোলা উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাঙ্গালা নামে প্রদেশের বৈশিষ্ট্যসূচক ভাষাভাষী প্রতিমা উপাসক জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন।[১০] ওভিংটনের বর্ণনায় আরাকানের উত্তর-পশ্চিমে 'বেঙ্গালা' রাজ্যের এবং ঐ রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রথম শহর চাটিগামের উল্লেখ রয়েছে।[১১]

ব্লাভের (Bleav) ১৬৫০ খ্রি.-এর এবং সসেনের (Saussen) ১৬৫২ খ্রি.-এর মানচিত্রে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী 'বেঙ্গালা' শহরের অবস্থিতি প্রমাণ করে।[১২] রেনেল এ নামের শহরের উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এর অবস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন না।[১৩] গ্যাস্টালদির মানচিত্রে চাটিগামের পশ্চিমে 'বেঙ্গালা'র অবস্থিতি দেখান হয়েছে।[১৪] পর্তুগীজ-ভার্থেমা, বার্বোসা বা জাও দ্যা ব্যারোসের বর্ণনায় 'বেঙ্গালা রাজ্য ও 'বেঙ্গালা'

---

৬. J.P. Morgan & W.G. McIntire, *Bulletin of the Geological Society of America : Quarternary Geology of the Bengal Basin, East Pakistan and India*(New York : The Society, 1959), vol. LXX, pp. 319-342

৭. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*(কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, সং.৮, ১৪২০), পৃ. ৮৬-৯২

৮. Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*(Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1913), vol.32, p. 437

৯. John Horton Ryley, *Ralph Fitch*(London : T.F. Unwin, 1899), pp. 100, 111, 113 & 118

১০. Sir Henry Yule, *The book of Ser Marco Polo*(London : John Murray, 1903), vol.II, pp. 114-115, 128

১১. John Ovington, *A Voyage To Suratt in the year 1689*(London : Oxford University Press, 1929), pp. 553-554

১২. Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*(Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1873), part I, IV, p. 233

১৩. James Rennell, *Memoir of a map of Hinduoostan*(London : University of California, South Branch, 1788), p. 57

১৪. Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*(Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1908), p. 291

শহরের উল্লেখ রয়েছে।[১৫] 'বেঙ্গালা' শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও 'বেঙ্গালা' রাজ্য যে এ 'বাংলাদেশ' অঞ্চলকে বুঝাতো সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই।[১৬] মোগল আমলে এ ভূভাগই 'সুবা বাঙ্গালা' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। আবুল ফজল এ প্রদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে হুগলি জেলার মান্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। কামরূপ ও আসাম সুবা বাঙ্গালার সীমান্তে অবস্থিত ছিল।[১৭]

আবুল ফজল 'বাঙ্গালাহ' নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, 'বাঙ্গালাহ'র আদিনাম ছিল 'বঙ্গ'। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 'আল' নির্মাণ করতেন; এ থেকেই 'বাঙ্গাল' এবং 'বাঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তি।[১৮] তবে নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আবুল ফজলের এ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার করে নেননি। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, এ অনুমান সত্য নহে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং আরও প্রাচীন কাল হতেই বঙ্গ ও বাঙ্গাল দু'টো পৃথক দেশ ছিল এবং অনেক প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এ দু'টো দেশের একত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গ দেশের নাম হতেই 'আল' যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হয়েছে, এটা স্বীকার করা যায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের 'বাংলা' এ নামকরণ করা হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন। বর্তমানকালে বাংলাদেশের অধিবাসীগণকে 'বাঙ্গাল' নামে অভিহিত করা হয়। তা সে প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মৃতিই বহন করে আসছে।[১৯] এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় আবুল ফজলের ব্যাখ্যাকে একেবারে অযৌক্তিক মনে করেননি।

নদীমাতৃক বারিবহুল দেশের বন্যা ও জোয়ারের স্রোত রোধের জন্য ছোটবড় বাঁধ ('আল') বাঁধা কৃষি ও বাস্তভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। তিনি বলেছেন, 'আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ-বঙ্গদেশ আল বা আলিবহুল, যে বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে 'আল' সে দেশেই বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ। এ আলগুলোই আবুল ফজলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার ব্যাখ্যা পড়লে এ কথাই মনে হয়।'[২০] মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এ অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয়েছে। 'বাঙ্গালাহ'ই তাদের ভাষায় হয়েছে 'বেঙ্গালা' বা 'বেঙ্গল'। আকবর-পূর্ব-যুগেও 'বেঙ্গালা'র উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কোপোলোর লেখনীতে। সুতরাং 'বেঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালা' নাম মোগলপূর্ব যুগেই খ্যাতিলাভ করেছিল অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত। মোগল যুগ থেকেই এর বহুল প্রচার এবং ইউরোপীয়দের মাধ্যমেই এ নাম রূপ নিয়েছে 'বেঙ্গালা', 'বেঙ্গলা' বা 'বেঙ্গল' এ।[২১] মূলত মোগলপূর্ব যুগে 'বাঙ্গালাহ' সমস্ত ভূখণ্ডের নাম সূচনা করত কি

---

১৫. John Winter Jones, *The travels of Ludovico di Varthema in Egypt, Syria, Arabia Deserta and Arabia Felix, in Persia, India, and Ethiopia*(London : The Hackluyt Society, 1863), p. 210

১৬. James Taylor, *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*(Calcutta : G.H. Huttmann Military Orphan Press, 1840), pp. 92-93

১৭. Colonel H.S. Jarrett revised by Sir Jadunath Sarkar, *Ain-i-Akbari of Abul Fazal-i-Allami*(Calcutta : Royal Asiatic Soceity of Bengal, 1949), vol. II, p. 116

১৮. Colonel H.S. Jarrett revised by Sir Jadunath Sarkar, *Ain-i-Akbari of Abul Fazal-i-Allami*, vol. II, ibid, p. 120

১৯. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(কলিকাতা : দিব্য প্রকাশ, ১৯৭৪), খ.১, পৃ. ২২

২০. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫

না এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের সময় 'বাঙ্গালা' নামে একক কোন দেশ ছিল না। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ মুসলিমদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস রচনার সময় 'বাঙ্গালা' নামের উল্লেখ করেননি; বরং বরেন্দ্র, রাঢ় এবং বঙ্গ নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন।

মিনহাজের বর্ণনায় বাংলা সম্বন্ধে তার ভৌগোলিক জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লখনৌতি ও বঙ্গকে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং যথাক্রমে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বুঝিয়েছেন। তিনি বঙ্গের সাথে সমতট (সকনত)-এর উল্লেখও করেছেন।[২২] মিনহাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারুনি সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সমগ্র দেশ নয়, এর অংশ বিশেষের উল্লেখ প্রসঙ্গে। 'ইকলিম লখনৌতি' বা 'দিয়ার লখনৌতি'র পাশাপাশি 'ইকলিম বাঙ্গালা বা 'দিয়ার বাঙ্গালা'র উল্লেখ করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ব বাংলাকেই নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' রূপে আখ্যা দিয়েছেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ সমস্ত 'বাংলাদেশে' একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি বাংলার তিনটা শাসন কেন্দ্রই– লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও-এর উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতা প্রায় দু'শো বছর ধরে অক্ষুন্ন ছিল। ইলিয়াস শাহ-ই মুসলিম সুলতানদের মধ্যে প্রকৃত অর্থেই প্রথম 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা'।[২৩]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, আফিফ 'বাঙ্গালা' বলতে সারা বাংলাদেশকে অর্থাৎ আবুল ফজলের 'বাঙ্গালা' বা ইউরোপীয়দের 'বেঙ্গালা' বা 'বেঙ্গল'কে বুঝিয়েছেন। ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই প্রথম 'বাঙ্গালা' তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ঐ সময়ে বঙ্গ বা বঙ্গাল দ্বারা বাংলার অংশবিশেষকে নির্দেশ করা হত। তাই 'বাঙ্গালা' নামের প্রচলন ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।[২৪] সুকুমার সেন 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙ্গালা' বা 'বঙ্গালহ'র উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। তিনি আরও বলেন, 'বাঙ্গালা' নামটা মুসলিম শাসনকালে সৃষ্ট এবং ফারসি 'বঙ্গালহ' থেকে পর্তুগীজ 'বেঙ্গালা' ও ইংরেজি 'বেঙ্গল' থেকে এসেছে বলে মত পোষণ করেন।[২৫] ইতিহাসের দৃষ্টিতে বর্তমানের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গকে নিয়েই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা। এ ভূখণ্ডের একটা আঞ্চলিক সত্তা ছিল তাই ভূগোলবিদগণ বাংলাকে একটা ভৌগোলিক অঞ্চল (Region) বলে স্বীকার করেছেন।

বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহ : বাংলার[২৬] প্রাচীন জনপদসমূহের ভৌগোলিক অবস্থিতি অনেকাংশে ভূপ্রকৃতি এবং বিশেষ করে নদীর স্রোতধারা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। বুঝার সুবিধার্থে প্রাচীর জনপদগুলোর আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সান্নিধ্যের ভিত্তিতে একত্রে আলোচনা করা হলো।

বঙ্গ : উপজাতীয় নাম হিসেবে 'বঙ্গ'-এর প্রাচীনতম উল্লেখ 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে যেখানে 'বঙ্গ' ও 'মগধ'দের কথা বলা হয়েছে। 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র-এ আর্য সভ্যতা বহির্ভূত এবং কলিঙ্গের প্রতিবেশী হিসেবে

---

২২. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*(ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩, ১৯৮-২২৮

২৪. Sir Jadunath Sarkar, *Commemoration Volume*(Hasiarpur : Punjab University Press, 1958), pp. 56-57

২৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা দেশের নামের পুরাতত্ত্ব*(কলিকাতা : ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), সংখ্যা-৯, পৃ. ১৭-২০

২৬. 'বাংলা' বলতে প্রাক-১৯৪৭-এর অবিভক্ত বাংলাকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে গঠিত ভূভাগ।' দ্র. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

'বঙ্গ'-এর উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭] পুরাণে প্রাচ্য দেশের তালিকায় অঙ্গ, মগধ, মুদ্‌গরক, পৌণ্ড্র (পুণ্ড্র), বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে।[২৮] রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ বলে বঙ্গদের উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের 'শ্বেতস্নিগ্ধ' সুতাবস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের 'দিগ্বিজয়' অংশে ভীমের 'পুণ্ড্র' থেকে বঙ্গদের আক্রমণের কথা রয়েছে এবং একই সঙ্গে তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও সুহ্মের উল্লেখ করা হয়েছে।[৩০] উপরের উল্লেখসমূহ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'বঙ্গ' পূর্বাঞ্চলীয় দেশ এবং পুণ্ড্র, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত বা অঙ্গ, মুদগরক-মগধ কিংবা প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতি জনপদের কাছাকাছি এর অবস্থিতি। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে বলা হয়েছে, রঘু সুহ্ম'দের পরাজিত করে 'বঙ্গ'দের উৎখাত করেন এবং 'গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু' অঞ্চলে তিনি জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। একই শ্লোকে 'বঙ্গ'দের নৌসাধনোদ্যত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।[৩১]

গঙ্গার দুই প্রধান স্রোত অর্থাৎ ভাগীরথী ও পদ্মার স্রোত-অন্তর্বর্তী এলাকা যে ত্রিভূজাকৃতি বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে তা-ই বঙ্গদের অঞ্চল, যেখানে রঘু নৌসাধনোদ্যত বঙ্গদের পরাস্ত করে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। এ অঞ্চলই সম্ভবত টলেমির 'গঙ্গারিডাই'।[৩২] কালিদাস পরবর্তী শ্লোকে বঙ্গের পশ্চিম সীমা ঐ সময়ে বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কশাই (কপিশা-কশাই) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩৩] কালিদাসের বিবরণে রঘু কর্তৃক প্রথমে 'সুহ্ম' জয়, সুহ্ম থেকে বঙ্গ জয় এবং পরে সুহ্ম থেকেই কপিশা অতিক্রম করে কলিঙ্গের দিকে গমনের কথা আছে।[৩৪] শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের 'ষটপঞ্চাশদ্দেশবিভাগ'-এ সাগর (রত্নাকরম) থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ 'বঙ্গ' বলে বর্ণিত হয়েছে।[৩৫] ব্রহ্মপুত্র নদীর যে প্রবাহ ময়মনসিংহের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হত, এ প্রবাহই বঙ্গের উত্তর ও পূর্বসীমা এবং দক্ষিণে সুন্দর বনাঞ্চলের পূর্বপ্রান্ত থেকে উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব। সেনযুগের লিপি-প্রমাণেও বঙ্গের এ অবস্থিতি নির্ধারণ করা সম্ভব।

বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া[৩৬] ও কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বিক্রমপুর ভাগের উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে বঙ্গের নাব্যভাগের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল এলাকা বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃহৎসংহিতা ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে 'উপবঙ্গ'-জনপদের উল্লেখ করেছে।[৩৭] সতের শতকের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থের উল্লেখ থেকে 'উপবঙ্গ' বলতে যশোর

---

২৭. G. Buhler, *Sacred Books of the East, Series*(London : Oxford University Press, 1882), p. XIV

২৮. Dineschandra Sircar, *Studies in the geography of ancient and medieval India*(Delhi : Motilal Banarsidass, 1960). pp. 36-38

২৯. বাল্মিকি, অনূ. জি.পি. বসু, *রামায়ণ*(কলিকাতা : এল. এন. প্রেস, ১৬১৭), পৃ. ৩৬-৩৭

৩০. কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস, অনূ. রাজশেখর বসু, *মহাভারত*(কলকাতা : নবযুগ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০৯), পৃ. ২-৩০

৩১. 'বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ।' দ্র. মহাকবি কালিদাশ, অনূ. চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, *রঘুবংশ*(কলিকাতা : রতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৬৭), খ.৪, পৃ. ৩৬

৩২. Dineschandra Sircar, *Studies in the geography of ancient and medieval India*, ibid, p. 132

৩৩. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৫

৩৪. মহাকবি কালিদাশ, অনূ. চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, *রঘুবংশ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৫৭-৫৮

৩৫. 'রত্নাকরম সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে, বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক'। দ্র. Dineschandra Sircar, *Studies in the geography of ancient and medieval India*, ibid, pp. 81, 90

৩৬. Nani Gopal Majumdar, *Inscriptions of Bengal*(Rajshahi : The Vorendra Research Society, 1929), vol.III, p. 132

৩৭. A.M. Shastri, *India as seen in the Brhatsamhita of Varahamihira*(Delhi : Shantilal Jain Atshri Jainendra Press, 1969), p. 104

ও তৎসংলগ্ন বনভূমিকে বুঝাত বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।[৩৮] বঙ্গ-জাতি অধ্যুষিত-অঞ্চল 'বঙ্গ' দেশ। তবে শব্দটা চীন-তিব্বত গোষ্ঠীর শব্দ এবং শব্দটার 'অং' অংশের মৌলিক অর্থ জলাভূমি বলে অনেক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। জলময় দেখে যারা পূর্বাপর বাস করে তারা 'বঙ্গ' এবং তাদের নিবাস-ভূমি 'বঙ্গ' দেশ-এরূপ মত প্রকাশ করেছেন সুকুমার সেন।[৩৯] এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলায় মুসলিম শাসন বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়ে 'বঙ্গ' বলে বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশকেই বুঝানো হত। মিনহাজের বর্ণনায় লক্ষ্মণ সেনের 'বঙ্গ' ও সকনতে (সমতটে) আশ্রয় নেয়ার কথা কিংবা গিয়াসউদ্দিন ইওজ কর্তৃক 'বঙ্গ' থেকে কর আদায় বা সাইফুদ্দিন আইবেক কর্তৃক 'বঙ্গ' আক্রমণ করে হস্তী হস্তগত করার যেসব উল্লেখ রয়েছে তা সকলই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে নির্দেশ করত।[৪০]

বঙ্গাল : বঙ্গের সঙ্গে আর একটা নাম সাধারণত বলা হয়ে থাকে– বঙ্গাল। ধ্বনিগত দিক থেকে উভয়ের মিল আছে এবং সম্ভবত বঙ্গেরই অংশবিশেষ বঙ্গাল ছিল। 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে প্রাকৃত 'আল' যোগ করে বঙ্গাল হয়েছে এবং বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত কোন বিশেষ এলাকার অর্থে বঙ্গাল।[৪১] কিংবা বঙ্গালয় (বঙ্গ+আলয় অর্থাৎ বঙ্গদের আবাসভূমি) থেকে 'বঙ্গাল'-এর উৎপত্তি বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।[৪২] আবার অনেকে 'পাল' অন্তক সমাসনিষ্পন্ন শব্দের তদ্ভবরূপ অর্থাৎ 'বঙ্গপাল' (বঙ্গদেশের রক্ষক বা বাসিন্দা অর্থে) থেকে 'বঙ্গাল' উদ্ভূত বলে মনে করেন।[৪৩] 'বঙ্গাল'-এর ব্যবহার মূলত দক্ষিণী লিপিতে।[৪৪] রাজেন্দ্র চোলের তিরুমুলাই লিপিতে উল্লিখিত চোল অভিযান দক্ষিণ রাঢ় থেকে বঙ্গাল দেশে এসেছিল এবং গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেছিল।[৪৫] দ্বাদশ শতাব্দীর দুই-একটা লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গালের পাশাপাশি উল্লিখিত দেখা যায়। এসব উল্লেখ থেকে পণ্ডিতগণ 'বঙ্গাল'কে বঙ্গের অংশ বা বঙ্গের সমুদ্র তটশায়ী দক্ষিণভাগ বা সমস্ত পূর্ববঙ্গ বলে মনে করেছেন, কিন্তু বঙ্গালের অবস্থিতি নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি।[৪৬] বাংলার বাইরে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, বঙ্গ ও বঙ্গাল খুব একটা পৃথক চিন্তায় ব্যবহৃত হয়নি। বঙ্গ বলে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগকে চিহ্নিত করা সম্ভব তা-ই 'বঙ্গাল' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্র : পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র পূর্বাঞ্চলীয় জনপদসমূহের মধ্যে সুপ্রাচীন নাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আর্যাবর্তের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পুণ্ড্রদের দস্যু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৭] মহাভারতের দিগ্বিজয়পর্বে মুঙ্গেরের পূর্বে পুণ্ড্রদের অবস্থান বলে ইঙ্গিত রয়েছে। পুরাণসমূহের পূর্বদেশে অবস্থিত দেশসমূহের মধ্যেই পুণ্ড্রদের উল্লেখ রয়েছে।[৪৮] বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতায়' ও পুণ্ড্রদের পূর্বদেশীয় বলেই

---

৩৮. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*(ঢাকা : লেখক সমবায়, ১৯৬৩), খ.১, পৃ. ৬৯

৩৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা দেশের নামের পুরাতত্ত্ব*(কলিকাতা : ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), সংখ্যা-৯, পৃ. ১৮

৪০. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২, ৯৫, ১১৫

৪১. Dineschandra Sircar, *Studies in the geography of ancient and medieval India*, ibid, p. 132

৪২. Grieson, *Linguistic Survey of India*(Culcutta : Office of the Superintendent of Government Printing, 1898), vol.v, part x, p. 11

৪৩. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা দেশের নামের পুরাতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, সংখ্যা-৯, পৃ. ১৯

৪৪. Ramesh Chandra Majumdar, *History of Ancient Bengal*(Calcutta : G. Bharadwaj, 1971), pp. 16, 33

৪৫. *EI,* IX, 229 ff

৪৬. Dineschandra Sircar, *Studies in the geography of ancient and medieval India*, ibid, pp. 129-146

৪৭. Book VII, p. 13,18

৪৮. C.A. Lewis The Geographical Text of the Puranas, A Further Critical study,' *Puranam* vol, IV No. I, pp. 137-145

উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৯] পুণ্ড্রদের আবাসস্থলই পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাস্থান ব্রহ্মীলিপিতে 'পুডনগল'(পুণ্ড্রনগর) ও বগুড়ার মহাস্থান যে অভিন্ন এবং পুণ্ড্রনগর যে পুণ্ড্রদের আবাসস্থল ও পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।[৫০] তবে পুণ্ড্রবর্ধন-এর অবস্থিতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে সপ্তম শতাব্দীর চেনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায়। তিনি 'ক-চু-যু-খি-লো' থেকে পূর্বদিকে ভ্রমণ করেন। গঙ্গা অতিক্রম করে ৬০০ লি যাওয়ার পর 'পুন-ন-ফ-তন-ন' দেশে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে ৯০০ লি পথ পূর্বদিকে গমন করে 'ক-মো-লু-পো' দেশে পৌঁছেন। 'পুন-ন-ফ-তন-ন' দেশের রাজধানী শহরের ২০ লি পশ্চিমে 'পো-শিপ-পো' বিহারের উল্লেখ রয়েছে।[৫১] বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বাসুবিহারের ধ্বংসাবশেষ উদঘাটন করা হয়েছে।[৫২] কানিংহামের মতে কজঙ্গল ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগই পুণ্ড্রবর্ধন এবং এ এলাকার কেন্দ্র পুণ্ড্রনগর বা মহাস্থান যার উপকণ্ঠে ছিল বাসু-বিহার। কজঙ্গল থেকে গঙ্গা পার হয়ে হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করেছিলেন; তাই বলা যায়, পশ্চিমে গঙ্গা থেকে পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত ভূভাগই পুণ্ড্রবর্ধন। .পুরাণের একটা ভাষ্যে পুণ্ড্রদেশের অন্তর্গত সাতটা দেশের– গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃতি, সুক্ষ, ঝারিখণ্ড, বরাহভূমি ও বর্ধমান– নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৩] পুণ্ড্রের সাথে সহাবস্থান করছে আর একটা প্রাচীন ভৌগোলিক সত্তা: বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' অভিধানে বরেন্দ্রী ও পুণ্ড্র অভিন্ন বলা হয়েছে। বেশ কয়েকটা লিপি-প্রমাণে একথা বলা যায় যে, বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশবিশেষ।[৫৪] সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিতম' মহাকাব্যে পালদের 'জনকভু' বরেন্দ্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এর দক্ষিণে ছিল গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া এবং 'পুণ্ড্রবর্ধনপুর' ছিল বরেন্দ্রের প্রধান নগর।[৫৫] মিনহাজের 'তাবাকাত-ই-নাসিরি' গ্রন্থে 'বারিন্দ বলে (বরেন্দ্র) লখনৌতি রাজ্যের গঙ্গা পূর্ববর্তী এলাকাকে নির্দেশ করা হয়েছে।[৫৬]

সুক্ষ ও রাঢ় : খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বঙ্গ ও পুণ্ড্রের সাথে 'সুক্ষ'-এর উল্লেখ আছে।[৫৭] মহাকাব্যে ও পুরাণসমূহে প্রাচ্যদেশে 'সুক্ষ'-এর নাম পাওয়া যায়।[৫৮] ভীম তার পূর্বদেশ

---

৪৯. A.M. Shastri, *India as seen in the Brhatsamhita of Varahamihira*, ibid, pp. 94-95

৫০. *Epigraphia Indica* (*EI*), XXI, p. 88

৫১. T. Watters, *On Yuam Chwang's Travel in India*, London,1905, pp. 184-185; S.Beal (ed.) *Buddhist Records of the Western World si-yu-ki*, London, 1879-80, vol. IV, pp. 403-404

৫২. M. Harunur Rashid, *Bangladesh : A Profile in the light of Recent Archaeological Discoveries*(Dacca : Bangladesh Historical Studies, 1978), vol. III, pp. 21-22

৫৩. Dineschandra Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, ibid, p. 105

৫৪. Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*(California : Sanskrit Pustak Bhandar, 1977), pp. 41-44

৫৫. সন্ধ্যাকর নন্দী বাংলার পাল শাসনামলের একজন প্রাচীন কবি। আনুমানিক ১০৮৪ সালে তার জন্ম। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নগরী পুন্ড্রবর্ধনের বৃহদ্বটু গ্রামে এক কায়স্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামহের নাম পিনাক নন্দী এবং পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী। তার পিতা পাল রাজা রামপালের রাজসভার যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক মন্ত্রী (সান্ধিবিগ্রহিক) ছিলেন। তিনি রামচরিতম (রামচরিত মানস) নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তালপাতায় লেখা রামচরিতম পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘরে পুঁথিটি সংরক্ষিত আছে। চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ মহাকাব্যে যুগপৎ হিন্দু ধর্মের অবতার রামচন্দ্র এবং গৌড়ের রাজা রামপালের প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। পুঁথির শেষাংশে কবি তার আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্র. https://bn.wikipedia.org/সন্ধ্যাকর_নন্দী, visited on 07.04.2018

৫৬. Minhaj Siraj, eng. tr. by H.G. Raverty, *Tabaqat-i-Nasiri*(Calcutta : Asiatic Soceity of Bengal, 1881), vol. I, pp. 584-585

৫৭. P.S. Subrahmanya Sastri, *Mahabhasya*(North Madavilagam : The Trichinopoly United Printers, 1962), vol.II, p. 52

বিজয়াভিযানে 'বঙ্গ' দেশ পরাজিত করে একে একে তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম রাজকে পরাজিত করেন। এ উল্লেখ থেকে সুহ্মের অবস্থিতি সম্পর্কে এ ধারণা করা সম্ভব যে, সুহ্ম সমুদ্রোপকূল ও তাম্রলিপ্তির নিকটবর্তী ছিল। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সমুদ্রোপকূলে 'তালিবনশ্যামোপকণ্ঠে' সুহ্মদের পরাজয়ের কথা রয়েছে এবং মনে হয় রঘু গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীর ধরে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে সমুদ্রের উপকূলে সুহ্ম দেশে পদার্পণ করেছিলে।[৫৯] তাম্রলিপ্তি সুহ্মের অর্ন্তভূক্ত ছিল বলে মনে হয়। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে' 'দামলিপ্ত' (তাম্রলিপ্ত) সুহ্মদেশের সমৃদ্ধশালী বাণিজ কেন্দ্র বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৬০] বৃহৎ সংহিতায় সুহ্মদেশের অবস্থিতি বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী ছিল বলে উক্ত হয়েছে।[৬১] তের শতকের ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে সুহ্মদেশের বিবরণ পাওয়া যায়।

অনুমান করা যায় যে, হুগলি জেলার ত্রিবেণী এলাকাকেই ধোয়ী সুহ্ম বলে উল্লেখ করেছেন।[৬২] মূলত 'সুহ্মদেশ' বলতে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলকে বুঝাতো। সুহ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূভাগ ছিল রাঢ় যা জৈন সূত্রে 'লাঢ়' বলেও উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তার টীকায় সুহ্ম ও রাঢ় অভিন্ন বলে মনে করেন।[৬৩] 'বজ্জভূমি'-কে রাঢ়ের উত্তরাংশ বলে অনুমান করা হয়েছে।[৬৪] বাংলার সেন রাজাদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্য থেকে এসে প্রথম 'রাঢ়' অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৬৫] 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে রাঢ় দেশকে 'দামোদরোত্তর ভাগে' এবং গৌড়ের পশ্চিমে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৬] তাবাকাত-ই নাসিরি গ্রন্থে 'রাল' (রাঢ়) গঙ্গা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত লখনৌতি রাজ্যের বাম দিকের অংশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬৭] জাও দ্যা বারোসের নকসায় এ ভূভাগকেই রাঢ় বলে দেখানো হয়েছে।[৬৮] দশম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন লিপি বা সাহিত্যিক সূত্রে রাঢ়ের দু'টো অংশের উল্লেখ পাওয়া যায়, উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। দাক্ষিণাত্যের সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের তিরুমুলাই লিপিতে রাঢ়ের দু'টো অংশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। উড়িষ্যা ও বাংলার মধ্যবর্তী ভূভাগ মেদিনিপুর-বালাশোর অঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ রাঢ় এবং উত্তর রাঢ় মুর্শিদাবাদ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল 'রাঢ়' দেশ। 'সুহ্মোত্তর' বা ব্রহ্মোত্তর নামক জনপদ উত্তর রাঢ়ের অংশবিশেষ কে নির্দেশ করত।[৬৯]

---

৫৮. Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, ibid, pp. 45-46

৫৯. মহাকবি কালিদাশ, অনূ. চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, *রঘুবংশ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৫৭-৫৮

৬০. M.R. Kale, *The Dasakumaracharita of Dandin*(Bombay : Gopal Narayan & Co., 1926), p. 149

৬১. S. Drivedi (ed) *Brhatoaihita*(Banaras : 1895-1997), vol. x, p. 37, vol. xiv, p. 5, vol. xvi, p. 1

৬২. Amitabha Bhattacharyya, *Historical geography of ancient and early mediaeval Bengal*, ibid, p. 47

৬৩. কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, অনূ. রাজশেখর বসু, *মহাভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৬৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৬৫. Nani Gopal Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, vol.III, pp. 68-80

৬৬. শ্রী কাশীদাস মিত্র, *শঙ্কর-দিগ্বিজয়*(আলিগড় : প্রয়াগ-দূত যন্ত্র, ১৭৯৩), পৃ. ২২৭

৬৭. Minhaj Siraj, eng. tr. by H.G. Raverty, *Tabaqat-i-Nasiri*(Calcutta : Asiatic Soceity of Bengal, 1881), vol. I, pp. 584-585

৬৮. Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*, ibid, vol.V, p. 287

৬৯. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৫০

গৌড় : 'গৌড় নামটা সুপ্রাচীন ও সুপরিচিত হলেও এর অবস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাওয়া কষ্ঠসাধ্য। বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের যুগে যুগে পরিমণ্ডল সম্প্রসারণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'গৌড়'। এর খ্যাতি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সমস্ত বাংলাকেই গৌড় বলে আখ্যা দেয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে; পূর্ব ভারতীয় দেশসমূহের সামগ্রিক নাম হিসেবে এমন কি উত্তর ভারতের আর্যাবর্তের নাম হিসেবেও গৌড়ের ব্যবহার দেখা যায়।[৭০] বাংলা-বিহার অঞ্চলের অনেক নরপতিই 'গৌড়েশ্বর' নামে খ্যাত ছিলেন। ব্যাপক অর্থে 'গৌড়' বলতে বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চলকে বুঝাতো। সেনবংশীয় বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন 'গৌড়াধিপতি' উপাধি ব্যবহার করতেন।[৭১]

সংকীর্ণ অর্থে আদিকালে গৌড় বলতে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদা জেলার দক্ষিণাংশকে বুঝাতো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গ ও পুণ্ড্রের সঙ্গে গৌড়ের উল্লেখ আছে।[৭২] বরাহমিহির পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান থেকে পৃথক করে 'গৌড়ক'-এর উল্লেখ করেছেন।[৭৩] হিউয়েন সাঙ তান-মো লিতি (তাম্রলিপিতে) শশাঙ্ককে কর্ণসূবর্ণ দেশের সম্রাট বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৪] হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে গৌড়াধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৫] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ণসূবর্ণ দেশ ও গৌড়দেশ অভিন্ন। ভাগীরথীর ডান তীরে রাঙ্গামাটি ও হিউয়েন সাঙ-এর রক্তমৃত্তিকা বিহার অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং নিকটবর্তী গ্রাম'কানসোনা' এখনও কর্ণসূবর্ণেও স্মৃতি বহন করছে। মনে করা হয় বাংলার পশ্চিমাংশকে তখন 'গৌড়' এবং পূবাংশকে 'বঙ্গ; বলে আখ্যা দেয়া হত। তাই বলা যায়, গৌড় জনপদ এর অবস্থিতি ছিল পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষ। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই এর আদি পরিচিতি।[৭৬] তবে গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকল নিয়ে 'পঞ্চ-গৌড়'[৭৭] গৌড়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তারের চরম প্রকাশ।

সমতট ও পট্টিকেরা : দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার আর একটা জনপদ সমতট। চতুর্থ শতকের সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ইলাহাবাদ প্রশস্তিতে তার রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত করদ রাজ্যসমূহের মধ্যে নেপাল, ডবাক, কামরুপ, কর্তৃপুর ও সমতটের উল্লেখ রয়েছে।[৭৮] পূর্ব সীমান্তবর্তী সমতট বঙ্গের পূর্বে অবস্থিত বলে নির্দেশ করা হয়। বৃহৎসংহিতায় পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বর্ধমান এবং বঙ্গের সঙ্গে 'সমতট' জনপদেরও উল্লেখ আছে।[৭৯] সপ্তম শতাব্দীতে 'সমতটে' এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ; কামরুপ থেকে দক্ষিণ দিকে ১২০০/

---

৭০. Dineschandra Sircar, *Studies in the geography of ancient and medieval India*, ibid, pp. 125-130

৭১. Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, ibid, pp. 52-53

৭২. Kautilya, ed. by J. Jolly & Dr. Richard Schmidt, *Arthaśāstra*(Punjab : Moti Lal Banarsi Das, 1923), vol.I, p.51

৭৩. বরাহমিহির, অনূ. বিক্রমসভ্য, *বৃহৎসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৮

৭৪. Thomas Watters, *On Yuang Chwang's Travel in India*(London : Royal Asiatic Society, 1904), vol. II, pp. 191-193

৭৫. E.B. Cowell & F.W. Thomas, *The Harsa-carita of Bana*(London : Royal Asiatic Society, 1897), p. 178

৭৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৭৭. Ramesh Chandra Majumdar, *History of Bengal*(Dacca : 1943), vol. I, p. 14

৭৮. Jhon Faithfull Fleet, *Corpus Insciptioum Indicarum*(Calcutta : Office of the Superintendent of Government Printing, 1888), vol. I, p. 14

৭৯. বরাহমিহির, অনূ. বিক্রমসভ্য, *বৃহৎসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৮

১৩০০ লি. দূরে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত নিচু ও আদ্র সমতটের কেন্দ্র মহরের পরিধি ছিল ২০ লি.।[৮০] তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার যে বর্ণনা রেখে গেছেন[৮১] তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেই এসেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে এ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এটা আবিষ্কার হয়েছে।[৮২] ইৎসিৎ প্রণীত ছাপ্পান্ন জন চৈনিক বৌদ্ধ শ্রমণের ভারত ভ্রমনের বিবরণে সমতট অঞ্চলে রাজভট নামক রাজার কথা উল্লেখ করেছেন।[৮৩]

সমতটের সাথে কুমিল্লার সম্বন্ধের আরও প্রমাণ পাওয়া যায় মহীপালের বাঘাউরা ও নারায়ণপুর– উভয়ই কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্তী– মূর্তিলিপিতে।[৮৪] ত্রিপুরা-নোয়াখালি অঞ্চলকে প্রাচীন সমতট ও বলা হয়। মিনহাজের বর্ণনায় বখতিয়ারের অভিযানের পূর্বে লক্ষ্মণ সেনের আমর্তবর্গ বঙ্গ সকনাত-সনকাত-সঙ্কনাত এলাকায় পালিয়ে যাচ্ছিল। এ সকনাত-সনকাতকে 'সমতট' বলেই অনেকে সনাক্ত করেছেন।[৮৫] সমতটের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর একটা প্রাচীন ভৌগোলিক নাম পট্টিকেরা। বহু আগে পুর্ব-বাংলায় 'পট্টিকের' নাম অঙ্কিত কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল।[৮৬] ময়নামতির চারপত্রমুরায় প্রাপ্ত লড়হচন্দ্রের তাম্রলিপিতে সমতট মণ্ডলে পট্টিকেরকে ভূমিদান এবং পট্টিকের শ্রীলড়হ মাধব ভট্টারকের মূর্তির উল্লেখ আছে।[৮৭] ১২১৯-১৯২০ খ্রিস্টাব্দের হরিকাল দেবের তাম্রলিপিতে পট্টিকের শহরে বৌদ্ধবিহারের জন্য ভূমিদানের কথা রয়েছে।[৮৮] ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে 'পট্টিকেরে চুণ্ডা বরভবনে চুণ্ডা'র এবং বর্মী উপাখ্যানেও পট্টিকের রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮৯] কুমিল্লা জেলায় একটা পরগণার নাম 'পট্টিকারা' বা 'পাইটকারা' মোগল রাজস্ব তালিকায় এ নাম পাওয়া যায়।[৯০] প্রাচীন পট্টিকের পট্টিকেরদেরই এ পরগণা। লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের উত্তর প্রান্তের পূর্বদিকে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে।[৯১]

হরিকেল : হরিকেল জনপদের প্রথম লিপির উল্লেখ পাওয়া যায় নবম শতাব্দীতে রচিত কান্তিদেবের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে।[৯২] তাম্রলিপিটা ভগ্ন এবং ক্ষয়ে যাওয়ার দরুন সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

---

৮০. Thomas Watters, *On Yuang Chwang's Travel in India*, ibid, vol. II, p. 187
৮১. Samuel Beal, *Buddhist Records of the Western World*(Lobdon : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1906), vol. II, pp. 194-202
৮২. Barrie M. Morrison, *Lalmai, a Cultural Center of Early Bangal*(Lalmai : Seattle, 1974), p.
৮৩. Ramesh Chandra Majumdar, *History of Bengal*(Dacca : 1943), vol. I, pp. 86-87
৮৪. Ramesh Chandra Majumdar, *The History and Culture of the Indian People*(Mumbai : Bharatiya Vidya Bhavan, 1205), vol. IX, pp. 121-125
৮৫. Dineschandra Sircar, *Studies in the geography of ancient and medieval India*, ibid, pp. 152-158
৮৬. Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal*(Dacca : The Asiatic Society of Pakistan, 1967), p.163
৮৭. A.H. Dani, *'Mainamati Plates of the Chandras,' Pakistan Archaeology*(Karachi : The Department of Archaeology, Ministry of Education, Government of Pakistan, 1966), vol. III, pp. 401-448
৮৮. *Indian Historical Quarterly,* vol. IX, p. 187
৮৯. Ramesh Chandra Majumdar, *History of Ancient Bengal*, ibid, pp. 178-279
৯০. আবুল কালাম মোঃ যাকারিয়া, *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*(ঢাকা : কুমিল্লা জেলা পরিষদ, ১৯৮৪), পৃ. ৩৬৭
৯১. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৪), খ.২, পৃ. ৩৪৯
৯২. Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal*, ibid, pp. 150-152

পরবর্তীকালে চন্দ্রবংশীয় লিপিতেও হরিকেল রাজ্যের উল্লেখ আছে।[৯৩] তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্রদ্বীপ ও সমতট দখল করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন।[৯৪] এ লিপির প্রমাণ থেকে হরিকেল রাজ্যের অবস্থিতি লালমাই, সমতট ও চন্দ্রদ্বীপের নিকটবর্তী বলে ধরা যেতে পারে। ইৎসিং এর বর্ণনায় উ-হিং (ইউ-হে) সিংহল থেকে সমুদ্র পথে হরিকেল এসেছিলেন এবং হরিকেল ছিল পূর্ব-ভারতের (জম্বু-দ্বীপের) পূর্বপ্রান্তে।[৯৫] হরিকেল রাজ্য সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ছিল যা কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বে।

আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত 'মঞ্জুশীমূলকল্প' গ্রন্থেও বঙ্গ, সমতট এবং হরিকেল তিনটা স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৯৬] নবম শতাব্দীর শেষভাগে রাজশেখর কর্পূর মঞ্জরি[৯৭] কাব্যে পূর্বদেশীয় চম্পা, রাঢ় ও কামরুপের সাথে হরিকেলির (হরিকেল) উল্লেখও একই ইঙ্গিত বহন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য' ও 'রুপচিন্তামণিকোষ' গ্রন্থদ্বয়ের পাণ্ডুলিপিতে হরিকোল (হরিকেল) ও শ্রীহট্ট অভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ডাকার্ণব' গ্রন্থে বর্ণিত চৌষট্টি তান্ত্রিক পীঠের এক পীঠ হরেকেল এবং হরিকেল বলে সম্ভবত শ্রীহট্টকেই বুঝানো হয়েছে।[৯৮] সুতরাং একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রাম অঞ্চলেই 'হরিকেল' জনপদের আদি অবস্থিতি।

তাম্রলিপ্ত : প্রাচীন যুগের একটা বিখ্যাত বন্দর-নগরী তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে এর উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়েন তাম্রলিপ্ত থেকেই জাহাজ ধরেছিলেন শ্রীলংকার পথে।[৯৯] সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ সমতট থেকে তাম্রলিপ্তি এসেছিলেন। বরাহ্‌মিহিরের বৃহৎসংহিতা ও দণ্ডীর দশকুমার চরিতে[১০০] সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিম বাংলার মেদিনিপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীর তীরের তমলুককে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বলে সনাক্ত করা হয়েছে। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। ভাগীরথী থেকে যমুনা সরস্বতী প্রবাহদ্বয় বেরিয়ে যাওয়ার স্থান থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সপ্তগ্রাম শহর। সপ্তগ্রামই মুসলিমদের সাতগাঁও।[১০১]

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী উত্তর বঙ্গের ভূভাগই মূলত পুণ্ড্র-বরেন্দ্র; ভাগীরথীই বঙ্গ ও রাঢ়কে ভাগ করেছে; মেঘনা প্রবাহের পূর্ব তীরেই সমতট-হরিকেল সত্ত্বার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার প্রশাসনিক বিভাগসমূহের মধ্যে সর্বপ্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন। বর্তমানে বগুড়ার মহাস্থান গড় মৌর্যযুগে (পুডনগল) প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে

---

৯৩. 'আধারো হরিকেল-রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাম্ শ্রিয়াম্ এর অর্থ, বংশের প্রথম শাসক ত্রৈলোক্যচন্দ্র কার্যত এবং আইনত উভয় প্রকারেই হরিকেলের রাজা ছিলেন।' দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৪০৪

৯৪. Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal*, ibid, pp. 157-159

৯৫. Jhon Takakusu, Tr. I-ching, *A record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archipelago*(Oxford : The Clarendon Press, 1896), pp. XXXIII, XLVI, LIII, LV

৯৬. T. Ganapati Sastri, *Sanskrit Series No. LXX*(Madras : Government Press, 1923), pp. 132-133

৯৭. Sten Konow, *Harvard Oriental Series*(Delhi : Motilal Banarsidass, 1963), vol.IV, pp. 226-227

৯৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০

৯৯. J.A. Legge, *Record of the Buddist Kingdoms Being an Account of the Chinese Monk Fa- hien's Travels*(London : Oxford University Press, 1886), p. 100

১০০. বরাহমিহির, অনূ. বিক্রমসভ্য, *বৃহৎসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পর্ব, পৃ. ১৪

১০১. Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*(Dacca : The Asiatic Society of Pakistan, 1959), pp. 33-34

মহাস্থান শিলা ব্রাহ্মীলিপি ইঙ্গিত করে।[১০২] এ বিভাগের বিস্তৃতি ছিল উত্তর বাংলার রাজশাহি, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ব্যাপী। রাজমহল, গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর বাংলা-ই পুণ্ড্রবর্ধন-ভূক্তির অন্তর্ভূক্তি ছিল।[১০৩] এ এলাকা গুপ্তপাল লিপিতে পুণ্ড্র এবং চন্দ্র বর্ম-সেন লিপিতে পৌণ্ড্র মূলত একই রাজ্য। বাঁকুড়া জেলার দামোদরের দক্ষিণ তীরবর্তী বর্তমান 'পোখনা' গ্রামের স্মৃতির মধ্যে 'পুস্করণ' আজও বেঁচে আছে।[১০৪] সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন পশ্চিম বাংলার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগরিসমূহের মধ্যে বর্ধমান, পুস্করণ ও কর্ণসূবর্ণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

দিনাজপুর শহরের প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে পুনর্ভরা নদীর বাম তীরে অবস্থিত 'বানগর'-কে প্রাচীন কোটিবর্ষ বলে সনাক্ত করা হয়েছে।[১০৫] চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকেই সোনারগাঁও (সূবর্ণগ্রাম) বাংলার মুসলিম সুলতানদের টাকশাল হিসেবে মুদ্রায় উল্লিখিত রয়েছে।[১০৬] চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৩৪৫-১৩৪৬) ইবন বতুতা বাংলায় এসেছিলেন।[১০৭] সমতট অঞ্চলে (মেঘনা-পূর্ববর্তী এলাকা) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল দেবপর্বতনামে সংরক্ষিত এলাকা।[১০৮] দেবপর্বতের উপকণ্ঠে গড়ে উঠা বৌদ্ধবিহারসমূহের ধ্বংসাবশেষই বর্তমানে আবিস্কৃত শালবন বিহার ও আনন্দ বিহার।[১০৯] কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'বড়কামতা' গ্রামকে 'কর্মান্ত' বলে সনাক্ত করা হয়েছে।[১১০] উপরোক্ত জনপদগুলো ছাড়াও আরও একটা ক্ষুদ্র জনপদের নাম প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। এটা হলো চন্দ্রদ্বীপ। বর্তমান বরিশাল জেলাই ছিল চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র। এ প্রাচীন জনপদটা বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

মূলত রাজনৈতিক সত্তার সঙ্কোচন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনপদগুলোর সীমাও সঙ্কুচিত বা বিস্তারিত হয়েছে। আর তাই সব জনপদের সীমা সব সময় এক থাকেনি; থাকা সম্ভবও নয়। আবার প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্র সীমা এক হয় না। প্রাচীন যে আঞ্চলিক সত্তাগুলো আমরা লক্ষ্য করি তা মূলত প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত ভূখন্ডকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এ প্রাকৃতিক ভাগাভাগির প্রধান হাতিয়ার বাংলার নদীপ্রবাহ। মুসলিম শাসন প্রবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় স্থাপিত মুসলিম সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা সহজে দখল করে নেয় এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব বাংলায় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগে মুসলিমগণের আগমনের পূর্বে তিনটা জনপদই বাংলার সমার্থক হয়ে উঠে– পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ। এর মধ্যে অন্যান্য সত্তা যেন একে একে বিলিন হয়ে পড়েছিল। আবার এর মধ্যেও পুণ্ড্র যেন

---

১০২. H. C. Raychandhuri, *Political History of Ancient India*(Calcutta : Calcutta University Press, 1923), p. 275

১০৩. Abdul Momin Chowdhury, *Geography of Ancient Bengal* : *The Pundra Vardhana Bhukti*(Dhaka : Bangladesh Asiatic Soceity, 1997), vol. XXII, p. 177

১০৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

১০৫. Binoychandra Sen, *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal*(Calcutta : Calcutta University Press, 1942), pp. 106-107

১০৬. Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*, ibid, p.158

১০৭. H.A.R. Gibb, *The Travels of Ibn Battuta*(London : Cambridge University Press, 1962), p. 168

১০৮. Abdul Momin Chowdhury, *Soceity History Cultire : Devaparvata*(Dhaka : Asiatic Soceity of Bangladesh, 1997), vol. I, pp. 76-90

১০৯. B.M. Morrison, *Lalmai, A Cultural Center of Early Bengal*(Lalmai : Seattle, 1974), p.

১১০. Binoychandra Sen, *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal*, ibid, p. 278

গৌড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকেই বাংলার বাইরে বাংলা গৌড় বা বঙ্গ বলেই অভিহিত হয়েছে। মুসলিম শাসনকালের প্রাথমিক পর্যায়ে লখনৌতি এবং পরে সাতগাঁও ও সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে তিনটা রাজনৈতিক সত্তা গড়ে উঠে। ইলিয়াস শাহি শাসনে এ তিনটা সত্তা একিভূত হয় এবং 'বাংলা' নামের উৎপত্তি হয়। 'বঙ্গ' থেকেই বাংলার উদ্ভব। এ নামের বিকাশ ঘটেছিল মোগল যুগে 'সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ'র মাধ্যমে আর ইংরেজ শাসনকালে এ নাম 'বেঙ্গল' রূপ নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।[১১১]

১১১. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*(ঢাকা : বর্ণায়ন, মার্চ ২০০২), পৃ. ৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

যে কোন জাতির ইতিহাস তার অমূল্য সম্পদ। জাতীয় ইতিহাস পাঠ নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বাঙালি একটা স্বাধীন জাতি। বাঙালির রয়েছে সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। নৃতাত্ত্বিক গঠন, জীবনধারা, সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙালির যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই বাঙালির ইতিহাস। ইতিহাস কেবল কিছু ঘটনার সমষ্টি নয়। ইতিহাস হল সামাজিক মানুষ, তার সমাজ সভ্যতা ও জীবনধারার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ। যুগ-যুগান্তর থেকে মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়ে কিভাবে আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছে তার বিবরণও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মূলত বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর কার্যকলাপ তাদের পারস্পরিক সংঘাত ও সহযোগিতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিবরণই হল ইতিহাস। সে অর্থে বাঙালি জাতি একটা ব্যাপক ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী। তবে বাঙালি জাতির ইতিহাসের তুলনায় 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস'-এর পরিধি কিছুটা সীমিত। কারণ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস হল বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ মানুষের ইতিহাস। নিচে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

ইতিহাসের ভিত্তি হতে পারে কোন জাতি, কোন সময়কাল, কোন ভূখণ্ড বা কোন অঞ্চল বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস হল ১৯৪৭ সাল পরবর্তী তৎকালীন পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাস। সুদীর্ঘ ২৩ বছর এ অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানিদের শাসন, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। মূলত পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক টাইপের শাসনই বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তুলে। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের বলে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ তখন 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল প্রায় ১২০০ মাইল। ব্যাপক দূরত্বের দু'টো ভূখণ্ডের জনগণের মধ্যে ধর্মীয় মিল ছাড়া আর কোন মিল ছিল না। ১৯৪৯ সালের শেষ নাগাদ পাকিস্তানে প্রায় বিশটা বিরোধী দল সক্রিয় ছিল।[১১২] যদিও তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ– প্রায় ৫৬ ভাগ– ছিল বাঙালি।[১১৩] মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও এর নেতৃত্ব ছিল মূলত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বুর্জোয়া ও পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীর হাতে। তন্মধ্যে মুসলিম লীগ দলটা মধ্য যুগীয় ভাব ধারায় সামান্তদের দ্বারা পরিচালিত একটা দল।[১১৪] আইয়ুব, ভুট্টো, ইয়াহিয়াদের নেতৃত্বের অহমিকাবোধ সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানিদের তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে বার বার বাঁধা দিয়ে এসেছে। রাজনীতির দাবাখেলায় বারবার পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ হয়েছে নিষ্পেষিত ও পরাজিত। কিন্তু চিরবিদ্রোহী বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম প্রচেষ্টা তাতে থেমে যায়নি। যদিও তা হয়েছে প্রলম্বিত কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তা হয়েছে জোরদার; যার ফলস্বরূপ স্বাধীনতা। মূলত এ বিদ্রোহের

---

১১২. শ্যামলী ঘোষ, অনূ: হাবীব-উল-আলম, *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*(ঢাকা : ইউপিএল, ২০০৭), পৃ. ৩

১১৩. মোনায়েম সরকার, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), খ.১, পৃ. ১৫২

১১৪. হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*(ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), খ.৪, পৃ. ৫২৬

প্রেরণাটা এসেছে সে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে সাফল্যের প্রেরণা থেকেই। বাংলার জনগণ যে বিদ্রোহী চরিত্রের তা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। মোগল আমলের ঐতিহাসিক ইবন বতুতা সুবে বাংলাকে 'নিয়ামতপূর্ণ দোযখ' নামে অভিহিত করেছিলেন। তাই বাংলার জনগণকে দমিয়ে রাখার কোন প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বঞ্চনা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাংলাদেশের জনগণকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ববাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হওয়ার পরেও পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় করাচি, পরবর্তীতে ইসলামাবাদ। ১৯৫৪ সালে ভাসানী, শের-ই-বাংলা এ. কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যখন যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তখন পাকিস্তানি নেতৃত্ব বিষয়টাকে ভালভাবে নেয়নি। এরপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় নয় বছর (১৯৪৭-১৯৫৬ খ্রি.) পর পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হলেও তা মাত্র ২ বছরের বেশি টিকতে পারেনি।

তৎকালীন সেনাপ্রধান আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইসকান্দার মির্জাকে অপসারণ করে দেশত্যাগে বাধ্য করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করে সংবিধান স্থগিত করেন।[১১৫] তিনি গণতন্ত্রের এক নতুন রীতি মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর আইয়ুব খান তার ক্ষমতা দখলের বর্ষপূর্তিতে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' জারি করেন।[১১৬] যেখানে সাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। পরবর্তীতে তিনি গণআন্দোলনের মুখে ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ১৯৬৯ সালে পদত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান এসে নির্বাচনের নামে দুই বছর নিজ ইচ্ছামত শাসন পরিচালনা করেন এবং একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বঞ্চিত করে বাংলাদেশের উপর এক অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেন। মূলত ২৪ বছরের (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.) পাকিস্তান আমল মাত্র দুই বছর সংবিধানের আলোকে পরিচালিত হয় আর বাকি সময়টাই পাকিস্তানি নেতাদের ও তাদের দোসর সামরিক বাহিনীর হাতে ইচ্ছেমত দেশ পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এদেশের জনগণ ছিল বঞ্চিত ও শোষিতের দলে। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৩.৭ ভাগের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬.৩ ভাগ জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের মাত্র ২৫-৩০% এ অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ থাকত।[১১৭]

যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি ৬০-৬৫% বৈদেশিক আয় হত।[১১৮] কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের ৬০% অর্জিত হত এদেশ থেকে অথচ এর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানে। এমনকি এদেশে যেসব ছোট কারখানা ছিল তার ৪৩% এর মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা।[১১৯] কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ক্ষেত্রেও তিন-চতুর্থাংশ তাদের দখলে ছিল। দেশ রক্ষার সদর দপ্তর, স্টেট ব্যাংকের প্রধান ভবন, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, বৈদেশিক দূতাবাসসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রমের প্রধান

---

১১৫. ইসকান্দার মির্জাকে সস্ত্রীক বিমানযোগে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

১১৬. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*(ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স), পৃ. ২২৩

১১৭. Safar A. Akanda, unpublished Ph.D Thesis on *East Pakistan and Politics of Regionalism*(Denver : University of Denver, 1970), p. 177

১১৮. A.M.A Muhith, *Bangladesh : Emergence of a Nation*, ibid, p. 106

১১৯. Raunaq Jahan, *Pakistan : Failure in National Integration*(New York : Columbia University Press,1972), p. 75

এলাকা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এদেশকে অবহেলা করা হয়। ভাষাকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সংঘাত ঘটে। ধর্মের দিক থেকে মিল হলেও এদেশের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। এ দু' অংশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে ছিল ভারসাম্যের অভাব। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলার উচ্চবিত্তরা ছিলেন জমিদারগোষ্ঠী যাদের বাস ছিল কলকাতায়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় তারা ভারতে চলে যায় এবং তাদের সম্পত্তি ভারতে স্থানান্তর করে। পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের ৮৪.৩ ভাগ আয়তন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং মাত্র ১৫.৭ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, অথচ মোট জনসংখ্যার ৪৩.৭ শতাংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫৬.৩ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।[১২০] তবুও এভাবেই শোষকরা শোষণ করে চলছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের পরিধি : মানবজাতি ও মানব সভ্যতার আদ্যপ্রান্তের চিত্তাকর্ষক সমীক্ষা হল ইতিহাস। মূলত ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটার উদ্ভবের পর হতেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের পরিধিও সে প্রেক্ষিতেই বিচার্য। কিন্তু এখানেই এর শেষ বেঁধে দেয়া যায় না; বরং এটার জন্য একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। যার মধ্যে বিশেষ করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অন্যতম।

লাহোর প্রস্তাব : ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে লাহোর প্রস্তাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৭তম কাউন্সিল অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার অদ্বিতীয় জনপ্রিয় নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী শের-এ বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, '... ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে যাতে করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর সমন্বয়ে এমন কতকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হবে, যেখানে প্রত্যেকটা ইউনিট হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্বশাষিত ... ।'

('... that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readgustment of as may be necesary that the areas in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute Independent states, in which constituent unit shall be autonomous and sovereign ...)'[১২১] এ প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এবং সার্বভৌমত্ব থাকার কথা, কিন্তু তা হয়নি। মূলত ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ও মুসলিমদের একটা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অবিভক্ত ভারতের শেষ দশকের রাজনীতিতে লাহোর প্রস্তাবই ছিল মূল নিয়ামক। এ সময়ের রাজনৈতিক অঙ্গনে লাহোর প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাহোর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। ড. লাল বাহাদুর এ প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'The Lahore Resulation was the highest culmination of Muslim aspirations roused by leaders from Syed Ahmed.' অর্থাৎ,

---

১২০. মোনায়েম সরকার, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), খ.১, পৃ. ১৫২

১২১. Syed Sharifuddin Pirzada, *Foundation of Pakistan : All India Muslim League Documents 1906-1947*(.. : 1970), vol. II, p. 341

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবই ছিল মূলত পাকিস্তান আন্দোলনের মূলভিত্তি। লাহোর প্রস্তাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পাকিস্তানের অভ্যুদয় : পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, কাঠামো ও শ্রেণি চরিত্রের মধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তথা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমল থেকেই। ব্রিটিশরা এদেশে সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন রূপে আমদানি ও তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আলফ্রেড লায়াল এর মতে, 'ভারতীয় সমাজের চাবিকাঠি হল ধর্ম। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থে এগুলোকে অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। ভারতের চব্বিশ কোটি লোক রক্ত বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত। সুতরাং এ বিভক্তি হল ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ এবং তা অটুট রাখাই শ্রেয়।' ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস ও ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম। কংগ্রেস ব্রিটিশদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গঠিত হলেও পরে তা ভারতীয় স্বাধীনতার ধারক-বাহক হয়ে উঠে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের হিন্দুপ্রীতির বিরুদ্ধে মুসলিমদের স্বার্থের ধারক হয়ে উঠলেও পরে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে উঠে। উপরন্তু মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে জিন্নাহর সভাপতিত্বে শের-ই-বাংলা ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাব তুলে ধরেন।

যা পরবর্তীতে রাজনীতির মাঠের দাবির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণীত হয় এবং সৃষ্টি হয় পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্রের। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের শুরু ১৯৪৭ সাল থেকে পরবর্তী ২৪ বছর ব্যাপী। অতঃপর ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগষ্ট ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু এর পিছনে ঘটে অনেক আন্দোলন এবং ষড়যন্ত্র।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ : ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় জাতীয়তাবাদ বিকাশের অগ্রদূত ছিলেন রামনারায়ণ বসু। তিনি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'Society for the Promotion of National Feeling Among the Educated Natives of Bengal' নামে শিক্ষিত বাঙালিদের স্বদেশ প্রীতিমূলক এক সংস্থা গড়ে তোলেন। আইয়ুবি আমলে ইসলামের নামে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বাঙালি সংস্কৃতির উপর বিভিন্নভাবে আঘাত হানা হয়। বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তন, মেলাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে যখন বাঙালি সংস্কৃতির ইসলামি করণের নামে বাঙালির স্বকীয় সত্তা ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়, তখন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাঙালি সংস্কৃতির প্রচারণা ও উজ্জীবন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সামনে নিয়ে আসে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বাঙালিদের পাকিস্তান থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। যার অনিবার্য পরিণতি হলো স্বাধীন, সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'।[১২২]

ভাষা আন্দোলন : ভাষা আন্দোলন হল বাংলাদেশের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভাষা আন্দোলন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটা উল্লেযোগ্য অধ্যায়। ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত-পাকিস্তান নামে দু'টো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিল তার মধ্যে ভাষা আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে

১২২. ড. এ. কে. এম শওকত আলী খান ও অন্যান্য, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : গ্রন্থ কুঠির, ২০১৪), পৃ. ১৭

তীব্র, ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।[১২৩] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর নেতৃত্ব মুসলিম লীগের হাতে চলে যায়। তারা বাঙালিকে পুরো পাকিস্তানের নেতৃত্বে কখনই মেনে নিতে পারেনি। এ সময় ১৯৪৭ সালের ১৭ মে 'মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের' উদ্যোগে হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত এক উর্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান ঘোষণা করেন উর্দু হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।[১২৪] তারই প্রকাশ ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর বক্তব্যের মধ্যেই। কিন্তু শুধুমাত্র ৩.৩% মানুষের ভাষা ছিল উর্দু।[১২৫] সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৬ ভাগ লোকের ভাষা ছিল বাংলা।

স্বভাবতই বাংলা ছিল রাষ্ট্র ভাষার অন্যতম দাবিদার। বাঙালিকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ধর্মীয় আবরণে তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাতে প্রথমে ভাষার উপর এবং পরবর্তীতে অন্যান্য ক্ষেত্রে আঘাত হানে। তাই ঘোষণা করে 'Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan.' ফলে চিরবিদ্রোহী বাঙালি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার রক্ষার জন্য তাদের বুকের রক্তটুকু দিতে কার্পণ্য করেনি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু কারাবন্দি অবস্থায় ভাষার দাবিতে আমরণ অনশন করেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন।[১২৬] ভাষা আন্দোলনকে বলা হয় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলনের জননী হিসেবে।

ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি : ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, লাহোর সম্মেলনে বিষয় নির্বাচনী কমিটি ৬ দফা দাবি অনুমোদন না করায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল উক্ত সম্মেলন বর্জন করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ৬ দফা অনুমোদন পায় এবং আওয়ামী লীগের দলীয় ইসতিহারে পরিণত হয়।[১২৭]

গণ অভ্যুত্থান : দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন এবং ছয় দফার পর যার স্থান তাহলো ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। যার সাফল্য মাত্র দু'বছরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে বড় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। ছয় দফা জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হওয়ায় আগরতলা মামলাকে জনগণ একটা ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখতে থাকে। ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আইয়ুব খান পদত্যাগ করে এবং একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। জনগণ তাদের আন্দোলনের সাফল্যে আনন্দিত হয়ে উঠে। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেই সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

---

১২৩. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*(ঢাকা : ১৯৯৫), খ.১, পৃ. ১৩৫

১২৪. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬২

১২৫. ড. ফজলুর রহমান, *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব(১৯৪৭-১৯৭১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১২৬. মহিউদ্দিন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধুর কারাসঙ্গী : ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১২৭. মোনায়েম সরকার, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২৪

৭০ এর সাধারণ নির্বাচন ও অচলাবস্থা : ১৯৭০ সালের নির্বাচনেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলে। কারণ এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে ক্ষমতা অর্পণ না করে বাঙালিদের উপর অমানবিক গণহত্যা শুরু করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শুরু হয়েছিল। জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ৭ ডিসেম্বর ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ১৭ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়।[১২৮]

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিস্মিত করে। তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে গড়িমসি করতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে যায়। ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রকারান্তরে এদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মানুষ স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে এবং প্রস্তুত হয় বড় একটা যুদ্ধ মুকাবিলার জন্য। শুরু হয়ে যায় বাঙালির চূড়ান্ত মুক্তির লড়াই তথা মুক্তিযুদ্ধ।

গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ : ১৯৭১ সালে অপারেশন সার্চলাইটের নামে ২৫ মার্চের মধ্যরাতে যে গণহত্যা ও নির্যাতন চালানো হয় তার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। এ আক্রমণ থেকে সর্বস্তরের জনগণের কেউ নিস্তার পায়নি। নির্বিচারে আক্রমণ চালানো হয় পুলিশ, ইপিআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র হল, সাধারণ পথচারী, দোকানদার, নারী ও শিশুদের উপর। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে এদেশীয় কিছু দোসর রাজাকার, আলবদর, আলসামসসহ বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে পাকিস্তান পন্থীরা যোগ দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ ও স্বার্থ হাসিলের উল্লাসে মেতে উঠে। অপরপক্ষে, সাধারণ জনগণ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে যার যা আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধে ঝাপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় কৃষক, শ্রমিক, পুলিশ, বিডিআর তথা ইপিআর, শিক্ষক, ছাত্র তথা আপামর জনতা। হাজার হাজার মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পালিয়ে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে গেরিলা ট্রেনিংসহ যুদ্ধের জন্য এদেশে প্রবেশ করে।

ইতোমধ্যে, সরকার গঠিত হয় মেহেরপুরের মুজিবনগরে। সরকার মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশকে ১১ সেক্টরে ভাগ করে। এছাড়া তিনজন সেনানায়ক জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশারফ ও শফিউল্লাহর নেতৃত্বে তিনটা বিশেষ ফোর্স পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া আছে আঞ্চলিক প্রতিরোধ কাদেরিয়া, হেমায়েত ও মুজিব বাহিনী, এদের সংখ্যা ছিল ৭ থেকে ৮ হাজার।[১২৯] কারও কারও মতে এ বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।[১৩০] জনপ্রতিরোধ যতই বাড়তে থাকে সেনাবাহিনীর অত্যাচার ততই বাড়তে থাকে। কিন্তু নির্বিচার গণহত্যা থেমে থাকে না বরং তারা 'এদেশের মানুষ চাই না মাটি চাই' এরূপ পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু চিরবিদ্রোহী চরিত্রের এদেশের জনগণ তাতে দমে না গিয়ে পাল্টা আঘাত হানতে থাকে। ভারতের সহমর্মিতা ও সহযোগিতার হাত ক্রমেই বাড়তে থাকে, মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের হারও বাড়তে থাকে, পাকিস্তানিদের মনোবল ততই কমতে থাকে।

---

১২৮. ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১২৯. Talukder Muniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, ibid, p. 116

১৩০. Major Safiullah, *Bangladesh in Liberation War*, ibid, p. 56

ফলে এক সময় পাকিস্তান অসহিষ্ণু হয়ে ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারত আক্রমণ করে বসে। তখনই ভারত এ যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়ে। মাত্র ১৩ দিনের মাথায় ৯৩ হাজার সুসজ্জিত প্রশিক্ষিত সৈন্যসহ জেনারেল নিয়াজী তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়, নারী নির্যাতিত হয় প্রায় ২ লক্ষ। মাত্র নয় মাসের এ যুদ্ধে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে যে বিজয় সূচিত হয়, বিজয়ের আনন্দে এদেশের আপামর জনতা অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞ এতই ছিল যে অনেক বড় বড় যুদ্ধের ক্ষতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের সমন্বয়ে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। এ গণহত্যা নিয়ে পরবর্তীকালে পাকিস্তানিরাই সর্বপ্রথম বিতর্ক সৃষ্টি করে। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়নি; তিন লক্ষও না। ডেভিট ফ্রস্টের সাথে আলোচনা কালে শেখ মুজিব তিন লক্ষকে ভুল করে ইংরেজিতে থ্রি মিলিয়ন বলেছিলেন। মস্কো থেকে প্রকাশিত প্রাভদা পত্রিকায়ই সর্বপ্রথম ত্রিশ লক্ষ সংখ্যাটা উল্লেখ করা হয়। আসলে বঙ্গবন্ধু তখন স্বীকৃত সংখ্যাটাই বলেছিলেন। বাস্তবে এ সংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও বেশি।[১৩১] হাজার হাজার মানুষ হয়েছে যুদ্ধাহত ও এতিম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য : বৈষম্যের সংক্ষিপ্ত কিছু তালিকা তুলে ধরা হল। ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান ভারত সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানে জাতি গঠনের অন্যান্য উপাদান যেমন– ভাষা, নরগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, জীবনধারা, অঞ্চল ইত্যাদি প্রায় কোনটার মধ্যেই মিল দেখা যায় না। ফলে এ রাষ্ট্রটা যে খুব বেশিদিন টিকতে পারে না তখনকার কিছু নেতৃত্ব বলেই দিয়েছিলেন। অন্যতম কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাকিস্তান প্রস্তাব খ্যাত লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান গঠিত হলেও তা বেশিদিন টিকবে না। এর মেয়াদ হতে পারে সর্বোচ্চ ২৫ বছর। কারণ বাঙালি বহিরাগত নেতৃত্ব খুব একটা পছন্দ করে না। ফলে পাকিস্তান হবে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ক্রীড়াক্ষেত্র।' যা পরবর্তীতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মূলত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল বৈষম্যের বীজ। ব্রিটিশদের মতই তারা এদেশকে নতুন উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিল। বলা যেতে পারে বাংলাদেশ সৃষ্টির অন্যতম কারণও এ দমন পীড়নের মাধ্যমে বাঙালিকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি এবং শোষণ।

আর্থ–সামাজিক বৈষম্য : বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটা পটভূমি আছে যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। আজকের যে স্বাধীন বাংলাদেশ তা ছিল অখন্ড পাকিস্তান রাষ্টের একটা প্রদেশ– নাম পূর্ব-পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার আমাদের স্বাধীনতা প্রদান করে।

বড় আশা নিয়ে নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান সৃষ্টি করছিলেন। পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ১৫০০ কিলোমিটার ব্যবধান থাকলেও ধর্মের ভিত্তিতে এক ধরনের প্রবল ঐক্য গড়ে উঠে– যা পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাকিস্তানের জনগণকে একত্রে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এ অঞ্চলের মানুষ আগে থেকেই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছিল।[১৩২] ঔপনিবেশিক পৃথিবীতে পাকিস্তানই একমাত্র রাষ্ট্র যেটা সশস্ত্র সংঘাতের মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে যায়। এখন কেন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনিবার্য ছিল তার একটা পটভূমি তুলে ধরা হল : ভারতবর্ষ বিভক্তির পটভূমিতে সৃষ্ট অখণ্ড পাকিস্তান নামক দেশটা ছিল একটা 'অভিনব রাষ্ট্র'। সাম্প্রদায়িক

---

১৩১. মুনতাসির মামুন ও মোঃ মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ২১৫

১৩২. মোঃ মকসুদুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৫), পৃ. ৭৬

চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতি ছিল রাষ্ট্রটার মূলভিত্তি। দেশের দু' অংশের মধ্যে ব্যবধান ছিল ভৌগোলিকভাবে, তেমনি ছিল জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রেও। নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামগ্রিক জীবন ধারার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ভিন্ন ছিল। পাকিস্তানের এ কাঠামোগত স্ব-বিরোধিতার সমাধানে কোন কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করতে পাকিস্তানিদের কোন আগ্রহ ছিল না। তারা কখনও বাঙালিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রের প্রভাবে পঞ্চাশের দশকে যে ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক শাসন চালু ছিল সেখানের বাঙালিদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। এ অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন দু'টো কাঠামোতে প্রতিফলিত হয় : (১) মৌলিক কাঠামো অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ; ও (২) উপরি কাঠামো অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ।

অর্থনৈতিক বৈষম্য : বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভারত বিভক্তিকালে পাকিস্তানের দু' অংশ যে অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয়, তাতে তাদের বিকাশ স্তরে তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য ছিল না। উভয় অংশের জিডিপি প্রায় সমান ছিল। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হয় এবং ষাটের দশকেও তা অব্যাহত থাকে। ফলে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জিডিপি পূর্বাংশের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে এবং দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ষাটের দশকে দু' অংশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে পূর্বাংশে ৪৩% এবং পশ্চিমাংশে ৬৪%। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান দেখিয়েছেন ১৯৫৫-১৯৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির অংশ ছিল ৩৮.৬% এবং পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির অংশ ছিল ৬১.৪%। বাজেটের ৭৫% ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানে, ২৫% ব্যয় হতে পূর্ব পাকিস্তানে, যদিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় ছিল শতকরা ৬২ ভাগ;[১৩৩] যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশি।

সামরিক বৈষম্য : অর্থনৈতিক এ শোষণকে আরও পোক্ত করা হয়েছিল অন্যান্য কতগুলো উপায়ে। যেমন, তিনটা বাহিনীর সদর দফতরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, এমনকি অস্ত্র কারখানাগুলোও। দেশরক্ষা বাহিনীর চাকুরিও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া দখলে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেটের ৫৬% প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। প্রতিরক্ষা খাতে পূর্ব বাংলায় ব্যয় করা হয় এর মাত্র ১০%। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বৈষম্য ছিল সেনাবাহিনীতে। পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২৫ গুণ বেশি। ১৯৫৫ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ১৪ জন (১.৫%) অফিসার, সেখনে পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৯৪ জন, নৌবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তান ৭ জন (১.২৫%) এবং পশ্চিম পাকিস্তান ৫৯৩ জন। আর বিমান বাহিনীতে অফিসার ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ৬০ (৪.৬%) জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সেখানে ৬৪০ জন।

বেসামরিক আমলা (Civilian bureaucracy) : অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার ইতিহাসও নেহায়েত ছোট নয়। এখানেও বাঙালিরা তাদের ন্যায়সঙ্গত হিসাব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সরকারি দপ্তরগুলোতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব আশংকাজনক হারেই কম ছিল। পররাষ্ট্র দপ্তর ও কূটনৈতিক

১৩৩. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*(ঢাকা : প্রতীতি, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ২

মিশনের উপসচিবের একজনও এ সময় পূর্ব বাংলার ছিল না। ৫২ জন তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে ৩ জন এবং ২১৬ জন সহকারীর মধ্যে মাত্র ২৫ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী।[১৩৪]

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য (Inequality in Education) : শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র ছিল আরও ব্যাপক। শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে সীমাহীন বৈষম্যের মধ্যে রাখা হয়। বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাব্যবস্থার সংকটটা ছিল কৃত্রিম এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ শিক্ষাখাতে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু বরাদ্ধ ছিল ১ পাইয়ের ৩ ভাগের ১ ভাগ। এর প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সংকট শুরু হয়েছিল, তার স্বীকৃতি আছে পাকিস্তানের ২য় শিক্ষা সম্মেলনে উত্থাপিত একটি পর্যালোচনায়। সেখানে বলা হয়, পূর্ব বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে আড়াই লাখ ছাত্র কমে গেছে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কমে গেছে দুই হাজার ছাত্র।[১৩৫]

চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য : সারণি : ১ ফরেন সার্ভিস ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকুরি, ১৯৬২-১৯৬৩[১৩৬]

চাকুরি	মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা হার
ফরেন সার্ভিস	২৪০	৫০	১৯০	২০.৮
কেন্দ্রীয় ব্যাংক	৭৫১	২৩৬	৫১৫	৩১.৪

সারণি : ২ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের উচ্চপদে বাঙালি প্রতিনিধিত্ব, ১৯৬২:[১৩৭]

নাম	মোট	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের % হার
সচিব	১৯	১৯	০	০
যুগ্ম সচিব	৪৬	৩৯	৭	১৫
উপ-সচিব	১২৬	১০২	২৪	১৬
শাখা কর্মকর্তা	৭৬৩	৬৭৫	৮৮	১১

আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য : পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য ছিল অবিশ্বাস্য। ১৯৬৪-১৯৬৫ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গড় আয়ে বৈষম্য ছিল ৩৮.১%। ১৯৬৯-১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৪২৪ টাকা। পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ৩৩১ টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৫৩৭ টাকা।[১৩৮] দুই অংশের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য ছিল ২০৬ টাকা। শতকরা হিসেবে বৈষম্য বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭.১% এ। ১৯৪৭-১৯৫৫ সময়কালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন তার প্রায় ৯০% ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। উক্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় হয় ১৬৮১ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু এ অর্থের মধ্যে মাত্র ৪২৭ মিলিয়ন টাকা এখানে ব্যয় করা হয়।[১৩৯]

---

১৩৪. Raunaq Jahan, *Pakistan : Failure in National Integration*, ibid, p. 25
১৩৫. Fazlur Rahman, *New Education in Making New Pakistan*(London : Causal & Co. Ltd., 1953), p. 13
১৩৬. Board of editors, *Encyclopedia of SASRC Nations*(New Delhi : 1997), p. 66
১৩৭. National Assembly of Pakistan Deates, Official Report, vol. 1, June, 1962, p. 111
১৩৮. Report of the Panel of Economists on the Fourth Year Plan (1970-1975), p. 132
১৩৯. Safar A. Akanda, Unpublished Ph.D Thesis on *East Pakistan and Politics of Regionalism*(Denver : University of Denver, 1970), p. 177

সারণি : ৩ পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় (রুপি হিসেবে):[১৪০]

অর্থ বছর	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
পূর্ব পাকিস্তান	২৬৯	২৭৮	২৭৮	২৮০	৩০৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৩৫৫	৩৫৯	৩৬৮	৩৮২	৩৮৮
সমগ্র পাকিস্তান	৩১৮	৩২৫	৩৩৪	৩৩৬	৩৫৩
বৈষম্যের % হার	২৮	২৬	২৫	৩১	২৪

সাংস্কৃতিক বৈষম্য (Cultural lnequality) : সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানিদের ভাষা ছিল বাংলা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ছিল উর্দু। মোট জনসংখ্যার আধিক্যে প্রবল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বাংলা ভাষায় কথা বলত। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পাকিস্তানের উভয় অংশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলেন।

পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হলেও ততদিনে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ অনেক দূর এগিয়ে যায়। আইয়ুব খান রোমান হরফে বাংলা লেখার জন্য 'ভাষা সংস্কার কমিটি' গঠন করেন। এ উদ্যোগ বাঙালিদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ভেস্তে যায়। কিন্তু উভয় অংশের মধ্যে এ নিরন্তর সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বিচ্ছিন্নতার পটভূমিকে ক্রমশ অনিবার্য করে তোলে।

সারণি : ৪ ভাষাভাষীর ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের বার্ষিক চিত্র :[১৪১]

ক্রমিক নং	ভাষা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
১	বাংলা	৯৮.৪২%	০.১২%	৫৬%
২	উর্দু	০.০২%	৬৬.৩৯%	২৯%
৩	পাঞ্জাবি	০.৬১%	৭.৫৭%	৩.৬৫%

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য : অখণ্ড পাকিস্তানের ইতিহাসের সমগ্র সময়টাতে বাঙালিদের তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস রাষ্ট্রপতি, অর্থমন্ত্রী, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রধান পদ থেকে বাঙালিদের বঞ্চিত করা হয়। একটা অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসূমহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল জাতীয় ক্ষমতার ন্যায্য হিস্যা লাভকল্পে বাঙালিদের পরিকল্পিত সংগ্রামের অংশ। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও আমলাতন্ত্রের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তারা বাঙালিদের কখনই কেন্দ্রের ক্ষমতায় দেখতে চায়নি। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,...।' এরপর ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসে এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করে। ১৭ মার্চ সন্ধায় জেনারেল ইয়াহিয়া টিক্কা খানকে বলেন, 'মুজিব সঠিক আচরণ করছে না, তুমি তৈরি হও।'[১৪২] শুরু হয়ে যায় সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে ইতিহাসের বর্বোরোচিত ও জঘন্য হত্যাকান্ডে মেতে উঠে ।

---

১৪০. Pakistan, Planning Commission, The Mid-Plan Review of the Third Five Year Plan 1965-1970, p. 34

১৪১. Pakistan Statistical Year book, 1969, p. 16

১৪২. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড*(ঢাকা : চারুলিপি প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৩১

অবশেষে বীর বাঙালি তথা বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪ টা ২১ মিনিটে পাক হানাদার বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জে. এ.এ.কে নিয়াজি (আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি) ৯৩ হাজার সহযোগী সৈন্য নিয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে[১৪৩] বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। পাক বাহিনীর এ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। পত-পত করে উড়তে থাকে লাল সবুজের পতাকা; স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতির ইতিহাসের তুলনায় 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস'-এর পরিধি সীমিত। কারণ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস হল বাংলাদেশের ভিতরগত মানুষের ইতিহাস। সুনির্দিষ্ট করে বললে এর ব্যাপ্তী হল ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৪ বছর সময়কালের ইতিহাস। তবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ রোপিত হয়েছিল তারও বহু পূর্বে। বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমল, বার ভূইয়া'র যুগ, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনা ও বিষয় বাঙালি জনমানসে স্বাধীনতার আকাঙ্খা তৈরি করে। ১৯৭১ সালে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মাধ্যমে তার বাস্তব রূপায়ন ঘটে।

১৪৩. বর্তমানে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিশু পার্ক সংলগ্ন এলাকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশের বর্তমান পরিচিতি

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট মধ্যরাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ রাষ্ট্রটা দু'টো অংশে বিভক্ত ছিল। যথা- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। দু'পাকিস্তানের মধ্যকার দূরত্ব ছিল প্রায় ১৬০৯ কি.মি.। অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বদিকে $^{৩}/_{৪}$ অংশ এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল। এর পরবর্তী নামকরণ হল বাংলাদেশ।[১৪৪]

রাষ্ট্র ও জাতীয় বিষয় : সাংবিধানিক নাম : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ইংরেজি নাম : The People's Republic of Bangladesh

রাজধানী : ঢাকা

বাণিজ্যিক রাজধানী : চট্টগ্রাম

জাতি : বাঙালি

জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব : বাংলাদেশী

জাতীয় সংগীত : আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।... (বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রণ সংগীত : চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল... (জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম)

জাতীয় পতাকা : দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬ আয়তনের সবুজ যমিনের মাঝখানে গাঢ় লাল বৃত্ত।

রাষ্ট্রভাষা : বাংলা (ইংরেজি অন্যতম ভাষা)।

রাষ্ট্র ধর্ম : ইসলাম।

জাতীয় মনোগ্রাম : লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের উপর দিকে লেখা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ', নিচে লেখা 'সরকার' এবং বৃত্তের দু'পাশে দু'টো করে মোট ৪ টা তারকা।

জাতীয় প্রতীক : দু'পাশে ধানের শীষবেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা। তার মাথায় পাট গাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটা পাতা এবং উভয় পাশে দু'টো করে তারকা।

জাতীয় সংসদ ভবন : এটা শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত। জমির পরিমাণ ২১৫ একর, এর স্থপতি প্রফেসর লুই আই কান ও ডিজাইনার হেনরি এন. উইলকটস এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার হ্যারি এম পামবাম।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ : এটা সাভারের নবীনগরে অবস্থিত। এটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্থপতি সৈয়দ মঈনুল হোসেন। এটার উচ্চতা ১৫০ ফুট এবং ফলকের সংখ্যা ৭ টা।

জাতীয় শহীদ মিনার : এটা ঢাকা মেডিকেল কলেজ গেইটের সামনে অবস্থিত। স্থপতি হামিদুর রহমান। ফলক উন্মোচন শহীদ শফিউরের পিতা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত।

জাতীয় বন : দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় সুন্দরবন অবস্থিত। মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কি.মি.। এটার বাংলাদেশ অংশের আয়তন ৬,০১৭ বর্গ কি.মি. এবং বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় ৭৯৮ তম। এটা পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরি গাছ।

---

১৪৪. প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, *অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, আগষ্ট ১৯৯৭), খ.২, পৃ. ৩-৫, ৩১

বাংলাদেশের তিন দিকেই ভারত রাষ্ট্র, কেবল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এর উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার (বার্মা), পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বাংলাদেশের মোট সীমারেখা : ৫,১৩৮ কি.মি.

বাংলাদেশের মোট স্থলসীমা : ৪,৪২৭ কি.মি.

জলসীমা : ৭১১ কি.মি.

মোট সমুদ্রসীমা : ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি.

দেশের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমে ভারতের সাথে সীমান্ত ৪,১৫৬ কি.মি.[১৪৫]

এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে মায়ানমারের (বার্মা) সাথে ২৭১ কি.মি.[১৪৬]

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৩২ কি.মি. (৪৫৫ মাইল)

আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location) : অবস্থানগত দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ খ্যাত বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ ২০°৩৪´ (২০ ডিগ্রি ৩৪ ইঞ্চি) উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮´ (২৬ ডিগ্রি ৩৮ ইঞ্চি) উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এ দেশের বর্তমান সীমানা– উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য, পূর্ব-দক্ষিণে মিয়ানমার (বার্মা); পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশের আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গ মাইল। সমুদ্রতটে এটা অবস্থিত হওয়ায় এটার আয়তন পলিমাটি ও দ্বীপ তৈরি হওয়ার জন্য ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। আয়তন বাড়ার আরও একটা অন্যতম কারণ হল ভারত বিভক্তির সময় বাংলাদেশের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল দু'দেশের মধ্যদিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর মধ্য স্রোত বরাবর। কিছুদিন পূর্বে মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সীমানা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশের জয়ের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় সমপরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীতে বা এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বাংলাদেশ অবস্থিত। এটা প্রায় ২০°৩৪´ উত্তর হতে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। ফলে এদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

আয়তন (Area) : আয়তনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯০তম।[১৪৭] 'ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস'এ বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার (৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল)। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা প্রায় ২২ কি.মি. (১২ নটিক্যাল মাইল)[১৪৮] এবং দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic zone) সমুদ্রের

---

১৪৫. প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *নতুন বিশ্ব*(ঢাকা : প্রফেসর'স প্রকাশন, জানুয়ারি, ২০১৭), পৃ. ৩

১৪৬. প্রাগুক্ত।

১৪৭. ছোটদের বিশ্বকোষ, ৯১তম প্রকাশ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৯৯

১৪৮. ১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫ মাইল বা ১.৮৫২ কি.মি.

সীমারেখা হতে গভীর সমুদ্রের প্রায় ৩৭০.৪০ কি.মি. (২০০ নটিক্যাল মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। সন্নিহিত এলাকা ১৮ নটিক্যাল মাইল। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের কক্সবাজার; যার দৈর্ঘ্য ১৫৫ কি.মি.।

জনসংখ্যা (Population) : জনসংখ্যার আকারের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা ২০১১ সালের পঞ্চম আদমশুমারি অনুযায়ী প্রায় ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩ শত ৬৪ জন।[১৪৯] বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জন্মহার প্রতি হাজারে ১৮.৯ জন এবং মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৫.২। নারী-পুরুষের অনুপাত ১০০ : ১০০.৩।[১৫০] প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল ৭০.৭ বছর। বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১,০৬৩ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)। পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৪ জন। ২০১৬ সালের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৬তম।

ধর্ম (Religion) : বাংলাদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলিম। জনসংখ্যার ৯০.৩৯% মুসলিম। হিন্দু ৮.৫৪%, বৌদ্ধ ০.৬২%, খ্রিস্টান ০.৩১% এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ০.১৪%।[১৫১]

ভাষা (Language) : বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। পূর্বে এদেশে অফিস আদালতে ইংরেজি ভাষা চালু ছিল। বর্তমানে সরকার দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করেছে। অবশ্য ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের প্রচলনও আছে। ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় দিবস ও জাতিসংঘ ঘোষিত আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস।

শিক্ষা (Education) : বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার ৭১%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত ৩৩.৬ : ৬৬.৪।

সারণি-৪ : শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থান[১৫২]

ক্রমিক নং	নাম	সংখ্যা
১	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (মাদরাসা ও কারিগরিসহ) (৮+১+১)	১০টি
২	পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ)	৩৯টি
৩	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	৯৫টি
০৪.	আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়	২টি
০৫.	সরকারি কলেজ (ডিগ্রি পাস, অনার্স স্নাতকোত্তর)	৩০২টি
০৬.	বেসরকারি কলেজ (ডিগ্রি পাস, অনার্স স্নাতকোত্তর)	৩৮১১টি
০৭.	সরকারি ও বেসরকারি মাদরাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিলসহ)	৯৩১৯টি
০৮.	প্রাথমিকবিদ্যালয় (সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এবং অন্যান্য)	১,২২,১৭৬টি

১৪৯. ১৫ কোটি ৯৯ লাখ, অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৬; এবং ১৬ কোটি ২৯ লাখ, UNFPA, 2016

১৫০. ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, *ভূগোল*(ঢাকা : কাজল ব্রাদার্স লিঃ, ২০১১), পৃ. ৩২-৩৩

১৫১. পঞ্চম আদমশুমারি ২০১১; ৮৬.৬% মুসলিম, ১২.১% হিন্দু, ০.৬% বৌদ্ধ, ০.৪% খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ০.৩%। see. Discover Bangladesh (in Bengali) National web portal of Bangladesh; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ অনুযায়ী ৬২.৩%; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী ৬৫.৫%; বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

১৫২. *বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান*-২০১৫; গোলাম মোস্তফা কিরন সম্পাদিত, *আজকের বিশ্ব*(ঢাকা : প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০০১), পৃ. ৬৪ ও ১৪৯; প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *নতুন বিশ্ব*(ঢাকা : প্রফেসর'স প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৭), পৃ. ১৮৮-১৮৯

ক্রমিক নং	নাম	সংখ্যা
০৯.	সরকারি মেডিকেল কলেজ	২৯টি
১০.	বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	৫৩টি
১১.	ক্যাডেট কলেজ	১২টি
১২.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫,৫৮৯টি
১৩.	নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩,৪৯৪টি
১৪.	আর্মি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ (৬+১+১)	৮টি
১৫.	স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ইনস্টিটিউট	৫টি
১৬.	পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	২৭টি
১৭.	আইন মহাবিদ্যালয়	৭১টি
১৮.	প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৫৪টি
১৯.	ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	৯৭টি
২০.	প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়	৯টি
২১.	শারীরিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়	৩২টি
২২.	শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১১৩টি
২৩.	টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	৯০টি
২৪.	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৫টি
বাংলাদেশের এ পর্যন্ত শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে ৬ টা। প্রথম সভাপতি ছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদা। সবশেষ গঠিত হয় ২০০৩ সালে। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা।		
এছাড়াও আছে আরও বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।		

উপজীবিকা (Occupation) : কৃষিকাজ বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। দেশের প্রায় ৮৫% জন লোক কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বাকি ১৫% জন লোক শ্রমিক, চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত।

বাংলাদেশের জলবায়ু (Climate of Bangladesh) : বাংলাদেশ বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা দেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব এখানে এত অধিক যে, সামগ্রিকভাবে এ জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। যদিও বছরকে ছয়টা ঋতুতে ভাগকরা হয়, তবে মাত্র তিনটা সুনির্দিষ্ট ঋতু লক্ষ্য করা যায়। শীতকাল, গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল। অন্য তিনটা ঋতু– শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকাল তেমন স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এদেশের জলবায়ু মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, মৃদু শীতকাল, সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা ও প্রচুর বৃষ্টিপাত এদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি[১৫৩] জলবায়ুর প্রভাব এদেশের জলবায়ুর উপর এত অধিক যে

১৫৩. বাংলা মৌসুমি শব্দটা আরবি 'মাওসুম' শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ ঋতু। সুতরাং বিভিন্ন ঋতুতে যে জলবায়ুর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে পানি ও স্থলভাগের উষ্ণতার তারতম্যের কারণে গ্রীষ্মকালে বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়। যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসে বিধায় এ বায়ুর প্রভাবে বর্ষা ঋতুতে এখানে অনেক বৃষ্টিপাত হয়। পক্ষান্তরে, উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে শীতকালে এখানে তেমন বর্ষা হয় না।

সামগ্রিকভাবে এর জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এক একটা ভিন্ন ঋতুর আবিভার্ব। একটা হতে আর একটা ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এ বিভিন্ন ধরনের ঋতুতে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য হয়। কিন্তু কোন সময়ই এটা অন্যান্য শীত প্রধান ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মত চরমভাবাপন্ন হয় না।

বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চল Climatic Regions of Bangladesh : বাংলাদেশে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হলেও এর সর্বত্র জলবায়ু একইরূপ নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তাই বাংলাদেশকে ছয়টা জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা, (১) ক্রান্তীয় সামুদ্রিক জলবায়ু অঞ্চল; (২) ক্রান্তীয় আদ্র জলবায়ু অঞ্চল; (৩) ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল; (৪) ক্রান্তীয় প্রায় আদ্র জলবায়ু অঞ্চল; (৫) উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল ও (৬) উপক্রান্তীয় আদ্র জলবায়ু অঞ্চল।

তাপমাত্রা : বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৪° সে. ও ২১° সে. (৯৩·২° ও ৭০° ফা.) এবং শীতকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৯° সে. ও ১১° সে. (৮৪·২° ও ৫১·৮° ফা.) অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের তাপমাত্রার পার্থক্য ৫°-১০° সে.। কিন্তু ১৯০৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারিতে শীতকালীন তাপমাত্রা দিনাজপুর ১.৬° সে. পরিলক্ষিত হয়। আজ পর্যন্ত এটা বাংলাদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সমুদ্রের প্রভাব এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুণ বাংলাদেশে গ্রীষ্মের আধিক্য দেখা যায় না। এখানে গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা ২৭° সে. হতে ৩২·২° সে. (৮০°–৯০° ফা.) এবং শীতকালীন গড় উষ্ণতা ১৩·২° সে. হতে ২১° সে. (৫৭°- ৭০° ফা.)।

বৃষ্টিপাত : বাংলাদেশের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত, রাজশাহি অঞ্চলের লালপুরে (১১৭·৫ সে.মি. বা ৪৭´) এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত সিলেট অঞ্চলের লালখান (৬৩৭·৫ সে.মি. বা ২২৫´) পরিলক্ষিত হয়। এ দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ২০৩ সে.মি. (৮০´)। এর পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্বদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমঃশই বেশি। বার্ষিক বৃষ্টিপাত উত্তর-পূর্বাংশে ৫০০ সে.মি., দক্ষিণ পূর্বাংশে ৩০০ সে.মি. এবং পশ্চিমাংশে ১২৫ সে.মি। বাংলাদেশের মোট ঋতু ছয়টা– (১) গ্রীষ্ম, (২) বর্ষা, (৩) শরৎ, (৪) হেমন্ত, (৫) শীত, ও (৬) বসন্ত। তবে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধানত তিনটা ঋতুতে ভাগ করা যায়। যথা, (ক) শীতকাল (খ) গ্রীষ্মকাল ও (গ) বর্ষাকাল।

একারণে বাংলাদেশকে মৌসুমি জলবায়ুর দেশও বলা হয়। মোটকথা শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল এবং উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রশাসনিক বিভাগ : বাংলাদেশে বর্তমানে ৮ টা প্রশাসনিক বিভাগ আছে। যথা,

(১) ঢাকা : ঢাকা বিভাগে জিলা সংখ্যা ১৩ টা।
(২) রাজশাহী : রাজশাহী বিভাগে জিলা সংখ্যা ৮ টা।
(৩) চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিভাগে জিলা সংখ্যা ১১ টা।
(৪) খুলনা : খুলনা বিভাগে জিলা সংখ্যা ১০ টা।
(৫) বরিশাল : বরিশাল বিভাগে জিলা সংখ্যা ৬ টা।
(৬) সিলেট : সিলেট বিভাগে জিলা সংখ্যা ৪ টা।
(৭) রংপুর : রংপুর বিভাগে জিলা সংখ্যা ৮ টা।
(৮) ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহ বিভাগে জিলা সংখ্যা ৪ টা।

প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী তথ্য[১৫৪]: সারণী-১

বিভাগের নাম	জিলার সংখ্যা	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা (আ.শু-২০১১ খ্রি.)	জেলার নাম
(১) ঢাকা	১৩	২০,৫০৯	৩,৭৮,৯৩,৯২৩	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী।
(২) চট্টগ্রাম	১১	৩৩,৯০৯	২,৯৫,৫৩,৮৫৭	চট্টগ্রাম,রাঙামাটি,বান্দরবন,খাগড়াছড়ি,কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
(৩) রাজশাহী	৮	১৮,১৫৩	১,৯২,২৫,৯০৯	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট।
(৪) খলনা	১০	২২,২৮৪	১,৬৩,০৯,৩০৪	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা।
(৫) বরিশাল	৬	১৩,২২৫	৮৬,৫২,৩২৪	বরিশাল, ঝালকাঠি,পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা।
(৬) সিলেট	৪	১২,৬৩৬	১,০২,৯৬,৯৯৫	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।
(৭) রংপুর	৮	১৬,১৮৫	১,৬৪,১২,২৮৭	রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী।
(৮) ময়মনসিংহ	৪	১০,৬৬৯	১,১৪,২৭,৭৬৫	ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা ও শেরপুর।
মোট	**৬৪**	**১,৪৭,৫৭০**	**১৪,৯৭,৭২,৩৬৪**	

প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী তথ্য[১৫৫]: সারণী-২

বিভাগের নাম	জিলা	উপজেলা	পৌরসভা	ইউনিয়ন	পুরুষ	মহিলা	বৃদ্ধির হার	অনুপাত	ঘনত্ব	সাক্ষরতার হার
(১) ঢাকা	১৩	৮৮	৬৩	৮৭৬	১,৯৪,৬৭,৫৩৫	১,৮৪,২৬,৩৮৮	১.৫৩%	১০৫	১৯৭৩	৫২.৮৮%
(২) চট্টগ্রাম	১১	১০৩	৬৪	৯৪৭	১,৪৪,৮৮,৫৩৩	১,৫০,৬৫,৩২৪	১.৬৩%	৯৬	৮৩৮	৫২.৭%
(৩) রাজশাহী	৮	৬৭	৬১	৫৬৪	৯৬,২৮,২৯০	৯৫,৯৭,৬১৯	১.২১%	১০০	১০১৮	৪৮.০%
(৪) খলনা	১০	৫৯	৩৬	৫৭৫	৮১,৫৩,৪৫৪	৮১,৫৫,৮৫০	০.৬৪%	১০০	৭০৪	৫৩.২%
(৫) বরিশাল	৬	৪২	২৬	৩৫২	৪২,৫০,১১৩	৪৪,০২,২১১	০.১৮%	৯৭	৬৩০	৫৬.৮%
(৬) সিলেট	৪	৩৯	১৯	৩৩৬	৫১,২৬,০৬৯	৫১,৭০,৯২৬	২.২১%	৯৯	৭৮৪	৪৫.০%
(৭) রংপুর	৮	৫৮	৩১	৫৩৪	৮১,৯৩,৮৫৫	৮২,১৮,৪৩২	১.৩%	১০০	৯৭৫	৪৭.২%
(৮) ময়মনসিংহ	৪	৩৫	৩৭	৩৫২	৫৬,৭২,৫৩৭	৫৭,৫৫,২২৮	০.৯৬%	৯৮.৫	১,০১০	৩৯.৮%
মোট	৬৪	৪৯১	৩২৭	৪,৫৩৬	৭,৪৯,৮০,৩৮৬	৭,৪৭,৯১,৯৭৮	১.৩৭%	১০০.৩	১০১৫	৫১.৮%
*অনুপাত = প্রতি ১০০ নারীতে পুরুষ সংখ্যা *ঘনত্ব = প্রতি বর্গকিলোমিটারে										

বাংলাদেশের নদ-নদী : বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। এ নদ-নদীগুলোই বাংলার প্রাণ; এরাই বাংলাকে গড়েছে, বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে যুগে যুগে, এখনও করছে। এ নদ-নদীগুলোই বাংলার আশীর্বাদ এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধ হয় বাংলার অভিশাপ।'[১৫৬] নীহাররঞ্জন রায়ের এ উক্তিতে বাংলার ভূপ্রকৃতিতে নদীর গুরুত্ব খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা ২৩০ টা। বাংলার বিস্তীর্ণ ভূভাগ নদীবাহিত পলিদ্বারা গঠিত এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব বাংলার কিছু অংশ ছাড়া বাংলার প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের আলোকে নবসৃষ্ট (new alluvium)। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বদিকের সীমান্তবর্তী পর্বতমালা ছাড়া বাকি

১৫৪. প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *নতুন বিশ্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

১৫৫. প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *নতুন বিশ্ব*(ঢাকা : প্রফেসর'স প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৭), পৃ. ১০১

১৫৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

সবটাই সমতলভূমি এবং এ সমগ্র ভূভাগই নদীমালার ব-দ্বীপ বা 'ডেল্টা'।[১৫৭] 'ওল্ডহাম' পশ্চিমে হুগলি নদী থেকে পূর্বে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীমালার 'ডেল্টা' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫৮] বাংলার ভূমিগঠনের ভূতাত্বিক বিশ্লেষণ করে কোন অংশ মূলত 'ডেল্টা' সে বিষয়ে বাগচী[১৫৯] আরও তথ্য পরিবেশন করেছেন। উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে অবস্থিত সিলেট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পর্বতমালা 'টারশিয়ারি পাহাড়'। উত্তরে পদ্মা, পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ মূলত প্লাবন সমভূমি এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দ্বারা গঠিত ব-দ্বীপ বা 'ডেল্টা'।

তাই ভূ-প্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলার পাঁচটা ভাগ ধরা যায় : (১) উত্তর বাংলার পাললিক সমভূমি, (২) ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অন্তবর্তী ভূ-ভাগ, (৩) ভাগীরথী-মেঘনা অন্তবর্তী বদ্বীপ, (৪) চট্টগ্রামাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা এবং (৫) বর্ধমানাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা। বাংলার ভূপ্রকৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নদীমালার। প্রধান নদীগুলোর স্রোতধারাই বাংলাকে মূলত চারটা বিভাগে বিভক্ত করেছে– উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বভাগ। প্রত্যেকটা ভাগেরই যেমন রয়েছে নিজ নিজ ভৌগোলিক সত্তা, তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক সত্তা। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের, সপ্তদশ শতকে ফানডেন ব্রোকের এবং ষোড়শ শতকের জাও দ্যা বারোসের নকশায় বাংলার নদীপথগুলোর গতিপথ অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে।[১৬০] বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। জালের মত এ নদী পুরো বাংলাদেশকে ঘিরে রেখেছে। এর অল্প আয়তনের মধ্যে এত বেশি নদ-নদী পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না। অর্থাৎ এদেশের অন্যতম প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হল এর নদ-নদী।[১৬১] পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলি প্রভৃতি বড় বড় নদী এবং এদের উপনদী ও শাখানদীর শাখা-প্রশাখা ভূখণ্ডের বুক চিরে শিরা-উপশিরার মত সাগর পানে বয়ে চলেছে। বাংলাদেশের নদীমালা এর গর্ব।

নদী এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বলতে গেলে এ নদীই বাংলাকে গড়ে তুলেছে, বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। এদেশ গোটা পূর্ব ভারতের নদীসমূহের সঙ্গমস্থল। উত্তর ভারত আর আসামের সমতলভূমি বেয়ে উপনদী-শাখানদীসমূহ নিয়ে নেমে এসেছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রসহ বিভিন্ন নদী। বর্ষার বিপুল জলরাশি সমগ্র উত্তর-ভারত আর আসামের পলিপ্রবাহ বুকে নিয়ে এ জাল বেয়ে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০০ টা নদী-উপনদী সমন্বয়ে বিশ্বের অন্যতম নদীব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের নদ-নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কিলোমিটার। ছোট ছোট পাহাড়ি ছড়া, আঁকাবাঁকা মৌসুমি খাড়ি, কর্দমপূর্ণ খালবিল, যথার্থ দৃষ্টিনন্দন নদ-নদী ও এদের উপনদী এবং শাখা নদী নিয়ে বাংলাদেশের বিশাল নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।[১৬২] দেশের উত্তরভাগের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভাগের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে নদ-নদীর সংখ্যা এবং আকার দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে। ড. মুনতাসির

---

১৫৭. Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, ibid, vol. II. pp. 16

১৫৮. *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*(.. : .., 1870), p. 47

১৫৯. K. Bagchi, *The Ganges Delta,* (Calcutta : .., 1944), pp. 18-35

১৬০. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*(ঢাকা : বর্ণায়ন, মার্চ ২০০২), পৃ. ১৬

১৬১. প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, *অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি:, সং. ১৩, আগষ্ট, ১৯৯৭), খ.২, পৃ. ৭-৮

১৬২. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৪), খ.৬, পৃ. ৩৭৯

মামুন নদীগুলোকে মোটামোটি পাঁচভাগে ভাগ করেছেন– (১) গঙ্গা বা পদ্মা এবং এর বদ্বীপ; (২) মেঘনা ও সুরমা প্রবাহ; (৩) ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা; (৪) উত্তরবঙ্গের নদীসমূহ ও (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট সমতলভূমি নদী। ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর নদ-নদীর প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীগুলো হল পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, সুরমা এবং কর্ণফুলি ইত্যাদি।

(১) গঙ্গা (পদ্মার আদিরূপ) : বাংলার নদনদীর মধ্যে গঙ্গাই প্রধান। রাজমহল পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমে তেলিগড় ও সিক্রিগলি সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মই উত্তর ভারত থেকে গঙ্গার বাংলায় প্রবেশ-পথ এবং গিরিবর্ত্ম ছেড়ে রাজমহলকে স্পর্শ করে গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে। সমতল ভূমিতে যাত্রা শুরু করেই গঙ্গার দু'টো প্রধান প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়, একটা পূর্ব-দক্ষিণগামী, নাম পদ্মা; অন্যটা সোজা দক্ষিণমুখী, নাম ভাগীরথী। পদ্মা, বর্তমানে গঙ্গার মূল প্রবাহ, পূর্ব-দক্ষিণগামী হয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং চাঁদপুরের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে জলপ্রবাহ উৎসারিত করছে। জলবিজ্ঞানের (Hydrography) দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগীরথীই গঙ্গার প্রথম ও আদি প্রবাহ বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। টলেমি গঙ্গার পাঁচটা মুখের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সর্বপশ্চিমের মুখ থেকে সর্বপূর্বের দূরত্ব প্রায় চার ডিগ্রি নিরূপণ করেছেন।[১৬৩]

ভাগীরথী ও পদ্মার মুখের দূরত্ব প্রায় তাই। গঙ্গার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দু'টো প্রবাহকেই কৃত্তিবাস (১৪১৫-১৪১৬) ছোট গঙ্গা ও বড় গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও লিপিমালার প্রমাণে গঙ্গা-ভাগীরথীই প্রাচীনতর ও পুণ্যতোয়া নদী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে (১৪৯৫) ভাগীরথীর প্রবাহের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। আদিগঙ্গা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মজে যায়। ভাগীরথীর একটা প্রবাহ যে বারুইপুর, জয়নগর-মজিলপুর, হাতিগড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৬৪] 'আদিগঙ্গা' চলাচলের অযোগ্য হলে নবাব আলীবর্দি বর্তমানের সোজা দক্ষিণমুখী পথটা খুলে দেন বলে কথিত আছে। খুব সম্ভবত আলীবর্দি আদি গঙ্গার চেয়ে পুরনো খাতেই নতুন প্রবাহ পথ সৃষ্টি করেন এবং এ পথই সরস্বতীয় প্রাচীনতর খাতের দক্ষিণাংশ।[১৬৫] বিপ্রদাসের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে সপ্তগ্রামের নিকটে ভাগীরথী থেকে সরস্বতী ও যমুনা প্রবাহ বের হয়ে সাগরে পড়েছে।[১৬৬] পুরাণসমূহের গঙ্গা, ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত দেশসমূহের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।[১৬৭] পদ্মাপুরাণে ত্রিবেণীর নিকটে তিনটা নদীর– গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী-মিলনের কথা বলা আছে।[১৬৮]

আইন-ই আকবরিতেও 'ত্রিবেণী' ও ত্রিধারায় প্রবাহিত সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গার উল্লেখ আছে।[১৬৯] আঠারো শতকে রেনেলের মানচিত্রে বা সতেরো শতকে ফানডেন ব্রোকের মানচিত্রে পদ্মাকেই গঙ্গার মূল প্রবাহ বলে

---

১৬৩. G.E. Gerini. *Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia*, ibid, p. 85

১৬৪. Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, ibid, pp. 16-17

১৬৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

১৬৬. S.Sen, *Manasamangala of Vipradasa*, ibid, p. 142

১৬৭. Dineschandra Sircar, *Studies in the geography of ancient and medieval India*, ibid, p. 70

১৬৮. P.L. Jain, *Padmapurana*, ibid, p. 14

১৬৯. Colonel H.S. Jarrett revised by Sir Jadunath Sarkar, *Ain-i-Akbari of Abul Fazal-i-Allami*, ibid, vol. III, p. 133

মনে হয়; এ সময়ে ভাগীরথীকে বেশ ক্ষীণ দেখানো হয়েছে।[১৭০] পনেরো শতকেও পদ্মাই ছিল গঙ্গার মূল প্রবাহ, তা কৃত্তিবাসের বর্ণনা থেকে এবং বড়গঙ্গা নামকরণ থেকেই বুঝা যায়।[১৭১] ষোল শতকে আবুল ফজলের বর্ণনায়ও পদ্মাকে গঙ্গার প্রবাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (১৩৪৬-১৩৪৭) ইবন বতুতা 'সদকাওয়ান' বন্দরে এসেছিলেন, যার অদূরে গঙ্গা ও যমুনা (যুন) মিলিত হয়েছে।[১৭২] ইবন বতুতার গঙ্গা বর্তমানের পদ্মা এবং 'যুন' বা যমুনা বলে ব্রহ্মপুত্রকে বুঝানো হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামরচিত' কাব্যেও গঙ্গার এ প্রবাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[১৭৩] গঙ্গা নামে যে বর্তমান 'পদ্মার' প্রবাহকেই বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। টলেমি গঙ্গার পাঁচটা প্রবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে গঙ্গার দক্ষিনমুখী ভাগীরথী প্রবাহই অধিক প্রবল ছিল। তবে বর্তমানে পদ্মাই যে অধিক-প্রবল প্রবাহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বহুদিন পূর্ব থেকে যে পদ্মা এরূপ ধারণ করেছে তা অনুমান করা যায় রেনেল, ফানডেক ব্রোক প্রমূখের মানচিত্র থেকে। অন্তত চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই এর এ প্রবল রূপ ছিল তা ইবন বতুতা, দ্যা ব্যারোস ও আবুল ফজল প্রমূখের বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়।[১৭৪] মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা ও তিস্তা এমনি পদ্মার শাখা নদী।

রেনেলের জরিপকালে (১৭৬৪-১৭৭৭) পদ্মা জাফরগঞ্জের কাছে আত্রেয়ী ও করতোয়ার মিলিত স্রোত এবং যমুনার সঙ্গে মিলিত হত এবং দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে শাহবাজপুরের দ্বীপের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সাগরের দিকে প্রবাহিত হত। ফানডেন ব্রোকের মানচিত্রে (১৬৬০) পদ্মার স্রোতকে ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জের পশ্চিমে দেখানো হয়েছে। তখন গড়াই-মধুমতি প্রবাহই পদ্মার প্রধান প্রবাহ ছিল। শতাব্দীকাল পূর্বে দ্যা ব্যরোসের নকসা অনুসারে পদ্মার প্রবাহ রামপুর ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার খাত ধরে ঢাকা পার হয়ে মেঘনায় গিয়ে মিশত। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যেও যমুনার ভাগীরথী থেকে নির্গত হওয়ার উল্লেখ আছে।[১৭৫]

(২) ব্রহ্মপুত্র : বাংলার নদীসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র, দেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তিব্বতের মানস সরোবরে এর উৎপত্তি, প্রথমে মোটামুটি পূর্বগামী এবং দক্ষিণ দিকে বাঁক দিয়ে আসামে প্রবেশ করেছে। আসামের ভিতর দিয়ে গতিপথ কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমগামী এবং রংপুর ও কুচবিহারের সীমান্ত দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে। বাংলা পর্যন্ত পৌঁছতে ব্রহ্মপুত্রকে (প্রাচীন নাম লৌহিত্য) প্রায় ১৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র বেশ কয়েকবার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান যমুনা-পদ্মার পথে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে।[১৭৬] সতেরো শতকের পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ ঢাকা জিলায় পৌঁছার পূর্বেই ভৈরব বাজারের নিকট উত্তর দিক থেকে আগত সুরমা-

---

১৭০. রেনেন লিখেছেন, 'The proper name of this river (The Ganges) in the language of Hindoostan(or Indoostan) is padda. It is also called. Baragang or the Great River.' see. *Memoirs of a Map of Hindoostan*, ibid, p. 155

১৭১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

১৭২. H.A.R. Gibb, *Travels of Ibn Batuta in Asia and Africa*, ibid, p. 75

১৭৩. L.C. Majumdar, R. G. Basak & N. G. Banerji (ed.), *Ramacarita*, ibid, verses III-10 & II-11

১৭৪. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*(ঢাকা : বর্ণায়ন, মার্চ ২০০২), পৃ. ১৯

১৭৫. C. Chakravarti (ed.) *Pavanaduta*, ibid, verse 23

১৭৬. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

মেঘনা জলধারার সাথে মিশেছে। ভৈরববাজার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এ ধারাকেই রেনেলের মানচিত্রে মেঘনা বলেই দেখানো হয়েছে। রেনেল পরবর্তী ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন সময়ে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ হয়েছে বর্তমানের যমুনা যা ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা প্রবাহে এনে ফেলেছে।[১৭৭] ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদের নিকট হতে উৎপন্ন হয়েছে। তিব্বতে এটা 'সানপু' এবং আসামের ডিহং-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মাজহিয়ালী নামক স্থানে এটা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ অংশে এটা ব্রহ্মপুত্র নদ নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্র যে স্থানে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তার কিছু পরেই ডানদিক হতে তিস্তা নদী এসে এর সাথে মিলিত হয়েছে। আরও কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে এটা দু'টো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এর প্রধান শাখাটা জামালপুর ও ময়মনসিংহ জিলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এটা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। অন্য শাখাটার নাম যমুনা। এটা দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই প্রভৃতি যমুনার প্রধান শাখানদী। পুরাতন কালে যমুনা নদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। ঐ সময় যমুনার গতিপথে 'জেনাই' নামে ব্রহ্মপুত্রের একটা শাখা নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হত। ১৭৮৭ সালে উত্তর বঙ্গের তিস্তায় এক প্রবল বন্যা হয় এবং বন্যার অতিরিক্ত পানি বেঁকে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে জেনাই'র উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণে অগ্রসর হয়। ফলে ক্ষুদ্র শাখা নদী জেনাই সম্প্রসারিত হয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করে। এটাই বর্তমানে যমুনা নদী।

(৩) পদ্মা : পদ্মা নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা নামে সমভূমিতে প্রবেশ করেছে। এখান হতে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জিলায় গিয়েছে। সেখানে এটা ভাগীরথী (বা হুগলি নদী) ও পদ্মা নামে দু'টো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। পদ্মা নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রথমে এটা বৃহত্তর রাজশাহী জিলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত হতে কুষ্টিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ১৪৪ কি. মি. (৯০ মাইল) ভারত ও বাংলাদেশের সীমা নির্ধারণ করেছে। অতঃপর এটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে রাজবাড়ী জিলার গোয়ালন্দের নিকট যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পদ্মা নদীর শাখানদীগুলোর মধ্যে মাথাভাঙ্গা, ইছামতি, কুমার, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি প্রধান। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত এ পদ্মা নদী এর উপনদী ও শাখা-প্রশাখা মিলিতভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। একে বাংলাদেশের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বলা হয়। পলল দ্বারা গঠিত এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩১,০৮০ বর্গ কি.মি.।

(৪) মেঘনা : বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী প্রবাহ মেঘনা, তবে এটা গঙ্গা-পদ্মা বা ব্রহ্মপুত্রের তুলনায় ছোট। এ নদী শিলং মালভূমি ও সিলেট অঞ্চলের জলসম্ভারকে নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। খাসিয়া-জয়ন্তিয়া শৈলমালা থেকে মেঘনার উদ্ভব, উত্তর প্রবাহে এর নাম সুরমা। সুরমার প্রাথমিক গতি পশ্চিমাভিমুখে, মাকুলির নিকটে দক্ষিণ গতি ধারণ করে সুরমা পরিচিত হয় মেঘনা নামে। সিলেট জিলা পার হয়ে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের পূর্বসীমা স্পর্শ করে আজমিরিগঞ্জ বাম তীরে রেখে ভৈরব বাজারের নিকট

---

১৭৭. *Epigraphia Indica* , XXXVI, 1923-24, pp. 189-190

ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে তা মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি গঙ্গার অন্যতম মুখের নাম করেছেন 'মেঘা' (Mega=Megna=great) এবং এ 'মেগা' বা 'মেঘনা' থেকেই 'মেঘনা' নামের উৎপত্তি বলে নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেছেন।[১৭৮] রেনেলের মানচিত্রে মেঘনার যে প্রবাহ দেখানো হয়েছে তা খুব একটা বদলায়নি। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইবন বতুতা সোনারগাঁ থেকে সিলেট যাওয়ার সময়ে এ নদী পথেই ভ্রমণ করেছিলেন। আসামের 'বরাক' নদী নাগা মণিপুর পাহাড়ের দক্ষিণ হতে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জিলায় প্রবেশ করেছে। এ স্থানে এটা সুরমা ও কুশিয়ারা নামক দু'টো শাখায় বিভক্ত। উত্তরে সুরমা নামক শাখাটা খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছাতক ও সুনামগঞ্জের নিকট দিয়ে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে হবিগঞ্জ জিলার উত্তর সীমানায় পৌঁছে এবং সেখানে পূর্ব দিক হতে আগত কুশিয়ারার সাথে মিলিত হয়।

সুতরাং সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত স্রোতধারাই মেঘনা নদী। মেঘনা ভৈরব বাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে যুক্ত হয়েছে। পরে এ মিলিত স্রোত দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। পরে এ নদী আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাউলাই, তিতাস ও গোমতি প্রভৃতি মেঘনার উল্লেখযোগ্য উপনদী।

(৫) তিস্তা : দেশের অভ্যন্তরে আরও বেশ কয়েকটা নদীর অস্তিত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে তিস্তা অন্যতম। ভুটান সীমান্তের উত্তর হিমালয় হতে উৎসারিত হয়ে দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির ভিতর দিয়ে এটা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। জলপাইগুড়ি থেকেই তিস্তার তিনটা দক্ষিণবাহী প্রবাহ– পূর্ব স্রোতের নাম করতোয়া, মধ্যবর্তী স্রোতধারা আত্রাই এবং পশ্চিম স্রোত পূর্ণভবা বা পুনর্ভবা। রেনেলের মানচিত্রে তিস্তার এ তিনটা স্রোতই দেখানো হয়েছে। তিন স্রোত প্রবাহিত বলেই এর নাম সম্ভবত ত্রিস্রোতা-তিস্তা।[১৭৯] রেনেলের মানচিত্রে 'তিস্তা সি' (Tista C) নামে একটা ক্ষীণ প্রবাহ দেখানো হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের অল্প দক্ষিণে তিস্তা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী স্রোত রংপুরের ভিরত দিয়ে কালিগঞ্জের নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। বর্তমানে তিস্তা এ খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে।[১৮০]

(৬) করতোয়া : দেশের সুপ্রাচীন তীর্থ মহিমা খ্যাত পুণ্যতোয়া নদী করতোয়া। বর্তমানে এর প্রবাহ ক্ষীণ, মৃতপ্রায়। ফানডেন ব্রোকের নকশায় করতোয়ার বিশাল প্রবাহ দেখানো হয়েছে। মির্যা নাথান ঘোড়াঘাটের নিকটে করতোয়ার উল্লেখ করেছেন। 'বর্ষাকালে এ নদী অনতিক্রমনীয়।[১৮১] রামরচিত কাব্যে করতোয়া বরেন্দ্রের পূর্বসীমা বলে উল্লিখিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক ভ্রমনকারী হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরুপ যাবার পথে যে বড় নদী পার হয়েছিলেন তা করতোয়া বলেই অনুমান করা হয়।[১৮২] ১১০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রচিত 'করতোয়া মাহাত্ম্য' গ্রন্থে করতোয়ার বিপুল প্রবাহ এবং তীর্থ মহিমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[১৮৩] মহাভারতে 'পুণ্যা করতোয়া'র পবিত্রতার পরিচয় রয়েছে।[১৮৪]

---

১৭৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
১৭৯. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০
১৮০. W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*(London : 1876), vol. VII, p. 165
১৮১. M. I. Borah (ed)*Baharistan-i-Ghaybi*, ibid, p. 53
১৮২. Thomas Watters, *On YuangChwang's Travels in India*, ibid, vol. II, pp. 185-187
১৮৩. P.C. Sen, *Karatoya-mahatmya*(Rajshahi : V.R.S. Monograph No.2.), p. 57
১৮৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

(৭) পুনর্ভবা : দেশের অন্য একটা নদী পুনর্ভবা। তার বর্তমান রূপ করতোয়ার মতই ক্ষীণ। ১৭৮৭-র বন্যায় তিস্তা গতি পরিবর্তন করায় হিমালয় থেকে আগত জলরাশি আর করতোয়া, আত্রাই এবং পুনর্ভবা পেত না; তাই হয়ত এরা এখন মৃতপ্রায়।[১৮৫]

(৮) কর্ণফুলী : কর্ণফুলী নদী আসামের লুসাই পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম জিলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এটা রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের প্রধান নদী।

(৯) আত্রাই : ভারতের শিলিগুড়ির বৈকণ্ঠপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নেমে আসা আত্রাই নদী বাংলাদেশের দিনাজপুর জিলায় প্রবেশ করেছে। এ জিলায় কিছুটা পথ চলার পর আবার পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জিলায় ঢুকে পড়েছে। সেখানে এর গতিপথ ৩২ কি.মি.। অতঃপর বাংলাদেশে প্রবেশ করে বরেন্দ্র অঞ্চল হয়ে চলনবিলে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। এর সর্বমোট গতিপথ ৩৯০ কি.মি.।

(৬) সাংগু : বাংলাদেশ ও মায়ানমার এর সীমানায় অবস্থিত আরাকান পর্বত হতে সাংগু নদীর উৎপত্তি হয়েছে। এ নদী চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জিলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৪ কিলোমিটার।

(৭) মাতামুহুরি : এটা লামার মইভার পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে লামা থানার ভিতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে কক্সবাজার জেলার উত্তরে চাকোরিয়ার নিকট দিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কি.মি.।

(৮) হালদা : হালদা নদী খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বত শৃঙ্গে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।

(৯) নাফ : বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ সীমা বরাবর যে নদী প্রবাহিত হয়েছে তার নাম নাফ নদী। এর দৈর্ঘ্য ৫৬ কি.মি.। মায়ানমার ও টেকনাফের সীমা নির্দেশ করে এ নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এছাড়াও আছে অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী। যা সারা দেশে জালের মত বিছিয়ে আছে। যেমন– সুরমা, গোমতী, মাথাভাঙ্গা, ধলেশ্বরী, গড়াই, ভৈরব, আড়িয়াল খাঁ, মহানন্দা, কপোতাক্ষ, করতোয়া, ধরলা, হালদা, নাগর, কুলিখ, চিত্রা, বংশী, নবগঙ্গা, কুমার ইত্যাদি। প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন লেখনীতে গঙ্গার অববাহিকায় যে 'গঙ্গারিডাই' রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা 'গঙ্গা-হৃদয়' এর রূপান্তর বলে অনুমান করা হয়েছে।[১৮৬] ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ভুভাগ 'গঙ্গা-হৃদয়' বলে পরিচিত হবে এমন অনুমান খুব অযৌক্তিক নয়। এ গ্রীক লাতিন নাম বাংলার ভূপ্রকৃতিতে নদীর গুরুত্বের কথাই প্রমাণ করে। মূলত নদ-নদীর পরিবর্তন বাংলার মানুষের জীবনযাত্রায় ও সামগ্রিক কার্যকলাপে গভীর প্রভাব রেখেছে। বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের ভৌগোলিক অবস্থিতি অনেকাংশে ভূ-প্রকৃতি এবং বিশেষ করে নদীর স্রোতধারা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এদের ভৌগোলিক পরিমন্ডল প্রাকৃতিক (নদীর) পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।[১৮৭]

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি : ভূ-প্রকৃতি বলতে মাটির গঠন বিন্যাসকে বুঝায়। পৃথিবীর উপরি পৃষ্ঠের নাম ভূপৃষ্ঠ। সাধারণত পৃথিবীর কোন দেশেরই ভূপৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়। কোথাও উঁচু আবার কোথাও নিচু;

---

১৮৫. Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, ibid, p. 30-31

১৮৬. ibid, pp. 36-40

১৮৭. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

আবার কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত সমভূমি; কোথাও সুউচ্চ পাহাড় বা বিস্তৃত পর্বতমালা কিংবা বিশালাকার মালভূমি। ভূপৃষ্ঠের এরূপ উঁচু-উঁচু অবস্থাকে ভূ-প্রকৃতি বলে। ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশ অনন্য। এদেশের ভূখণ্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। পূর্বে সামান্য উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ নদী। এত নদ-নদী বিধৌত ও উর্বর সমতল ভূমি পৃথিবীতে বিরল। সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ বলে খ্যাত। এ বদ্বীপ অঞ্চলের বেশিরভাগ ভূমিই গড়ে উঠেছে গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র বয়ে নেমে আসা পলি মাটি দ্বারা। শত-শত বছর ধরে জমে উঠা পলিমাটিতে এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন জনপদ। কখনও দু'কুল বেয়ে উপচে পড়েছে বর্ষার বিপুল জলরাশি, কখনও বা নদীপথ সরে গিয়ে জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে, ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে বাংলার ভূ-ভাগ।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাহাড়িয়া অংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র দেশই এসব নদ-নদীর পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি। বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে বেশ কিছুটা প্রাচীন বা পুরাভূমিও বিদ্যমান। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ বা উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতমালা : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ অবস্থিত। দেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১২% এলাকা নিয়ে এটা বিস্তৃত। টারশিয়ারি যুগের শেষ দিকে গিরিজন আলোড়নের ফলে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এসব পাহাড় ভঙ্গিল এবং বেলে পাথর, শেল পাথর ও কাদা দিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : (ক) দক্ষিণ পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে ও (খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পাহাড়সমূহ।

(২) প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ বা উচ্চ সমভূমি অঞ্চল : বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ এলাকা নিয়ে উচ্চ সমভূমি অঞ্চল গঠিত। আনুমানিক ২৫ হাজার বছর পূর্বের সময়কালকে প্লাইস্টোসিন যুগ বলা হয়। এ সময়ে মহাদেশীয় উঁচু ভূভাগের বরফ গলে পলি সঞ্চিত হয়ে এসব উঁচু সমভূমি গঠিত হয়েছিল। এগুলোর গড় উচ্চতা ১০ থেকে ১৮ মিটার। এগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) বরেন্দ্রভূমি; (খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়; এবং (গ) লালমাই পাহাড়।

(৩) বিস্তৃত পলিমাটির সমতলভূমি বা সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি : ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নতুন সৃষ্ট এ নিম্নসমভূমি অঞ্চল। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমি এ অঞ্চলের আওতায় পড়ে। এর আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর গড় উচ্চতা ৯ মিটারের কম। এ অঞ্চল পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী ও এদের অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। বার্ষিক প্লাবনের ফলে বহুস্থানে অগভীর জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো বিল ও হাওড় নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের উপকূল ভাগ অত্যন্ত আঁকাবাকা, ফলে অসংখ্য ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া ও মহেশখালী অন্যতম।[১৮৮] সমভূমি অঞ্চলকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : যথা, (১) পশ্চিম বদ্বীপ সমভূমি যার মধ্যে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের উত্তরাংশ অন্তর্ভুক্ত।

---

১৮৮. ড. এ. কে. এম শওকত আলী খান ও অন্যান্য, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : গ্রন্থ কুঠির, মে ২০১৪), পৃ. ৩১-৩২

(২) পূর্ব বদ্বীপ সমভূমি যার মধ্যে মধ্য ও দক্ষিণ ফরিদপুর এবং বরিশাল অন্তর্ভুক্ত। (৩) ব-দ্বীপ মোহনা বা সুন্দরবন ও দক্ষিণ পশ্চিম বরিশাল। বাংলাদেশের এ অঞ্চলের মাটি খুব উর্বর। ফলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এদেশের ভূখণ্ড উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে অবস্থিত।

বাংলাদেশের মৃত্তিকা : ভূ-ত্বকের বহিরাবরণের সূক্ষ্ম পদার্থের শিথিল কোমল স্তরকে মৃত্তিকা বলে। মৃত্তিকা শিলা হতে উৎপন্ন হয়। খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি, বায়ু ইত্যাদির মিশ্রণে মৃত্তিকা গঠিত। ভূ-ত্বকের শিলাস্তরগুলো সূর্যতাপ, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ, তুষার প্রভৃতির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সূক্ষ্ম শিলাকণায় পরিণত হয়। এ শিলাকণাই জৈবিক পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।[১৮৯]

মৃত্তিকার উৎপত্তি : প্রধানত চারটা কারণে শিলা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। যথা- যান্ত্রিক, রাসায়নিক, জৈবিক ও নৈসর্গিক ক্রিয়ার প্রভাব।

মৃত্তিকার স্তর : ভূ-পৃষ্ট হতে ভূ-অভ্যন্তরের দিকের মাটি পরীক্ষা করলে মৃত্তিকার স্তর দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকায় বিভিন্ন ধরণের স্তর থাকে। তবে ভূ-পৃষ্টের উপরিভাগে প্রধানত তিনটা স্তর থাকে। যেমন, ক স্তর, খ স্তর এবং গ স্তর। বাংলাদেশের মাটি ক ও খ স্তরের অন্তর্ভূক্ত।

মৃত্তিকার উপাদান : মৃত্তিকা শিলা হতে উৎপন্ন হয়। খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি, বায়ু ইত্যাদির মিশ্রণে মৃত্তিকা গঠিত। তবে মৃত্তিকায় বেশির ভাগ অংশই খনিজ পদার্থের সমষ্টি। খনিজ পদার্থগুলোর মধ্যে সিলিকন, লৌহ, এলুমনিয়াম ও অক্সিজেন প্রধান। এ রাসায়নিক উপাদানগুলো ধাতব পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকার অধিকাংশ অংশ গঠন করে।

মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ : কতিপয় প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে এর রূপ দেখানো হলো–

(১) বিন্যাস প্রণালী, (২) গঠণ প্রণালী, (৩) পানি ধারণ ক্ষমতা, (৪) তাপমাত্রা এবং (৫) বর্ণ অনুসারে মৃত্তিকাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

মৃত্তিকা ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়েছে। উপরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মৃত্তিকা সাধারণত তিন পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন,

(ক) আঞ্চলিক (Zonal) (খ) আন্তঃআঞ্চলিক (Interzonal) ও (গ) অ-আঞ্চলিক (Azonal)। আমাদের মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেখা যায় দেশের মৃত্তিকা অ-আঞ্চলিক (Azonal)।

বিজ্ঞানীদের মতে মৃত্তিকার শ্রেণিবিভাগ[১৯০] **:** বাংলাদেশের মৃত্তিকাকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। সর্বপ্রথম রুশ মৃত্তিকা বিজ্ঞান Sokalsky ১৯৩২ সালে বাংলাদেশের মৃত্তিকার শ্রেণিবিন্যাস দেখান। তিনি মৃত্তিকাকে তৃণবহুল, ল্যাটেরাইট, পুরাতন পাললিক শ্রেণিতে ভাগ করেন। এরপর ভারতের কয়েকজন বিজ্ঞানী এ দেশের মৃত্তিকার আঞ্চলিক শ্রেণি বিন্যাসের চেষ্টা করেন। তবে ১৯৬৯ সালে জে. ব্রামার বাংলাদেশের মৃত্তিকাকে মোটামুটি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে সক্ষম হন। আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে তাই শুধু শ্রেণিবিভাগগুলো দেখানো হলো। তিনি মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য,

---

১৮৯. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, *অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৯৭), খ.২, পৃ. ৭-৮

১৯০. প্রাগুক্ত।

গুণাগুণ এবং আদি শিলার উপর ভিত্তি করে মাটিকে সর্বমোট ১৭ টা শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এ শ্রেণিবিন্যাস আবার '(ক) সমতল, (খ) ভূমি চত্বর এবং (গ) পাহাড়িয়া' এ তিন ধরনের ভূমির উপর বিন্যস্ত।

বাংলাদেশের সমাজ ও জনগণের উপর এর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব : দেশ ও জনগণের উপরে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। মানুষের সংস্কৃতি পরিবেশের সৃষ্টি। ভূ-প্রকৃতি, অরণ্য, নদ-নদী, পাহাড়-সাগর, জলবায়ু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভূখণ্ডের বিশেষ অবস্থানের জন্য জলবায়ুর তারতম্য ঘটে, জলবায়ুর তারতম্যের কারণে মানুষের খাদ্যাভ্যাস পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ভৌগোলিক কারণে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ভিন্নতর হয়। ভূমিকম্প, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, নদ-নদীর গতি পরিবর্তন মানুষের সভ্যতার পরিবর্তন ঘটায় বিপর্যস্ত করে; নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতেও সাহায্য করে। পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর মানসিকতা তৈরি হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে।

পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে নদী, নৌকা, সবুজ গাছগাছালি আর দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্যণীয়–

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এর জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আদ্র ও সমভাবাপন্ন। এটা দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। গঠনগত দিক থেকে বাংলাদেশ টারশিয়ারি ও প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চ ভূমি ও পাহাড় এবং নদী বিধৌত পলি মাটি দ্বারা গঠিত প্লাবন সমভূমির সমন্বয়ে গঠিত। এটা একটা নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ছোট-বড় অসংখ্য নদী প্রবাহমান। বাংলাদেশ একটা ক্রান্তীয় অঞ্চল। বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের জন জীবনে নদ-নদীর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত দ্বার। নৌ যোগাযোগের সুবিধার কারণে সু-প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ ভূ-রাজনৈতিক দিক যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভকারী বাংলাদেশ ১৪৭৫৭০ বর্গ.কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট এবং প্রায় ১৬ কোটি নাগরিকের একটা দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ নাগরিক ধর্মপ্রাণ মুসলিম ও শতকরা ৭১ ভাগ নাগরিক শিক্ষিত। ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ, ৬৪ টি জেলার সমন্বয়ে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ও এর নাগরিকের উপর দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
দেশ ও জনগোষ্ঠীর পরিচয়

বাঙালি জাতি এবং যে ভূখণ্ড নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত তার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। বর্তমানে যে ভূখণ্ডকে বাংলাদেশ হিসেবে অভিহিত করা হয় তা এক সময় একক কোন দেশ ছিল না। ঐতিহাসিককাল থেকেই বাংলা অঞ্চল বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অঞ্চলের ছিল আলাদা নাম ও শাসন কাঠামো। ব্রিটিশ আমলে এ সকল জনপদ নিয়ে গঠিত হয় বাংলা প্রদেশ (Bengal Presidency)। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে প্রদেশটা পূর্ববাংলা ও আসাম এবং বাংলা প্রদেশ নামে দু'টো আলাদা প্রদেশে বিভক্ত হয়। অবশ্য ১৯১১ সালে তা রদ করে পুনরায় একটা প্রদেশে পরিণত করা হয়। বর্তমানে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের পূর্ববাংলা অঞ্চলটা বাংলাদেশ নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পশ্চিম বাংলা ভারতে থেকে যায়। বর্তমানে তা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নামে পরিচিত। আর পূর্ববাংলার সাথে সিলেট অঞ্চল যুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে এ অঞ্চলটা স্বাধীন হয়ে বর্তমান বাংলাদেশ গঠিত হয়। ফলে বর্তমান বাংলাদেশের বাইরে ও এর আশেপাশের একটা ব্যাপক এলাকার লোক বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এবং বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ২২ কোটির অধিক লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।[১৯১] এর ফলে বাংলা ভাষাভাষী লোকজনের বিস্তৃতি অন্যান্য প্রদেশেও রয়ে যায়। নরগোষ্ঠীগত দিক থেকে বাংলাদেশের লোকজন মিশ্র নরগোষ্ঠীর বলে নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন এবং এর স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থিত করেন। ভাষার ক্ষেত্রে বাংলাকে প্রধান ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বলে পণ্ডিতরা মত দেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদেশের প্রধান দুই জাতি হিন্দু ও মুসলিমদের সংস্কৃতি প্রায় অন্তঃপ্রবিষ্ট ও উদার চরিত্রের। বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক ঐতিহাসিক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

দেশ ও জনগোষ্ঠীর পরিচয়

নৃতাত্ত্বিক গঠন (Ethnic Composition) : একটা এলাকার মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার নৃতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে। নরগোষ্ঠীগত শুদ্ধতা ও মিশ্রতা সে জাতির ইতিহাসের অংশ। নৃতাত্ত্বিক গঠন বা নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য হল একজন মানুষের তথা জাতির বাহ্যিক দৈহিক অবয়ব। বিশ্বের মানুষগুলোকে তাদের দৈহিক গঠন বিবেচনায় কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে যার প্রতিটা ভাগকে বলা হয় নরগোষ্ঠী বা নৃগোষ্ঠী বা Race।[১৯২] E. B. Tylor তার 'Dictionary of Anthropology' গ্রন্থে বলেন, 'নৃগোষ্ঠী হচ্ছে মানব জাতির একটা প্রধান বিভাগ যার রয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায় এমন নির্দিষ্ট দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি। এ দৈহিক বৈশিষ্ট্য মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে।' পূর্ব পুরুষের শারীরিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য তার পরবর্তী বংশের মধ্যে বর্তিয়ে থাকে। যেমন, স্বামী-স্ত্রী যদি দু'জনই নিগ্রো জনগোষ্ঠীর হয় তবে তাদের সন্তানরাও নিগ্রোদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মলাভ করে থাকে। আবার স্বামী-স্ত্রী যদি দু'টো ভিন্ন

---

১৯১. ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

নরগোষ্ঠীর সদস্য হয় তবে সন্তানরা তাদের উভয়ের তথা মিশ্র বৈশিষ্ট্য লাভ করবে। অনেকেই নরগোষ্ঠীকে জাতির সাথে একীভূত করে আলোচনা করতে চান। কিন্তু নরগোষ্ঠী শব্দটা জাতি বা জাতিসত্ত্বা শব্দ থেকে আলাদা। জাতি যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Nation' আর জাতিসত্তা যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Nationhood'। 'Nation' শব্দটা ল্যাটিন শব্দ 'Natus' এবং 'Natio' শব্দদ্বয় থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হল জন্ম। জন্মের সূত্র রক্তের ধারার মধ্যেই নিহিত। সে অর্থে জাতি হচ্ছে জন্মসূত্রে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি। পরবর্তী এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভাষা, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং মানসিক বা ভাবগত ঐক্যানুভূতি। এসব মিলিয়ে একটা জনপদ যে সত্তায় ভূষিত হয় তা-ই তার জাতিসত্ত্বা। ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য বিবেচনায় বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠন সংকর।

মানব জাতির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নৃগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ করা হয় সেগুলো হল মাথার গড়ন, মুখাকৃতি, গায়ে লোমের পরিমাণ, ঠোঁট ও নাকের গড়ন, দেহের উচ্চতা, ওজন, দাড়ি ও চুলের রং, ঘনত্ব ও গড়ন প্রকৃতি, চামড়ার রং, চোখের মণির রং ও আকৃতি, কান ইত্যাদি। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(১) ককেশয়েড বা শ্বেতকায় (Caucasoid), (২) মঙ্গোলয়েড বা বাদামী বা মঙ্গোলীয় (Mongoloid), (৩) নিগ্রোয়েড বা কৃষ্ণকায় (Negroid) এবং (৪) অস্ট্রালয়েড বা আদি অস্ট্রেলীয় (Australoid)।

বাংলাদেশের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (Ethnic Identity of Bangadeshi Peoples) : বাংলাদেশের মানুষের বাহ্যিক দৈহিক আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় কোন বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায় না। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের কাউকে দেখে মনে হয় সে যেন ককেশয়েড, কাউকে নিগ্রোয়েড, কাউকে মঙ্গোলয়েড, কাউকে অস্ট্রালয়েড আবার কাউকে এদের কোনটার মধ্যেই ফেলা যায় না। ফলে বাঙালি একক কোন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত হল, বাঙালি একটা শংকর জাতিগোষ্ঠী। বিভিন্ন ধারার ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে আজকের বাঙালি জাতি। বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের পিছনে মুখ্য কারণ হল জৈবিক। এছাড়া সামান্য কিছু ভৌগোলিক কারণও দায়ি।[১৯৩]

প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী যেহেতু এ এলাকার মানুষের কোন জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া যায়নি তাই এ দেশে মানুষের বসতি কখন শুরু হয় তা জানার কোন উপায় নেই। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদিম মানব সভ্যতার যেরূপ বিবর্তন ঘটেছিল ধরে নেয়া যেতে পারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সে রকমটা ঘটেছে। বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল নৃতাত্ত্বিক রক্তধারা এসে মিশেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো : বাংলায় আগত জনগোষ্ঠীকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) প্রাক-আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী এবং (খ) আর্য নরগোষ্ঠী।

মূলত বাঙালি কোন বিশুদ্ধ নৃগোষ্ঠীগত জাতি নয়। বাঙালি জাতি গঠনে নানা ধরনের নরগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। অস্ট্রেলীয়রাই (অস্ট্রিক) হচ্ছে এদেশের প্রথম জনগোষ্ঠী। কারও কারও মতে, নিগ্রোটোদের হটিয়ে অস্ট্রিকরা এদেশে বসবাস শুরু করে। এরপর দ্রাবিড়রা এদেশে আগমন করে। সভ্যতায় উন্নত বলে এরা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। ঐতিহাসিকদের মতে, দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকরা মিলে বর্তমান বাঙালি জাতির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ।

---

১৯৩. ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

তারপর প্রায় এখন থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে আর্যদের দাপট পরিলক্ষিত হয়। আর্যরা এদেশের আদিবাসী অনার্যদের পদানত করে এবং এদেশে বর্ণাশ্রম প্রথার সৃষ্টি করে। বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর পরে আসে শক জাতির লোক পারস্য ও তুর্কিস্থান থেকে। তাদের রক্ত মিশ্রিত হয় এ দেশে বসবাসরত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আলপাইনীয় আর্যদের রক্তের সঙ্গে। এ ছাড়াও এতদাঞ্চলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক, শাসক ও যাযাবর গোষ্ঠী যেমন– তুর্কি, আরব, আফগান, আবিসিনীয়, ইরানি, মধ্য এশিয়ার মোগল ইত্যাদি জাতির আগমন ঘটেছে। তাদেরও রক্ত এদের রক্তের সাথে মিশেছে। ফলে বাঙালি হচ্ছে একটি শংকর জাতি। বর্ণ-শংকরতা বাঙালিদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : রিজলে তার 'Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে বাঙালিদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, 'এদের অধিকাংশের মাথা গোল, নাক মধ্যমাকৃতির থেকে চওড়া, উচ্চতা মাঝারি।' ড. মুনতাসির মামুন তার রচিত 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' গ্রন্থে রিজলেকে সমর্থন করে বলেন, বাঙালির আকার মাঝারি, তবে ঝোঁক কিছুটা খাটোর দিকে, চুল কালো চোখের মণি হালকা থেকে ঘন বাদামী, গায়ের রঙও ঐ রকম, মুখ সাধারণত লম্বাটে, নাক মাঝারি। তিনি বলেন, আদি অস্ট্রিলীয়দের দীর্ঘ মুণ্ড, প্রশস্ত নাক, মেলানিডদের দীর্ঘ ও মাঝারি নাক এবং দীর্ঘ মুণ্ডাল ও অ্যালপাইনদের উন্নত নাক ও গোল মুণ্ডর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বাংলার জনসমষ্টি।[১৯৪]

তবে অন্যান্য লেখক বাঙালিদের মধ্যে নিগ্রোবটু বা খর্বকায় লোকও লক্ষ্য করেছেন। বাঙালিদের গায়ের রং শ্যামলা, কালো ও কিছুটা পীত। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এবং পার্বত্য অঞ্চলে যেসব এথনিক সম্প্রদায় বাস করে তাদের মাথাও গোল। রিজলে এ থেকে অনুমান করেন যে বাঙালি নৃগোষ্ঠীতে মঙ্গোল প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। তবে তিনি তাদের গায়ের রং, নাকের গঠন, মুখে দাড়িগোঁফের প্রাচুর্য ও চোখের গড়ন দেখে মত দিয়েছেন যে এদের মধ্যে দ্রাবিড় প্রভাবও বর্তমান। তার কথামত বাঙালিরা মঙ্গোল-দ্রাবিড় প্রভাবিত এক শংকর জনগোষ্ঠী। উপরের আলোচনা থেকে বর্তমান বাঙালিদের মধ্যে যে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় তাহলো–

(১) বাঙালিরা আকারে খাটো থেকে মাঝারি; (২) এদের মাথার চুল অধিকাংশের কালো, কিছু বাদামী; (৩) চুল সোজা, তরঙ্গায়িত ও কুঞ্চিত; (৪) গায়ের রং কালো থেকে হালকা বাদামী; (৫) চোখের মণি কালো ও বাদামী; (৬) এদের গড়ন সম্পূর্ণ লম্বাও নয় আবার গোলও নয়; (৭) মধ্যম আকৃতির নাক ও (৮) এ এবং বি গ্রুপের রক্তের প্রাধান্য। তবে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিলনের ফলে বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দাঁড় করানো যায় না। অর্থাৎ কোন একক বৈশিষ্ট্য দ্বারা বাঙালিকে সনাক্ত করা অসম্ভব। কারণ একই ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক মিশ্রণের ফলে বাঙালি চরিত্রের মধ্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান। বাঙালির ভাষা, খাদ্যভ্যাস, সংস্কৃতি আচার আচরণের মধ্যে তা ফুটে উঠেছে।

বাংলা ভাষা : ভাব প্রকাশের বাহন হল ভাষা। মানুষ তার ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে অর্থপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করে তা-ই ভাষা। অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের পার্থক্য হল মানুষ তার মনের ভাব সাংকেতিক ধ্বনি ও অর্থবোধক ধ্বনির মাধ্যমে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। আর এ ভাব প্রকাশের রীতি আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতিবান মানুষের এ ভাষার ব্যবহার একদিনের নয়। বলা হয় পৃথিবীতে প্রায় আড়াই হাজার ভাষা আছে। তবে সেগুলো মাত্র কয়েকটা মূল ভাষার শাখা। যার মধ্যে

---

১৯৪. ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা অন্যতম। এ ভাষার দীর্ঘ বিবর্তনের ফল এ বাংলা ভাষা। মূলত বাংলা ভাষা বহু ভাষার মিশ্রণে এবং বহু বিবর্তনের একটা ভাষা। এ বিবর্তনের জন্য যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা দায়ি তেমনি দায়ি এর অধিবাসীদের বহু বর্ণের ও মিশ্রণের ফল।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'মনুষ্যজাতি যে সব প্রচলিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলে।'[১৯৫] মুহম্মদ আব্দুল হাই বলেন, 'এক এক সমাজের সকল মানুষের উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা।' ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, 'মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে সমাজভুক্ত জনগণের বোধগম্য যে সমস্ত ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি উচ্চারণ করে সে সমস্ত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে।'[১৯৬] ভাষার দু'টো রূপ– কথ্য ও লেখ্য। আর লেখ্য রূপের জন্য প্রয়োজন বর্ণমালার। বাংলার পণ্ডিতরা ধারণা করেন বাংলা লিপি এসেছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন বাংলা ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে। কিন্তু প্রকৃত কথা হল বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য থাকলেও উভয়ে একই ভাষাগোষ্ঠী থেকে আসায় মিল আছে। সংস্কৃত ছিল তৎকালীন শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণির মানুষের ভাষা। সাধারণ মানুষ প্রাকৃত ভাষায় কথা বলত। বাংলার জন্ম প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ থেকে। জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতিকুমারের মতে, মাগধি প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে এবং ড. শহীদুল্লাহর মতে, গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

বাংলা ভাষার বিবর্তন ধারা : বাংলা একটা আধুনিক ও সমৃদ্ধ ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৩৫ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। একটা আধুনিক ভাষা হলেও এটা প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত একটা ভাষা। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, খ্রিস্টপূর্ব প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এ মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীতে এ মূল ভাষা থেকে বহু ভাষার উদ্ভব হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে ইউরোপের মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রচলিত ভাষার নাম ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। এ ভাষা গোষ্ঠী দু'টো বর্গে বিভক্ত ছিল। একটাকে বলা হত 'কেন্তম' আর অন্যটাকে বলা হত 'শতম'। শতম গোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মাইনরের দিকে এসে বিভিন্ন ভাষার জন্ম দেয়। তন্মধ্যে একটা অন্যতম ভাষা গোষ্ঠী হল আর্য ভাষাগোষ্ঠী। মনে করা হয় আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আর্যভাষা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এ ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ভাষা হল ভারতীয় আর্যভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হয়। ভারতীয় আর্য ভাষার আবার তিনটা স্তর লক্ষ্যণীয়। যথা,

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা : জন্মকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১২০০অব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় বেদ (ঋগ্বেদ) রচিত হয়েছে বলে একে বৈদিক ভাষাও বলে। সংস্কৃত ভাষাও একটা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা।

(খ) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা : খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষা বিকশিত হয়। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

---

১৯৫. ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা : ১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ ভাষা গোষ্ঠী বিকাশ লাভ করে। বাংলা, হিন্দি, মারাঠি অসমিয়া প্রভৃতি নব্য ভারতীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, আর্যরা এদেশে আগমনের ফলে ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার একটা রূপ হল সংস্কৃত ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৫০০ অব্দে এ ভাষায় 'পাণিনির' ব্যাকরণ রচিত হয়। এ ভাষার লিখিত রূপ সংস্কৃত হিসেবে সংরক্ষিত হলেও কথ্য রূপ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ লাভ করে। অঞ্চলভিত্তিক এটা প্রাকৃত ভাষা হিসেবে পরিচিতি পায়। প্রাকৃত ভাষা মগধে মাগধি প্রাকৃত এবং গৌড়ে গৌড়ীয় প্রাকৃত নাম ধারণ করে। মাগধি প্রাকৃত থেকে পরবর্তীতে 'অপভ্রংশ' এবং এর পরবর্তী স্তর 'অবহটঠের' মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতি কুমার এ মত পোষণ করেন। তবে ড. শহীদুল্লাহ মনে করেন, গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের নামকরণ

ধারণা করা হয় বাংলা নামের উদ্ভব হয়েছে বঙ্গ থেকে। অনেকে মনে করেন বঙ্গ একটা প্রাচীন জাতির নাম। বঙ্গ নামের উল্লেখ প্রথম 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং জনপদটার প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহ। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' শব্দ যোগ করে বঙ্গাল বা বাংলা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। 'আল' বলতে সীমা বা বাঁধ বুঝায়। অতীতে বঙ্গ প্রধানের পাহাড়ের পাদদেশে তৈরি ১০ হাত উঁচু ও ২০ হাত চওড়া স্তুপকে 'বাংলা' বলা হত। ড. নীহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন, 'উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হতে নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য, উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণি বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভূম, কেওঞ্জর-, য়ুরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এটাই হল প্রাচীন বাংলার সীমানা।

বাংলাদেশের নামকরণ

প্রাচীন যুগে (খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শতক পূর্ব সময় থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক, কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত) অভিন্ন বাংলা এখনকার বাংলাদেশের মত কোন একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হয়ে মুর্শিদাবাদ হতে উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে সংঘবদ্ধ করেন। তারপর হতে বাংলা তিনটা জনপদ নামে পরিচিত হত।[১৯৭] এগুলো হল– পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। বাকি অন্যান্য জনপদগুলো এ তিনটার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। জনপদগুলো প্রাচীন বংলায় প্রথম ভূখণ্ডগত ইউনিট বা প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ভূমিকা পালন করে পরবর্তীতে রাজনৈতিক ঐক্য গঠনে সহায়তা করেছিল। আব্দুল করিম একক বাংলা সম্পর্কে তার রচিত 'বাঙালা ও বাঙালি' গ্রন্থে বলেন, 'মুসলমান বিজয়ের পর বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি। এ সময়ে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ সম্পূর্ণ বাংলা জয় করে একচ্ছত্র সুলতান রূপে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় থেকে তিনি শাহ-ই-বাঙালা, শাহ-ই-বাঙালিয়ন এবং সুলতান-ই-বাঙালা রূপে পরিচিতি লাভ করেন। পর্তুগিজদের কাগজপত্রে বেঙ্গালা (Bengala) এবং ইংজেদের লেখনীতে বেঙ্গল (Bengal) শব্দ ব্যবহার করা হয়। আরও পরে বেঙ্গল থেকে বাংলা এবং বর্তমানে বাংলাদেশ নামটা এসেছে।

বাঙালি জাতীয়তা ও বাংলাদেশী জাতীয়তা : ইতিবাচক সমন্বয় : বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যময়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্থানীয় বাংলাভাষা এবং বাঙালি কৃষ্টি ও লোকাচারের সাথে সুফি-দরবেশদের প্রচারিত উদারপন্থী ইসলাম ধর্মের সংমিশ্রণে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বাঙালিরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য রক্ত দান করেছে, স্বাধীনতার জন্য প্রাণোৎসর্গ

---

১৯৭. ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

করেছে। বাঙালি জাতীয়তাই ছিল তাদের সকল সংগ্রামের প্রেরণাশক্তি। বহু রক্তের বিনিময়ে তারা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার মূলে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই প্রেরণা।

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের নবম অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছিল যে, 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে সে জনগোষ্ঠীর ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।[১৯৮] তবে সংবিধানের এ অনুচ্ছেদের মর্মার্থ অনুযায়ী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী সকল জনগণই 'বাঙালি জাতির' অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। শুধুমাত্র পূর্ববাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী যে জনগোষ্ঠী সংকল্পবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে, সে জনগোষ্ঠীই বাঙালী জাতি। কেননা পৃথিবীর অন্য যেসব এলাকায় বাংলাভাষী জনগণ বাস করেন তাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে হয়নি বা সংগ্রাম করতে হয়নি। বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-এর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং জাতীয়তার রাষ্ট্রিক পরিচয়সূত্রে আমরা বাংলাদেশী। ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিগত ঐক্য এবং অভিন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' ভিত্তি। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' স্থলে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাকে' তাই একটা ইতিবাচক সমন্বয় বলে মনে করা হয়।

বাঙালি বা বাংলাদেশীরা কি একটা জাতি : অভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ জনগোষ্ঠী যখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় এবং রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তিতে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে বা স্বাধীন হয়, তখন সে জনগোষ্ঠীকে জাতি বলে। জাতির এরূপ যেকোন অর্থে বাঙালি বা বাংলাদেশীরাও একটা জাতি। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে অবাঙালি শাসক-শোষকদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে অতীষ্ঠ এদেশের মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই উন্মেষকাল। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয় হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ '৬-দফা কর্মসূচি' ঘোষণা করলে তা বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রাণচাঞ্চল্যের এক অমীয় ধারা সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদী বাঙালি জনগণের একাত্মতাবোধ আরও সুসংহত হয়ে উঠে ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই চূড়ান্ত বিজয়। এ বিজয়কে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম....।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আপামর জনসাধারণ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সুসংগঠিত বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য পাক-হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের তান্ডব নৃত্য শুরু করে। হাজার হাজার বাঙালি শিশু, মহিলা, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক ও

---

১৯৮. ড. আবদুল লতিফ মাসুম, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

বুদ্ধিজীবীর আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে ২৫ মার্চের ভয়াল রাতের অবসান হয়। ২৫ মার্চের মধ্য রাত্রিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তারের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথতলা যা বর্তমান 'মুজিবনগর' নামে পরিচিত সেখানে গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। মাত্র নয় মাসের মধ্যে মুক্তি পাগল বাঙালি জনগণ পাক-হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। বিশ্বের মানচিত্রে প্রস্ফুটিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, একটা স্বাধীন সার্বভৌম রক্তস্নাত লাল গোলাপ। জাতি গঠনের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন তার প্রায় সব কয়টাই বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের প্রায় সকলের মুখের ভাষা বাংলা। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও জীবনব্যবস্থা মোটামুটি এক ও অভিন্ন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিন্নতা আমাদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এ সুসংহত জাতীয় একাত্মতাবোধই আমাদেরকে স্বাধীন হতে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। সুতরাং, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ এবং স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, জাতির যে কোন সংজ্ঞা বা মাপকাঠিতে বাঙালি বা বাংলাদেশীরা একটা জাতি।[১৯৯]

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ একটা অতি প্রাচীন দেশ। ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বের যে অঞ্চলে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়, অতি প্রাচীনকাল থেকে তা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভৌগোলিক অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এ ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর একটা পৃথক সত্তা অনেক পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এ দু'টো উপাদানেরই পরিণত রূপ। বর্তমানে যে এলাকা নিয়ে বাংলাদেশ সে এলাকায় আজ যে জনগোষ্ঠী বসবাস করে, তাদের পূর্বপুরুষগণ যে ভূখণ্ডে রাষ্ট্রসত্তার অধিকারী হন, তাই বাংলাদেশ। অতএব বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আলোচনায় বাংলাদেশ বলতে কেবল সেই রাষ্ট্রসত্তাগুলোকেই বুঝায়, যেগুলো আজকের বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার সবটুকু বা কোন অংশ জুড়ে বিদ্যমান ছিল; আজ যে জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের প্রধান জাতিসত্তা, তাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, সেসব রাজ্য। এ বিচারে বঙ্গ, পুণ্ড্র-বরেন্দ্র, সমতট ও হরিকেল এসব জনপদই অদ্যকার বাংলাদেশের প্রাচীন রূপ।

---

১৯৯. ড. আবদুল লতিফ মাসুম, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাত

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সংবিধানের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সুনাগরিক গঠনে ব্যক্তিগত করণীয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাত

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুনাগরিক গঠনে সুরা আল-হুজুরাতের প্রভাব জানার পূর্বে এদেশের সাধারণ মানুষের গতি-প্রকৃতি, সংস্কৃতি, সমাজে তার অবস্থান, জীবনধারা, মূল্যবোধ, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা জরুরি। মানুষের অতীত ঐতিহ্য, জীবনাচার, তার মনস্তাত্তিক চিন্তাধারা ও মৌলিক কার্যকলাপ সমাজে তার অবস্থান নির্ধারণ করে থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা ও ধর্মীয় অনুভূতির সংমিশ্রণে অনুপ্রাণিত হয়ে একজন মানুষ সাধারণ নাগরিক হতে সুনাগরিকে পরিণত হতে পারে। শুধু আইনের শাসন প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল সম্ভব নয়। যা আলোচ্য গবেষণার কেন্দ্রীয় আলোচনার বিষয়।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

সমাজ প্রত্যয়টা মানব জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। বিখ্যাত দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল বলেছেন, 'Man is social being.' মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধ হয়েই সে বসবাস করে। মানুষ কখনও একা বসবাস করতে পারে না। কারণ একাকীত্ব জীবন ভীতিজনক ও বিরক্তিকর; তাই বলা হয়– Human life and society always go to together. মানুষের সহজাত প্রবণতা হচ্ছে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা। আদিম সাম্যবাদী সমাজ (Primitive Age) থেকে আধুনিক সমাজ (Modern Age) পর্যন্ত প্রত্যেকটা পর্যায়ে কোন না কোনভাবে সমাজবদ্ধভাবে মানব সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। এরিস্টটল আরও বলেছেন, 'A man who is not a member of a society is either an angel or a beast.'[১]

'সমাজ' শব্দটা বাংলা ভাষার শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Society যা ল্যাটিন শব্দ Socious থেকে এসেছে। যার অর্থ– Companionship or Friendship, সঙ্গী, বন্ধু, সাথী, বন্ধুত্ব বা বৃহৎ অর্থে সমাজ। সমাজ বলতে সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বুঝায়। যখন বহুলোক একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে।

সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও প্যাজ 'Society' নামক গ্রন্থে বলেন, 'Societyis a system of usage and procedures of authority and mutual aid of many grouping and division of controls of human behavior and of liberties.'[২]

সমাজ বিজ্ঞানী গিসবার্ট বলেন, 'Society is in general in the complete network of social and nation ship by which every human being interconnected with his fellow men.'[৩] সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, 'The whole system of social relationship.'[৪]

---

১. প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম, *পৌরনীতি ও সুশাসন*(ঢাকা : সোনালী সোপান প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ১

২. এ.এইচ.এম মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকবাল হুসাইন, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*(ঢাকা : এপ্রিল ২০০৭), পৃ. ১০৯

৩. এ.এইচ.এম মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকবাল হুসাইন, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

এলডন এর মতে, 'মনের দিক থেকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিই গড়ে তোলে সমাজ।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বারকার এর মতে, 'By society we mean the whole sum or voluntary bodies or with all their institution.'[৫] সমাজে মানুষ পরস্পর পরস্পরের উপর নিরর্ভশীল। এ নির্ভরশীলতা থেকেই সমাজের সৃষ্টি। সমাজের কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই। জাতীয় পর্যায়ে হতে পারে; বিশ্বব্যাপী হতে পারে। সাধারণত দু'টো বৈশিষ্ট্য থাকলে যে-কোনো জনসমষ্টিকে সমাজ বলা যেতে পারে। যেমন, (ক) বহুলোকের সংঘবদ্ধ বসবাস এবং (খ) ঐ সংঘবদ্ধতার পিছনে কোনও উদ্দেশ্য। এককথায় সামাজিক সম্পর্কযুক্ত একটা সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিই হল সমাজ।

ইসলামি শারি'আতের পরিভাষায় যে সমাজ ব্যবস্থায় সার্বিকভাবে ইসলামি নীতি-আদর্শ ও আইন অনুযায়ী পরিচালিত এবং মানুষের আকিদাহ-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, নৈতিক চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন, আচার-আচরণ, তাহজিব-তামাদ্দুন প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা বিদ্যমান, সে সমাজকে ইসলামি সমাজ বলে।[৬] আল্লামা মুজাহিদ বলেন, 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে সমাজ ব্যবস্থায় ইনসাফ তথা সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্টা লাভ করেছে এবং যার মাধ্যমে জনগণের সামগ্রিক জীবনধারা পরিশুদ্ধরূপে পরিচালিত হতে পারে তা-ই ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা। মাওলানা আবদুর রহীম তার রচিত 'ইসলামের রাজনীতির ভূমিকা' বইয়ে লিখেছেন, 'যে সমাজ ব্যবস্থায় দুনিয়ার সকল মানুষ একই আদমের সন্তানরূপে পরিগণিত হয়, সকলেই সমানভাবে পরস্পরের জাতি ভাই। জাতি-ধর্ম-ভাষা, এলাকা ও সংস্কৃতির ভিন্নতার দরুন মানুষের মৌলিকভাবে বিভক্ত করার নীতি প্রযোজ্য হয় না এরূপ সমাজই ইসলামি সমাজ।[৭] বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইবন খালদুন বলেছেন, একসাথে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের ধর্ম। বর্তমান পৃথিবীতে সর্বোত্তম সমাজব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামি সমাজব্যবস্থা। এটা বিশ্ব মানবতার জন্য আশির্বাদ স্বরূপ।

সংস্কৃতি (Culture) : সংস্কৃতি হল একটা জাতি বা সমাজের দর্পণ। সংস্কৃতি বলতে সাধারণত মানব মনের উৎকর্ষ সাধন পদ্ধতিকে বুঝায়। একটা জাতির আচার-আচরণ, ব্যবহার, ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তার সংস্কৃতি বলে। পরিশীলিত, রুচিসমৃদ্ধ, মার্জিত জীবনবোধ ও জীবনাচারকে সংস্কৃতি বলা হয়। কোন জাতির বিশ্বাস ও চেতনার বহিঃপ্রকাশকেও সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই একটা জাতির ভিতরের সকল কিছু প্রকাশ পায়। মূলত সমাজের মানুষের শৈল্পিক ও বুদ্ধিভিত্তিক প্রকাশই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি হচ্ছে একটা জীবন পদ্ধতি। সংস্কৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ কৃষ্টি বা উৎকর্ষ। শিক্ষা দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, শিল্পকলা-রুচি, শিষ্টাচার, সংস্কার, সংশোধন এবং শুদ্ধিকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান ইত্যাদি। আরবিতে একে বলা হয় حضارة تربية، ثقافة، تهذيب، تمدن, আর

---

৪. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*(ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২য় প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৯), পৃ. ৪২

৫. এ.এইচ. এম মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকবাল হুসাইন, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৬. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. মোঃ আবদুল খালেক, *ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, মে ২০০১), পৃ. ১২৩

৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের রাজনীতির ভূমিকা*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর, ১৯৮৭), পৃ. ১৪৫

ইংরজিতে বলা হয় Culture যার অর্থ হচ্ছে, কর্ষণ করা। অমসৃণ জমিকে যেমন কর্ষণ করে মসৃণ ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা হয়, তেমনি সদাচরণের কর্ষণ ও অনুশীলন দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটা জাতি পরিশীলিত ও সংস্কৃতিবান হয়। এজন্য চাষকৃত জমিকে Cultured Land বলা হয়। তেমনি পরিশীলিত ব্যক্তি বা জাতিকে Cultured man বা Cultured nation বলে।[৮]

সংস্কৃতির সমার্থক শব্দ হলো– education; refinement; cultivation; polishing; discipline; edification. ক্রিয়াবাচক অর্থে হয় to reach, to attain, to grasp, to understand, to perceive etc. ভাষা দু'টোর শব্দগুলো থেকে সংস্কৃতির অর্থ দাঁড়ায়, কৃষ্টি, শিক্ষা, পরিশুদ্ধকরণ, পরিমার্জিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।[৯] তাই বলা যায়, সংস্কৃতি হল– কোন জাতির পরিশীলিত, পরিমার্জিত কার্যকলাপের বহিঃপ্রকাশ। মূলত সভ্য-ভদ্র, সজ্জিত, উন্নত, নন্দিত জীবনকে সংস্কৃতি বলে।

ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালে মেক্সিকো সম্মেলনে সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করা হয়– 'ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি একটা জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত একমাত্র বিষয় নয়। মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অংশ।'[১০] Longman Dictionary বলা হয়েছে, 'Culture is the beliefs, of way life, art and customs that are shared and accepted by people in a particular society.'[১১]

বলা হয়ে থাকে, 'Man is culture building animal.' মানুষ সংস্কৃতি সৃজনকারী প্রাণী। সাহিত্যিকরা মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, কল্পনা ইত্যাদিকে বুঝানোর জন্য সংস্কৃতি প্রত্যয়টা ব্যবহার করে থাকেন। আর সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, সংস্কৃতি হল সার্বিক জীবন প্রণালী 'The way of life.' এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের উক্তিটা প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, 'Culture is what we are and civilization is what we use or have.' 'আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের যা আছে বা ব্যবহার করি তাই সভ্যতা।'[১২] প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তর্গত এবং বহির্জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সংস্কৃতি। মূলত মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা, আচার-আচরণ, অভ্যাস, বিশ্বাস ইত্যাদিকে বুঝানোর জন্য সংস্কৃতি প্রত্যয়টা ব্যবহার করা হয়।

সংস্কৃতির বহুল উদ্ধৃত সংজ্ঞাটা হল ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী E.B. Tylor তার Primitive culture গ্রন্থে বর্ণিত সংজ্ঞা। তিনি সংস্কৃতি বলতে বুঝিয়েছেন, 'সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত আচার-আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতি-প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমন্বয়ই হল সংস্কৃতি।'[১৩] মার্কিন বিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স এর মতে, 'Culture is a product and also a determinant of human interaction.'[১৪] মানব মিথস্ক্রিয়ার ফল বা নির্ধারকই হল সংস্কৃতি।[১৫] এ প্রসঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানী R T

---

৮. ড. মোঃ রহিম উল্যাহ, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : লেকচার পাবলিকেশন্স লিমিটেড, জুন ২০১৫), পৃ. ১৯

৯. ড. মোঃ মোশাররাফ হোসাইন রচিত, *ইসলাম শিক্ষা*(ঢাকা : ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ড প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৬), পৃ. ১৫

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১২. R M Maclver, *The Modern State*(California : Oxford University Press), p. 325

১৩. E B Tylor, *Primitive Culture*(New York : Harper, 1979), p. 1

১৪. Margaret vine, *An Introduction to Sociologiacl Thought*(New York : Keuka College, 1958), p. 324

Schaefer বলেন, মানুষকে সমাজে বসবাস উপযোগী করতে সংস্কৃতির চারটা প্রধান উপাদান কাজ করে। এগুলো হলো– ভাষা (Language), আদর্শ (Norms), প্রথা (Sanctions) ও মূল্যবোধ (Values)।[১৬]

ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও প্রগতিশীল শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। তাই স্বভাবতই ইসলামি অনুশাসনের প্রভাবে ইসলামে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামি শারি'আহ নির্দেশিত মুসলিম মিল্লাতের জীবনপদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলামি সংস্কৃতি সাধারণ সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামি সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলা যায়, 'ইসলামি জীবনদর্শন ও জীবনবিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামি সংস্কৃতি। এ পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের মণিকোঠায় লালিত বিশেষ ইমান থেকে উৎসারিত। ইসলামের মৌলিক ইমান ও আকিদাহভিত্তিক এ জীবনপদ্ধতিই ইসলামি সংস্কৃতি নামে অভিহিত। ইসলামি পরিভাষায়, 'সংস্কৃতি হল তাই যা বেমানান ও অশালীন বিষয়াদি পরিহার করে ইমানভিত্তিক, মার্জিত, উন্নত ধ্যান-ধারণা সম্বলিত মানসিকতা ও জীবনবোধ জাগিয়ে তোলে।' এ সংস্কৃতি শাশ্বত ও সর্বজনীন।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য : সংস্কৃতি হল জীবন ধারণের পদ্ধতি। মানুষ প্রধানত সামাজিক ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি দ্বারা পরিচালিত। বাংলাদেশের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি জানতে হলে প্রথমেই জানা দরকার এদেশের মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতি। আর জীবন ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হলে এ জনগোষ্ঠীর ঘর-বাড়ির ধরন, পোশাক-পরিচ্ছেদের বিবরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, বিশ্বাস, উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে। মূলত বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতি আলোচনা করা দরকার। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :[১৭]

(ক) কৃষিজ অর্থনীতি : বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ মূলত সনাতন জীবনধারায় পরিচালিত। গ্রামের প্রধান অর্থব্যবস্থা হল কৃষি। সকল গ্রামবাসীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। মাথায় মাথাল, খালি পায়ে, লুঙ্গি পরে কৃষকের মাঠে লাঙল চালানো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের একটা সাধারণ দৃশ্য। আর নগরজীবনে সরকারি-বেসরকারি চাকুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যই অধিকাংশ মানুষের প্রধান পেশা।

(খ) পোশাক-পরিচ্ছদ : দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মানুষ লুঙ্গি, গেঞ্জি, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিধান এবং গামছা ব্যবহার করেন। নগরে শার্ট-প্যান্টের ব্যবহারই বেশি। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে নারীরা শাড়ি পরিধান করলেও শহর অঞ্চলে শাড়ির পাশাপাশি স্যালোয়ার-কামিজের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

(গ) ঘরবাড়ির ধরন : বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে ঘর-বাড়ির ভিন্নতা থাকলেও সাধারণত বাঁশ ও বেতের বেড়া, ছন বা খড়ের ছাউনি ও অবস্থাসম্পন্ন দু'চারটা পরিবার ইটের পাকা বাড়ি বা টিনের ছাউনিতে বা টিনের ঘরে বসবাস করে। নগরে বড় বড় দালানকোঠা তথা পাকা বাড়ির আধিক্য চোখে পড়ে।

(ঘ) খাদ্যাভ্যাস : ভাত, মাছ, ডাল, শাক-সবজি বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। উৎসবে পিঠা, পোলাও, গোশত ও পায়েসের আয়োজন করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে চিড়া, মুড়ি ও মুড়কির প্রচলন আজও রয়েছে। নগরে অনেকেই সকালে রুটি, পরাটা, সবজি বা ডিম দিয়ে নাস্তা করেন এবং দুপুরে রুটি, পরাটা, সবজি বা ডিম, মাছ, গোশত, ডাল দিয়ে ও রাতে ভাতের সঙ্গে সবজি ইত্যাদি থাকে। উৎসবে বিরিয়ানি, পোলাও, রোস্ট, গোশত, পান, জর্দা ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে।

---

১৫. সেলিনা আহমেদ ও খ.ম. রেজাউল করিম, *সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক*(ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৬), পৃ. ২৯৩

১৬. R.T. Schaefer, *Sociology*(New York : Mcgraw Hill, 2003), p. 64

১৭. এ কে নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯), পৃ. ৭২

(ঙ) ধর্মীয় বিশ্বাস : বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৯০% ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। লোকসংখ্যার বাকি প্রায় ১২ ভাগ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী।[১৮] মসজিদে, মন্দিরে, গির্জা এবং প্যাগোডাতে যে যার উপাসনা করে থাকে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ অদৃষ্টবাদী। তবে সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি খুব একটা দেখা যায় না। দেশের মানুষ অনাদিকাল থেকে অসাম্প্রদায়িক ও পরধর্মসহিষ্ণু।

(চ) ভাষা : ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এ দেশের ছাত্র-তরুণরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। ফলে 'বাংলা' বাঙালিদের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এদেশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের রয়েছে এক দীর্ঘ ঐতিহ্য।

(ছ) শিক্ষাব্যবস্থা : একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাংস্কৃতিক জীবন প্রণালীকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের সমাজে শিশুরা নিজ নিজ পারিবারিক পরিমণ্ডলে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে। এছাড়া সাধারণ, কওমি বা আলিয়া মাদরাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও তাদের স্ব-স্ব শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর জীবনে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব রাখে এবং তা সামাজিক জীবন প্রণালীতে বৈচিত্র্য আনে।

(জ) চিকিৎসা ব্যবস্থা : দেশের মানুষের রোগব্যাধি হলে তার সেবা ও চিকিৎসা প্রণালীতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে ঝাড়, ফুঁক, তাবিজ-কবজ, গাছ-গাছড়া দ্বারা চিকিৎসার কথা জানা যায়। অন্যদিকে শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা আধুনিক বা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন। অনেকেই হেকিমি বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বিশ্বাস, অর্থ, শিক্ষা ও সচেতনতা দ্বারা নির্বাচিত হয় কে কোন পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিবেন।

(ঝ) শ্রেণি কাঠামো : বাংলাদেশে সামাজিক শ্রেণিভেদে জীবন প্রণালীতে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি, রুচি, আচার-অনুষ্ঠানে এ পার্থক্য সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের সমাজ সমতাভিত্তিক নয়। এখানকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরণ : বিশ্বের কোন জাতির ইতিহাসেই সংস্কৃতির প্রবর্তন হঠাৎ করে হয়নি। এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে। সামাজিক ইতিহাসবিদরা বলে থাকেন– 'বাঙালি ভাষায় শংকর, জাতিতে শংকর ও সংস্কৃতিতেও শংকর। আসলে পৃথিবীর কোন জাতির সংস্কৃতিই অবিমিশ্র নয়। বস্তুত সংস্কৃতির অবিমিশ্রণ একটা বিরল ব্যাপার।'[১৯] সমাজই সংস্কৃতির সূতিকাগার। বাংলাদেশে সমাজ বিজ্ঞানের জনক অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিম সংস্কৃতিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।[২০] এছাড়ও আছে–

(ক) গ্রামীণ সংস্কৃতি : বাংলাদেশ গ্রাম প্রাধান দেশ। এদেশের শতকরা ৭৬ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। বলা হয়ে থাকে সামাজিকতা গ্রামীণ জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গ্রাম। বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বুঝায়।

(খ) নববর্ষ উৎসব : নববর্ষ উদ্‌যাপন প্রত্যেক দেশ ও জাতির সর্বজনীন উপাদান। বাঙালির জীবনে নববর্ষের সংস্কৃতি বরাবর ছিল গ্রামীণ জনজীবন নির্ভর। বাংলাদেশের নববর্ষ পহেলা বৈশাখ, যে উৎসবের প্রধান আকর্ষণ থাকে পান্তা ভাত।

---

১৮. ড. সেলিনা আহমেদ ও ড. খ.ম. রেজাউল করিম, *সমাজ বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৯. রংগলাল সেন, *বাংলা নববর্ষ উৎসবের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য*, *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ২৭৫

২০. এ কে নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯), পৃ. ৫৭

(গ) নগর সংস্কৃতি : নগর হল শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সাহিত্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলকেন্দ্র। নগর সংস্কৃতি হল মানুষের জীবনযাপন ধারা বা প্রণালী। শিক্ষাকেন্দ্র, শিল্পসাহিত্য, সংঘ, ক্লাব-রেঁস্তোরা, মসজিদ, মন্দির ও গির্জার প্রাচুর্য থাকে শহরে। তাদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক, চাল-চলন, বিদ্যা-বুদ্ধি এক নয়।

(ঘ) বাঙালি উৎসব : বাঙালি উৎসব পালনকে আমরা নিছক সাংস্কৃতিক কিংবা আর্থ-সামাজিক যে দিক থেকেই বিবেচনা করি না কেন এর সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। বায়ান্নর (১৯৫২) ভাষা আন্দোলন, বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন, নবান্ন উৎসব ও রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত চর্চাসহ বাঙালির সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের সব সময়ই শক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগায়।[২১]

(ঙ) হালখাতা : হালখাতার অনুষ্ঠান পহেলা বৈশাখের একটা সর্বজনীন আচরণীয় রীতি। সারা বছরের দেনা-পাওনার হিসাব চুকিয়ে যে নতুন হিসাব ও খাতার আবির্ভাব হয় সেটাই হালখাতা।[২২]

(চ) মেলা : মেলা বাঙালি সংস্কৃতির আর একটা অনুষঙ্গ। ধর্মীয় ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই হচ্ছে মেলাগুলোর মূল উৎস। বিশ্বকবির ভাষায়, 'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী, এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার বাড়ির মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। যেমন, আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভারে পল্লী হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত মেলা।'[২৩]

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি : সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বটার কথা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে যার সঙ্গে অবস্তুগত সংস্কৃতি খাপ খাইয়ে বা তাল মিলিয়ে ঐ একই গতিতে এগিয়ে চলতে পারছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা। এ প্রসঙ্গে ব্রুম ও সেজনিক বলেন,

> 'Ogburn emphasized the changes in material conditions (especially in the physical environment) and in things (including houses, factories, raw materials and other objects) often out distance the ways of using these things and of adapting to these conditions.'[২৪]

সংস্কৃতির এক অংশের এ পিছিয়ে পড়া এবং সে অংশের তা কাটিয়ে উঠার প্রবণতাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যবধান।[২৫]

বস্তুত সংস্কৃতি মানুষের অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, জীবনাচারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তবুও বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারক-বাহক নানা সভ্যতা ও কৃষ্টির নাগরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লালন করে বাংলাদেশের একই সমাজে শান্তির সাথে আবহমান কাল থেকে জীবনযাপন করে আসছে।

---

২১. শখতি সানী, *নবান্নের বারতা নিয়ে এলো হেমন্ত*(ঢাকা : দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০০৯), পৃ. ১১

২২. মোবারক হোসেন, *বাংলাদেশের উৎসব নববর্ষ*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৩১২

২৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *বৈশাখী লোক-উৎসব ও মেলার চালচিত্র*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ১২৬

২৪. Leonard Broom and P.Selznik, *Sociology : A text with adapted Rsading*(New York : Row, Peterson and Company, 1959), p. 66

২৫. W. F. Ogburn, *Social Change*(New York : Viking press, 1950), p. 200

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংবিধানের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

সংবিধান হল একটা রাষ্ট্রের দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। এটা রাষ্ট্র বিষয়ে নাগরিকদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্নের তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রয়োগিক নির্দেশনা। যার মধ্যে একটা জাতির জীবন পদ্ধতি মূর্ত হয় উঠে। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি। সংবিধান একটা দেশের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। একটা রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো, সরকার, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসহ মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক, নাগরিকের অধিকার, এক কথায় রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ নিয়ম-কানুনগুলোকেই সংবিধান বলা হয়। সংবিধান সরকারের সৃষ্টি নয় বরং সরকারই সংবিধানের সৃষ্টি।

সংবিধানের পরিচয়

সংবিধান কতগুলো মৌলিক আইনের দলিল। সংবিধান বিহীন রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করা যায় না। এরিস্টটলের মতে, 'Constitution is the way of life, the state has chosen for itself.' 'সংবিধান হল রাষ্ট্রের জীবন পদ্ধতি, যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে।' কে. সি. হোয়ের-এর মতে, 'যখন কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন কোন বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চর্চা করা হয়, সেগুলো যে দলিল বা বিধিমালা নির্ধারণ করে তাকেই সংবিধান বলা হয়।'[২৬]

লর্ড ব্রাইস বলেন, 'Constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of the state goes on.' 'রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য আইন ও রীতিনীতির সমষ্টিকেই সংবিধান বলে।' Woolsey বলেন, 'সংবিধান হল সেসব নীতির একত্রীকরণ, যেগুলো দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, জনগণের অধিকার এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।'[২৭]

অধ্যাপক হারম্যান ফাইনারের মতে, 'The system of fundamental political institutions is the constitution.' তিনি সংবিধানকে 'Autobiography of power relationship' 'ক্ষমতাজনিত সম্পর্কের আত্মবিবৃতি' বলেও উল্লেখ করেছেন।[২৮]

সংবিধানের উৎসসমূহ Sources of the Constitution : সংবিধান প্রণয়ন বা সৃষ্টিতে যেসব বিষয় সাহায্য করে থাকে সেগুলোকে 'সংবিধানের উৎস' বলা হয়। সংবিধানের উৎস সাধারণত তিনটা, যথা– (১) প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার প্রথা; (২) লিখিত দলিল ও (৩) বিচারকের রায় বা সিদ্ধান্ত।

সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিসমূহ : পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রের সংবিধান একই পদ্ধতিতে গড়ে উঠেনি। অধ্যাপক গেটেলসহ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, চারটা পদ্ধতিতে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো হচ্ছে : (১) মঞ্জুরি বা অনুমোদনের দ্বারা; (২) আলাপ-আলোচনা বা ইচ্ছাকৃত রচনা; (৩) বিপ্লবের দ্বারা ও (৪) বিবর্তনের মাধ্যমে।

---

২৬. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

২৭. প্রাগুক্ত।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ

সাধারণত দু'টো ভিত্তি বা মাপকাঠি অনুযায়ী সংবিধানকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভিত্তি হল– সংবিধান লিপিবদ্ধকরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং দ্বিতীয় ভিত্তি হল– সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি। প্রথম ভিত্তি অনুযায়ী সংবিধান দুই প্রকার, যথা–

(১) লিখিত সংবিধান ও (২) অলিখিত সংবিধান।

দ্বিতীয় ভিত্তি অনুযায়ী সংবিধান দুই প্রকার, যথা–

(১) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান এবং (২) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

নিচে ছকের সাহায্যে সংবিধানের শ্রেণি বিভাগ দেখানো হল–

ভিত্তি বা মাপকাঠি	শ্রেণি বিভাগ	
সংবিধান লিপিবদ্ধকরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ	লিখিত সংবিধান (সামান্য কিছু অংশ অলিখিতও থাকে)	অলিখিত সংবিধান (সামান্য কিছু অংশ লিখিতও থাকে)
সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি	সুপরিবর্তনীয় সংবিধান	দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

সংবিধান ও সাংবিধানিকতা : রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য লিখিত ও অলিখিত নিয়মাবলির সমষ্টিকে সংবিধান বলে। পৃথিবীতে সব ধরনের সরকারের ভিত্তিই হল তার সংবিধান। সংবিধান হল রাষ্ট্রের দর্পণ। গণতান্ত্রিক-অগ্রণতান্ত্রিক সব রাষ্ট্রেরই সংবিধান রয়েছে। জনগণের সার্বভৌমত্ব, অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানের লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানের লক্ষ্য হল জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য সংবিধানকে সর্বোচ্চ আইন ও মৌলিক আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সংবিধানের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত সংবিধান, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং একটা রাষ্ট্র যখন সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হয়, বিচার বিভাগের হাতে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং আইনের শাসন যথার্থ অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯]

সংবিধান ও আইনের শাসন : সংবিধান ও আইনের শাসনের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পৃথিবীতে সব ধরণের সরকারের ভিত্তিই হল তার সংবিধান। সংবিধান হল একটা রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়না। একটা দেশকে তার সংবিধান দ্বারা চেনা বা বুঝা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল বিধিবিধান এবং জনগণের স্বাধীনতা, অধিকার এবং তা রক্ষার উপায়সমূহও সংবিধানে লেখা থাকে। অধ্যাপক ডাইসির মতে, 'আইনের শাসনের অর্থ হল– (ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান; (খ) সকলের জন্য একই ধরনের আইনের ব্যবস্থা করা; (গ) কাউকে বিনা কারণ বা অপারাধে গ্রেপ্তার না করা; (ঘ) কাউকে বিনা কারণ বা বিচারে আটক না রাখা ও (ঙ) সকলের জন্য অভিন্ন বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা। আইনের শাসন নাগরিক স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। একটা রাষ্ট্রে আইনের শাসন না থাকলে গণতন্ত্র, নাগরিক স্বাধীনতা, সাম্য, মূল্যবোধ কিছুই থাকে না। আইনের শাসন হল সভ্য সমাজের মানদণ্ড। আইনের শাসন গণতন্ত্রের ভিত ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। এ আইনের শাসনেরও রক্ষক এবং অভিভাবক হচ্ছে সংবিধান।

---

২৯. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বা শর্তসমূহ : একটা দেশের সংবিধান যত উত্তম, সে দেশের শাসনব্যবস্থাও তত উন্নত। উত্তম সংবিধানের কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা শর্ত রয়েছে।[৩০] সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা : উত্তম সংবিধান হবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। যাতে সংবিধানের অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে যেন কোনরূপ মতভেদের সৃষ্টি না হয়। সংবিধানের ধারাসমূহ হবে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট।

(২) লিখিত : উত্তম সংবিধান লিখিত হওয়াই শ্রেয়। লিখিত সংবিধান অনেক বেশি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়।

(৩) মূল বিষয়ের উল্লেখ : রাষ্টের বিভিন্ন মৌলিক সংগঠনের গঠন ও ক্ষমতার প্রয়োগ পদ্ধতি, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের রূপরেখা প্রভৃতি সম্পর্কে বিধি-বিধান সংবিধানে লিখিত থাকা উচিত।

(৪) জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও মূলনীতির উল্লেখ : সংবিধান একটা জাতির জীবন-দর্পন। এ জন্য উত্তম সংবিধানে জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের উল্লেখ থাকবে।

(৫) সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাভিত্তিক : উত্তম সংবিধান লিখিত হলেও তাতে সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে। সংবিধানের লিখিত অংশের সাথে এসব প্রথা ও রীতিনীতির সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

(৬) সংক্ষিপ্ততা : উত্তম সংবিধান সংক্ষিপ্ত হবে। সংবিধানে শুধুমাত্র সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের অপরিহার্য বিষয়গুলো লেখা থাকবে।

সুশাসনের ধারণা : 'সুশাসন' Good-Governance ধারণাটা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সময়ের। সুশাসনের আলোচনা আধুনিক যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োচিত বিষয়। বিংশ শতকের শেষভাগে মূলত 'সুশাসন' ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে। সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন।

সংজ্ঞা ও এর গুরুত্ব : মার্কিন অর্থনীতিবিদ Paul O'Neill-এর মতে, 'Good governance means ruling justly, enforcing contracts fairly, respecting human and property rights and fighting corruption.' 'সুশাসন হলো– ন্যায়সঙ্গত শাসন, আইন ও চুক্তির নিরপেক্ষ প্রয়োগ, মানব ও সম্পদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং দূর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ।'[৩১] জি. বিলনি বলেন, 'সুশাসন হল একটা দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা যা উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং ন্যায়ভিত্তিক।'[৩২] ম্যাক কারনি, হালফানি ও রডরিগেজ প্রমূখের মতে, 'Good governance is the relationship between the civil society and the state between rulers and the ruled the government and the governed. ' 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, শাসকের সাথে শাসিতের এবং সরকারের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বুঝায়।'[৩৩]

UNDP-এর ভাষ্য মতে, সুশাসন বলতে বুঝায়– 'Good governance refers of governing systems which are capable, responsive, inclusive and transparent.' 'অর্থনৈতিক,

---

৩০. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৩১. প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১৩, ৪৫

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩৩. প্রাগুক্ত।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে একটা দেশের সকল বিষয়ের সর্বস্তরের চর্চাই হল সুশাসন।'[৩৪] সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন।

মূলত সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনের শাসন, মানবাধিকার, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই সুশাসনের মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে রাষ্ট্রের সরকার, জনগণ, রাজনীতিবিদসহ সকল শ্রেণি ও পেশার নাগরিকের মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক, যা সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারের দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই সুশাসন প্রতিষ্টা করা সম্ভব। আর এসব কিছুর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন একজন নাগরিক কুরআনের আদর্শে উজ্জীবিত সুনাগরিক হয়ে উঠবে ও নৈতিক বলে বলিয়ান হয়ে নিজেকে গড়ে তুলবে।

৩৪. প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিক

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতার দশ মাসের মধ্যেই ১৯৭২ সালে রচিত হয় বাংলাদেশের সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। নিচে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস ও পটভূমি : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দিন। এদিন 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখে বাংলাদেশ ও ভারতের মিত্রবাহিনীর নিকট রমনা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথেই বাংলাদেশ কার্যত স্বাধীন হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে' তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে 'আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ' জারি করেন। এ আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' দ্বারা যে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল, তার পরিবর্তে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।[৩৫]

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন : একটা সংবিধান প্রণয়ন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন।[৩৬] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে (জাতীয় পরিষদের ১৬৯ + প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ = ৪৬৯ জন) সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়।[৩৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।[৩৮] কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১৭ এপ্রিল ১৯৭২। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবিধান সম্বন্ধে জনমত আহ্বান করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জুন কমিটি প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করে। কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন ভারত ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে সংবিধান বেত্তাদের সাথে আলোচনা করে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। প্রস্তাবিত সংবিধানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর কমিটির শেষ বৈঠকে খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত রূপ গৃহীত হয়। ৪ নভেম্বর সংবিধানের উপর তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ শুরু হয়।[৩৯]

১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর সংবিধানের হস্তলিপি সংস্করণে গণপরিষদের সদস্যগণের স্বাক্ষর গৃহীত হয়।[৪০] সংবিধান বিজয় দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়।

---

৩৫. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৩৬. *The Bangladesh Observer*, Dacca, March 1972), p. 24
৩৭. *The Bangladesh Observer*, Dacca, April 1972), p. 12
৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ১২ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১১
৩৯. *The Bangladesh Observer*, Dacca, Nov. 1972), p. 5
৪০. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১০

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন : ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশন বসে এবং খসড়া সংবিধান বিলের আকার পেশ করা হয়। এভাবে বিধিবদ্ধ বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বলবৎ হয়। গণপরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।'[৪১]

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশ সংবিধান লিখিত। ১৫৩ টা অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট ৮২ পৃষ্ঠার এ সংবিধান ১১ টা ভাগে বিভক্ত এবং এর একটা প্রস্তাবনাসহ ৪ টা তফসিল ছিল। তবে বর্তমানে দ্বিতীয় তফসিল ও ১২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত। এছাড়া এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার রক্ষা, সংসদীয় গণতন্ত্র, সার্বজনীন ভোটধিকার, ন্যায়পাল নিয়োগ, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সংবিধানিক প্রাধান্য অন্যতম।

সংবিধানের প্রস্তাবনা : বাংলাদেশের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয় : "আমরা অঙ্গীকার করছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এ সংবিধানের মূলনীতি হবে।" সংবিধানের বিধানাবলিতে যেন এসব মূলনীতির প্রতিফলন ঘটে, কমিটি সে বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় আরও বলা হয়েছে যে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে...এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।"

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি : ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার ৪ টা প্রধান মূলনীতি আছে। এগুলো হচ্ছে– (১) জাতীয়তাবাদ, (২) সমাজতন্ত্র, (৩) গণতন্ত্র এবং (৪) ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশ সংবিধানে উপরোল্লিখিত চারটা নীতিকে রাষ্ট্রীয় মূল স্তম্ভ বলা হয়। তবে এ নীতিসমূহ হতে উৎসারিত অন্য নীতিগুলোও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত হয়। এগুলো হল : মালিকানার নীতি, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সুযোগের সমতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন সংরক্ষণ ইত্যাদি সহযোগী মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত।

মৌলিক অধিকার : মৌলিক অধিকার হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধা যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। সংবিধানের সংশোধন কিংবা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা ছাড়া মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা যায় না। মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকায় এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। যা সরকারের পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের এ সংবিধানে।

বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংবিধানে মোট ১৮ টা মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে। এদেশের নাগরিকদের জন্য সব ক'টি (১৮ টা) মৌলিক অধিকার প্রযোজ্য।[৪২] আর বিদেশীদের জন্য প্রযোজ্য ৬ টা। মৌলিক অধিকার সংবিধানের "তৃতীয় ভাগের" "২৬ অনুচ্ছেদে"

---

৪১. ড. খুরশীদা বেগম, *পৌরনীতি*(ঢাকা : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০১১), পৃ. ১৬৫

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৭

মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইনকে বাতিল ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ২৬(১) এ বলা হয়েছে যে, 'এই ভাগের বিধানাবলির সাথে অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই সংবিধান প্রবর্তন হতে সে সকল আইনের ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) আইনের চোখে সবাই সমান : অনুচ্ছেদ ২৭-এ বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান আইনে আশ্রয় লাভের অধিকারী। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-হিন্দু, পাহাড়ি বা বাঙ্গালি একই আইনের আওতায় আশ্রয় লাভের অধিকারী এবং একই আইনে বিচার লাভের অধিকার। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা পত্রের মূল বক্তব্যও এটা। এবিষয়ে মানবধিকার ঘোষণা সনদের ৬ নং ধারায় বলা হয়েছে আইনের কাছে প্রত্যেকেরই সর্বত্র মানুষ হিসেবে স্বীকৃত।

(খ) ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ বৈষম্যহীন : ২৮-এর (১), (২), (৩), (৪) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী, পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। বরং রাষ্ট্র গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে। যে কোন ধর্মাবলম্বীকে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। মোটকথা জন্মসূত্রে হোক কিংবা অনুমোদন সূত্রে হোক কোন বাংলাদেশীর প্রতি রাষ্ট্র কোন বৈষম্য প্রদর্শন করতে পারবে না।

(গ) সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা : বাংলাদেশের কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অর্থাৎ সরকারি চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা পাবে। এ অনুচ্ছেদ ২৯-এ যা বলা হয়েছে, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম, আদিবাসী-বাঙালি এবং নারী-পুরুষ সকল নাগরিক সমান সুযোগ পাবে। ধর্মীয় ভিন্নতা বা জাতি গোষ্ঠীগত ভিন্নতার কারণে কোন নাগরিক চাকুরিতে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুবিধা লাভ বা বঞ্চিত হবে না।

(ঘ) আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার : সহজভাবে বললে এ অনুচ্ছেদের অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার পাওয়ার অধিকার আছে। সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির বিদেশি নাগরিকদেরও একই অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র বা সরকার বেআইনিভাবে এমন কোন কাজ করতে পারবে না যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে।

(ঙ) স্বাধীনভাবে দেশের ভিতর চলাফেরা ও বসতি : এ অনুচ্ছেদের সারকথা হলো, যদি কোন আইন জনস্বার্থ সংরক্ষণ করে তবে সে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাঁধা-নিষেধ ব্যতীত কোন নাগরিকের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল স্থানে অবাধে চলাফেরা, বসবাস ও বসতি স্থাপন করতে পারবে। প্রত্যেক নাগরিক নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে যেতে অর্থাৎ বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার উল্লিখিত প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

(চ) নিরস্ত্র ও স্বাধীনভাবে সমাবেশ করা : এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত বা একত্রিত হওয়ার অধিকার আছে। প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোন জনসভা ও শোভাযাত্রা বা মিছিলে যোগ দেয়ার অধিকার রয়েছে। তবে কোনভাবে জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও সকলের কর্তব্য।

(ছ) সংগঠনের স্বাধীনতা : এ অনুচ্ছেদ ৩৮-এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের আওতায় প্রত্যেক নাগরিকের সমিতি বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা গঠন করার অধিকার রয়েছে। এ অনুচ্ছেদের বলেই দেশের অভ্যন্তরে নানাবিধ সংগঠন, সমিতি, সংঘ গড়ে উঠেছে। উল্লেখ্য যে, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার মানদণ্ডে এবং স্বার্থে আরোপিত আইন লংঘন করে কোন ধরনের সংঘ, সমিতি গঠন করা যাবে না।

(জ) চিন্তা, বিবেক এবং বাক স্বাধীনতা : এ অনুচ্ছেদ ৩৯.১-এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজের মত চিন্তা করতে, নির্ভয়ে কথা বলতে ও নিজের ইচ্ছায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে। প্রত্যেকে নিজের বিবেক বা বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তার উপর কোন চিন্তা বা ধারণা চাপিয়ে দেয়া যাবে না।[৪৩] সংবাদ মাধ্যমগুলো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দেশ-বিদেশের খবর এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করতে পারবে বা স্বাধীনতা ভোগ করবে।

(ঝ) পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা : এ অনুচ্ছেদ ৪০-এ পেশা বা বৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পেশা নির্ধারণের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা আরোপিত বাঁধা-নিষেধ সাপেক্ষে এবং আইনের দ্বারা কোন পেশার যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে সে মুতাবিক যে কোন কারবার, ব্যবসা কিংবা চাকুরি বা যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে। জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৩ (ক) নম্বর ধারায় এ কথা বলা হয়েছে।

(ঞ) নাগরিকের সম্পত্তি লাভের অধিকার : কোন ধরনের আইনি বাঁধা না থাকলে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি (জায়গা-জমি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) অর্জন, ধারণ, কেনাবেচা, দান বা নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিলি-বণ্টন করতে পারবে এবং কোন ধরনের আইনি কর্তৃত্ব ছাড়া রাষ্ট্র কিংবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জোরপূর্বক গ্রহণ কিংবা দখল করতে পারবে না। তবে ৪২(২) উপধারা অনুযায়ী (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে রাষ্ট্রায়ত্বকরণ-এর জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হবে।

(ট) রাষ্ট্রের বিনা অনুমতিতে বিদেশি খেতাব, সম্মান, পুরস্কার প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধ : এ অনুচ্ছেদ ৩০-এ স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে– কোন নাগরিক দেশের বাইরে অর্থাৎ বিদেশ থেকে কোন উপাধি, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করতে হলে তাকে অবশ্যই রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন নিতে হবে। যেমন, বাংলাদেশীদের কেউ যদি ইংল্যান্ডের নাইট কিংবা ভারতের পদ্মশ্রী উপাধি পেয়ে যায় সে উপাধি গ্রহণ করার জন্য সে ব্যক্তিকে অবশ্যই আগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে হবে।

(ঠ) নিজ গৃহে নিরাপত্তা লাভ ও যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষা : এ অনুচ্ছেদ ৪৩ অনুযায়ী, বেআইনিভাবে কোন নাগরিকের ঘরে প্রবেশ ও তল্লাশি চালানো কিংবা কোন নাগরিককে বেআইনিভাবে আটক করা যাবে না। চিঠিপত্র, টেলিফোনসহ যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের উপর আড়িপেতে কোন নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার খর্ব করা যাবে না।

নিম্নের **৬ টা মৌলিক অধিকার বাংলাদেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।**[৪৪] যেমন,

(১) জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার : এ অনুচ্ছেদ ৩২-এ সকল নাগরিকের বেঁচে থাকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার আছে। কাউকে বেআইনিভাবে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এ অধিকার কখনও আইন লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্র সে ব্যক্তিকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এ বিষয়ে

---

৪৩. ড. খুরশীদা বেগম, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা সনদের ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার আছে। ধারা চারে (৪) বলা হয়েছে, কাউকেই দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না। আর ধারা নং ২৪ এ আছে, প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে।

(২) ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার কিংবা আটক করা যাবে না : কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছামত গ্রেপ্তার ও আটক রাখা যাবে না। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি তার পছন্দমত আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে ও আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে। গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে। আদেশ ছাড়া কাউকে ২৪ ঘন্টার বেশি আটক রাখা যাবে না।

(৩) জবরদস্তি শ্রমের কাজ : এ অনুচ্ছেদ ৩৪-এ যা বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শ্রমনির্ভর কাজে নিয়োজিত করা আইনত অপরাধ। এ অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি যদি ফৌজদারি অপরাধের জন্য দণ্ডভোগ করছে এবং সেখানে বাধ্যতামূলক শ্রমনির্ভর কাজে নিয়োজিত করলে জনগণের উদ্দেশ্য সাধন হবে এবং আইনগতভাবে তা আবশ্যক।

(৪) অপরাধ সংগঠনকালে আইনের লংঘন ও বিচার, প্রকাশ্য বিচার লাভ করার অধিকার : অপরাধ সংঘটনকালে যে আইন ভঙ্গ করা হয়েছে, সে আইনে যে সাজা হওয়া উচিৎ তা ছাড়া অপরাধী ব্যক্তিকে অন্য কোন সাজা দেয়া যাবে না। কোন অপরাধের জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে একবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ড দেয়া যাবে। অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আইন ও আদালত বা ট্রাইবুনালে প্রকাশ্য দ্রুত বিচার লাভ করবেন।

(৫) ধর্মীয় স্বাধীনতা : সংবিধানের এ ৪১ নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে ধর্ম অবলম্বন, নিজ নিজ ধর্ম পালন বা প্রচার করতে পারবে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায় নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করতে পারবে। কোন অবস্থাতেই জোরপূর্বক কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম পালনে বাঁধা দেয়া যাবে না কিংবা কোন ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। এ বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা সনদের একটা বড় ধরনের সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

(৬) মৌলক অধিকার বলবৎকরণ : মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু ব্যতিক্রম : (১) শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন : কোন শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইন উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত যে কোন বিধানের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলো প্রযোজ্য হবে না।

(২) দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোন কিছু করে থাকলে জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা সে ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারবে।

মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব : ২৬ নং অনুচ্ছেদটা যেসব মৌলিক অধিকারের কথা সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে সেগুলো সংরক্ষণের কথা বলে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৭-৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদে 'মৌলিক অধিকার'সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্র বা সরকার মৌলিক অধিকারের এ বিধানসমূহের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। মৌলিক অধিকার কেবল মাত্র ঘোষণা নয়। এগুলোর সাংবিধানিক মর্যাদা আছে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬(১) ধারায় বলা আছে এ ভাগের বিধানাবলির সাথে অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এ সংবিধান প্রবর্তন হতে সে সকল আইনের ততখানি বাতিল হয়ে যাবে।[৪৫]

মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা বা বলবৎ করার উপায় : বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের রক্ষা বা বলবৎ করার উপায়ও নির্দেশিত রয়েছে। এগুলো হল : (১) বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে কোন আইন প্রণয়ন করবে না। (২) আইনানুযায়ী ব্যতীত বাংলাদেশের কোন নাগরিককে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কেউ জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। (৩) বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করতে পারবেন। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারবে। (৪) মৌলিক অধিকার রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ হল বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট তা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।

রাষ্ট্রের পরিচয় : মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক আবার রাজনৈতিক প্রাণী। রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা মানুষের জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়। মানুষের জীবনের বিকাশ লাভ ও সকল চাহিদা পূরণ রাষ্ট্রের মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়। প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতে, 'রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনতা ব্যতীত উন্নত জীবন লাভ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। কেননা, মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দিকে। মানুষ তার এ প্রবণতা থেকে কখনও মুক্ত হতে পারে না।'[৪৬] প্লেটো ও এরিস্টটলের মতে, সাধারণ কল্যাণ ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তাদের মতে, রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক সংগঠন নয় বরং এটা একই সাথে ধর্মীয় সম্প্রদায়, সংঘ ও সামাজিকীকরণ সংস্থা হিসেবে কাজ করে যা সাধারণভাবে ব্যক্তি ও মানুষের মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে লিপ্ত থাকে।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Defination of State) : রাষ্ট্র শব্দটার ইংরেজি প্রতিশব্দ State। এটা একটা নাম বাচক বিশেষ্য। রাষ্ট্র বলতে একটা শাসনতান্ত্রিক দেশ বা দেশের অংশকে বুঝানো হয়। রাজ্য, দেশ, প্রদেশ,

---

৪৫. ড. খুরশীদা বেগম, *পৌরনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮

৪৬. প্লেটো, *দ্যা রিপাবলিক*(ইংল্যান্ড : পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৯৫), পৃ. ১৫

সরকার, মর্যাদা প্রভৃতি অর্থেও শব্দটা ব্যবহৃত হয়।[৪৭] এর শাব্দিক অর্থ (Position) অবস্থা, (Condition) দশা, (Grandeur; Splendour *(often attrib)* জাঁকজমক, (Government) সরকার, (a political unit having sovereignty *(sometimes attrib)*, (any of the member of a federation) (Rastra) রাষ্ট্র, (Kingdom) রাজ্য, (Rank) পদ (Quality) গুণ, (Rank, Dignity) মর্যাদা।[৪৮] প্রাচীন গ্রিক ও রোমান লেখকদের লেখায় রাষ্ট্র শব্দের পরিবর্তে 'পোলিশ' (Polis)ও 'সিভিটাস' (Civitas) শব্দদ্বয়ের উল্লেখ দেখা যায়। কারণ, গ্রিকদের নগর রাষ্ট্র নগরের আশেপাশের কয়েকটা গ্রাম নিয়ে গঠিত হত। এগুলোকে তাই নগররাষ্ট্র (City State) বলেই আখ্যায়িত করা যুক্তিযুক্ত। তবে গ্রিক দার্শনিকগণ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুরোধা এরিস্টটল বলেন, 'The State is a union of families and villages having for its and a perfect and sufficing life by which we mean is happy and honourable.' 'কয়েকটা পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে রাষ্ট্র (Polis) গঠিত হয় এবং পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে কতিপয় গ্রাম ও পরিবার সুখী ও সম্মানজনকভাবে বসবাস করে।'[৪৯] তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র একটা স্বাভাবিক কার্যক্রম যে মানুষ সমাজ বহির্ভূত জীবনযাপন করে তার জীবন কোন শৃঙ্খলার অধীন নয়।[৫০]

রোমানদের সময় থেকে রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। কারণ, রোমান সম্রাট বা রাজারা একটা শাসনতন্ত্রের অধীনে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নিকোলা ম্যাকিয়াভেলির[৫১] রচিত গ্রন্থ 'দি প্রিন্স' (The Prince) এ শব্দটার ব্যবহার দেখা যায়।[৫২] রাষ্ট্র শব্দটা কখনও জাতি, দেশ, সমাজ, সরকার প্রভৃতিকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব পরিভাষা প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। রাষ্ট্র বলতে যুক্তরাষ্ট্রের (Federation) অঙ্গরাজ্যগুলোকেও বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ টা অঙ্গরাজ্যকে আলাদাভাবে রাষ্ট্র (State) বলা হয়ে থাকে।[৫৩]

রাষ্ট্রের প্রামাণ্য সংজ্ঞা : রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিক জীবনের অন্যতম একটা সংঘ। এটা একটা ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের সভ্য হিসেবেই নাগরিক জীবনের শুরু। মানুষ কোন না কোনভাবে রাষ্ট্রের সদস্য। ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না, তাই মানুষ তার প্রয়োজনেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লুন্টসলি (Bluntschli)-এর মতে, 'The State is a politically organized people of a definite territory.'[৫৪] কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে

---

৪৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি ২০১১), পৃ. ১০৩২

৪৮. মোঃ মনিরুজ্জামান, *অক্সফোর্ড এ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারি*(ঢাকা : অক্সফোর্ড প্রেস এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৯৮), পৃ. ৭২১

৪৯. এরিস্টটল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৫১. নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি ১৫১৩ খ্রি. তাঁর রচিত 'The Prince' বইটা প্রকাশ করেন। তিনি ইতালির অধিবাসী ছিলেন। তার মতে, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতির কোন স্থান নেই। সুবিধাবাদই চরম ও পরম নীতি। প্রাচীন ভারতের চানক্যের চিন্তাধারার সাথে এ নীতির হুবহু মিল রয়েছে।

৫২. প্রফেসর ফিরোজা বেগম, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*(ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১৩

৫৩. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৯), পৃ. ৮২

৫৪. প্রফেসর ফিরোজা বেগম, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই হল রাষ্ট্র। লাস্ওয়েল ও কাপ্লান বলেন, 'The State is a union of families and villages having for its end a perfect and self sufficing life.'[৫৫]

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এর মতে, 'A State is a people organised for law within a definite territory.'[৫৬] রাষ্ট্র হল কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত একটা জনসমষ্টি। অধ্যাপক হল (Hall) এর মতে, 'রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশক্তির শাসন হতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ। অধ্যাপক বার্জেস বলেন, 'A particular portion of mankind viewed as an organized unity.'[৫৭] রাষ্ট্র হচ্ছে মানবজাতির সে সংঘবদ্ধ অংশ, যা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড ইষ্টন, জি.এ.এলমন্ড, জেমস কোলম্যান ও রবার্ট এ. ডল প্রমূখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র শব্দটাকে নতুনভাবে নামকরণ ও ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

তারা রাষ্ট্র শব্দটার পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political System) শব্দটা ব্যবহার করেছেন। এলমন্ড ও কোলম্যান এর মতে, 'The political system is the legitimate order maintaining or transforming system in the society.'[৫৮] রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজের বৈধ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা পরিবর্তন আনয়নকারী ব্যবস্থা।

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কির মতে, 'The modern state is a territorial society divided into government and subjects. Claiming within its allotted physical area supremacy over all other institutions.'[৫৯] রাষ্ট্র একটা ভৌগোলিক সমাজ যা সরকার ও জনগণের মধ্যে বিভক্ত এবং এলাকাধীন সকল সংগঠনের উপর স্বীয় প্রাধান্য দাবি করে। নছলেবে লর্ড টাবর এর মতে, 'The political system is made up of the territorial area and government of the area is a state.'[৬০] রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের সমন্বয়ে গঠিত এবং উক্ত ভূখণ্ডের সরকার হল রাষ্ট্র। মূলত রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক জনসমষ্টি যারা একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সুসংগঠিত সরকার গঠন করে স্বাধীনভাবে বসবাস করে।

ইসলামি রাষ্ট্র : ইসলামে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র। আল-কুরআনে প্রথম রাষ্ট্র শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের অন্যতম একটা সুরা হল– 'আল-মুলক' (The state) বা রাষ্ট্র নামক সুরাটা। মহান আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আ. ও হযরত সুলাইমান আ. রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। হযরত ইউসুফ আ. এবং মহানবী মুহাম্মদ সা. ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইসলামি রাষ্ট্র বলা হয় এমন রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্র ইসলামি নীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি শারি'আতের ভিত্তিতে

---

৫৫. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

৫৬. প্রফেসর ফিরোজা বেগম, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৫৭. প্রাগুক্ত।

৫৮. জি.এ. আলমন্ড ও জে. এস. কোলম্যান, *দ্যা পলিটিক্স অফ ডেভেলপিং এরিয়াস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৫৯. হ্যারল্ড জে. লাস্কি, *এ গ্রামার অব পলিটিক্স*(টেক্সাস : মডার্ন লাইব্রেরি, ১৯৯৪), পৃ. ২১

৬০. আর. এ. ধাল. *মডার্ণ পলিটিক্স এ্যানালাইসিস*(টেক্সাস : মডার্ন লাইব্রেরি, ১৯৯৮), পৃ. ১২

প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। অন্য কথায় যে রাষ্ট্র মহান আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও আইন রচনায় নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষ সমানভাবে আল্লাহর বান্দা হওয়া ও তাঁর নিকট জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির উপর যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে ইসলামি রাষ্ট্র বলে। ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ ও রীতি-নীতির পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়।[৬১]

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রামাণ্য সংজ্ঞা : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শামসুল আলম-এর মতে, 'আল-কুরআন এবং সুন্নাহভিত্তিক সংগঠিত এবং পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।'[৬২]

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইসলামি চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. খুরশিদ আহমদ-এর মতে, 'Islamic state is one which opts to conduct its affairs in accordance with the revealed guidance of Islam and accepts the sovereignty of Allah and the supremacy oh this law and which devotes its resources to achieve this end.' যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামি আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত, আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মুতাবিক লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্বক প্রয়াস চালানো হয় তা-ই ইসলামি রাষ্ট্র।[৬৩]

আবুল হাসান আল মাওয়ারদির মতে,

الدولة في الإسلام حراسة الدين وسياسة الدنيا وهداية الناس ورحمتهم.

'দ্বীনের পাহারাদারি, সংরক্ষণ ও দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনা ও নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই ইসলামি রাষ্ট্র।[৬৪]

আল্লামা ইবন খালদুন-এর মতে, 'ইসলামি শারি'আতের দাবি অনুযায়ী নাগরিকদের বৈষয়িক, ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহনকারী রাজনৈতিক সংগঠনই ইসলামি রাষ্ট্র।'[৬৫]

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী-এর মতে, ইসলামি রাষ্ট্র একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নই এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। মানব জীবনের সকল দিকই এ রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বলে এটাকে সর্বাত্মক রাষ্ট্রও বলা হয়।[৬৬]

ড. আবদুল হামিদ আবু সুলাইমানের মতে,

'Whatever system of government the Ummah chooses for itself in order to realize its spiritual and temporal aspirations is the one that thus deserving oh the Ummah's support.'[৬৭]

---

৬১. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৯), পৃ. ৯৯

৬২. শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৫), পৃ. ৫২

৬৩. প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ, *ইসলামিক ল' এন্ড কনস্টিটিউশন গ্রন্থের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৬৪. আবুল হাসান আলি আল মাওয়ারদি, *কিতাবুল আহকামুস সুলতানিয়া*(কুয়েত : মাকতাবাতু দারু ইবন কুতাইবা, ১৯৮৯), পৃ. ৩

৬৫. আবদুর রহমান ইবন খালদুন, *আল মুকাদ্দিমা*(মদিনা মুনাওয়ারা : আদ দারুত তিউনিসিয়া, ১৯৮৪), খ.১, পৃ. ১০০

৬৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনূ. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৯), পৃ. ১০০

৬৭. ড. আবদুল হামিদ আবু সুলাইমান, *মুসলিম মানসে সংকট*(ঢাকা : আই.আই.আই.টি., ১৯৯৩), পৃ. ১৩৯

প্রখ্যাত আলিম আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ বলেন, 'যে ভূখণ্ডে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র, সরকার, জনগণ ও আল্লাহর আইন ও রাসুলের সুন্নাহর পরিপূর্ণ নীতির বুনিয়াদে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা ব্যবস্থাকে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় ইসলামি রাষ্ট্র।[৬৮]

রাষ্ট্র গঠনের উপাদানসমূহ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর চারটা বৈশিষ্ট্য বা উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো– (১) স্থায়ী জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র গঠনের এ চারটা মৌলিক উপাদানের মধ্যে জরুরি উপাদান তার নাগরিক; যা রাষ্ট্রের প্রাণ। নাগরিক ছাড়া কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ নাগরিক কিভাবে সুনাগরিক হয়ে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করতে পারে সেটাই এ গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি : রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ ও উন্নত সমৃদ্ধ জীবন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান। আবার একদল বলেছেন যে, রাষ্ট্রই সব, রাষ্ট্রই মূল। জনগণই রাষ্ট্রের বেদিমূলে আত্মোৎসর্গ করবে। তাদের মতে রাষ্ট্রের কাজ যত সীমিত হবে, ততই মঙ্গল। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটলের মতে, 'রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মহত্তর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা।' রোমান দার্শনিকগণও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করে সুন্দর ও উন্নততর জীবন কায়িমের জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। হেগেলের মতে, 'রাষ্ট্র স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক এবং একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের মূল্য লাভ করে।' তিনি রাষ্ট্রকে 'ধূলির ধরণীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রা (March of God on earth) বলে উল্লেখ করেছেন। হেগেলের মত অন্যান্য আদর্শবাদী দার্শনিকগণের মতে, রাষ্ট্রের ইচ্ছায় জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হবে।[৬৯] অধ্যাপক উইলোবি রাষ্ট্রের তিনটা উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা,

(১) মুখ্য ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য : রাষ্ট্রের প্রথম উদ্দেশ্য নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও জনগণের অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা দান করা।

(২) গৌণ উদ্দেশ্য : রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য জনগণের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং শ্রেণিগত বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) চূড়ান্ত উদ্দেশ্য : রাষ্ট্রের তৃতীয় উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে মানবসত্তা বিকাশের পথ সুগম করা এবং মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করে উন্নততর নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য যে রাষ্ট্র কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে, তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে। কেননা জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনই বর্তমান রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অতীতে রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিজীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দান, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। আধুনিক রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য কার্যাবলি ছাড়াও বহুবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যক্তির

---

৬৮. আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র*(ঢাকা : ইফাবা., এপ্রিল ১৯৮১), পৃ. ৪০

৬৯. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি জাগ্রত ও সুদৃঢ় করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। এককথায় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে 'জনগণের বন্ধু ও পথপ্রদর্শক'।

ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Islamic state) : ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমন একটা প্রশাসনিক যন্ত্র যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম ঐশী বিধান আল-কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত। আল্লাহপাক প্রদত্ত পরামর্শসভা নীতির আলোকে সকল কর্মচারী-কর্মকর্তা রাষ্ট্র প্রধান বা আমিরের নিকট প্রত্যেকটা কাজ সুসম্পন্নের স্বার্থে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকবেন। যার একান্ত ভিত্তি হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ। আধুনিক রাষ্ট্র মানুষের পার্থিব কল্যাণ, সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে কাজ করলেও ইসলামি রাষ্ট্র পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনের কল্যাণে কাজ করে। যা মানব জীবনের জন্য একান্ত কাঙ্খিত। কারণ, খিলাফতের মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ধূলির ধরণীতে মানব জাতির আগমন। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের জন্য খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব তিনি মানুষের উপর অর্পন করেছেন। আল্লাহপাক প্রেরিত প্রথম মানব হযরত আদম আ.-ই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচক ছিলেন। এমর্মে আল্লাহর ঘোষণা,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَلِيْفَةً.

'স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাতে চাই।'[৭০] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ 'পবিত্রতা সে মহান সত্তার যার হাতে সাম্রাজ্য।'[৭১] তিনি আরও বলেছেন,

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

'বল, হে আল্লাহ! তুমি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান কর এবং যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সমস্থ কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'[৭২]

গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশ সংবিধানের সমস্যা ও প্রকৃতি : বাংলাদেশের জনগণ শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই **১৯৭১** সালে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, বরং তাদের লক্ষ্য ছিল একটা শোষণমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বাংলাদেশের জনগণ ও রাজনৈতিক নেতাদের পরমত সহিষ্ণুতার অভাব, জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে ব্যর্থতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও সংবিধানকে খেয়াল খুশিমত পরিবর্তন ও সংশোধন করা, বারবার সামরিক হস্তক্ষেপ, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সময়োচিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে গণতন্ত্র ও সংবিধানের অগ্রগতিতে বাঁধা ও সমস্যার সৃষ্টি হলেও আশার কথা এ যে, এসব সমস্যা ক্রমেই দূর হচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সাংবিধানিক প্রাধান্য ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।[৭৩]

---

৭০. আল কুরআন, ২ : ৩০
৭১. আল কুরআন, ৬৭ : ১
৭২. আল কুরআন, ৩ : ২৬
৭৩. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রব্যের মান উন্নয়ন, মূল্যহ্রাস, সরবরাহ ও সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করে থাকে।[৭৪]

(২) জনহিতকর কার্যাদি সম্পাদন : কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দান এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়াও মানবকল্যাণে বহুবিধ জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

(৩) অনুকূল সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি : কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে।

(৪) অর্থনৈতিক উন্নতি : কল্যাণমূলক রাষ্ট্র আর্থিক আয়ের উৎসসমূহ সন্ধান করে। শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও সুষম কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে।

(৫) সর্বজনীন কল্যাণ : এরূপ রাষ্ট্র কোন শ্রেণি বিশেষের কল্যাণের জন্য কাজ করে না, বরং শ্রেণিস্বার্থের ঊর্ধে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বরূপ : বাংলাদেশ একটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যদিও যুদ্ধ পরবর্তী এ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জটিলতা ও সমস্যা দেখা দেয়। তার অবসানকল্পে সরকার ১৯৭২ সাল থেকেই স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৭৫]

(১) খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন : বাংলাদেশ সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, অগভীর ও গভীর নলকূপ স্থাপন, সুলভে সার ও বীজ সরবরাহ এবং কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান সময়ে এ সকল ব্যবস্থার দিক প্রসারিত হয়েছে। কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ, নাম মাত্র টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা, শষ্য উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) উন্নয়নমুখী বিবিধ কার্যাদি : জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বেকারদের জন্য কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, শিশু সদন প্রতিষ্ঠা, মহামারী রোধকল্পে টিকা, ইনজেকশন ও বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহসহ নানাবিধ কল্যান মূলক কার্যাবলি চালিয়ে যাচ্ছে।

(৩) শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন : সরকার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রম আইন, শ্রম আদালত, ন্যায্য মজুরি ও শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও শ্রমিকদের মান উন্নয়নে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বিদেশ গমন ও বিদেশে কাজ করার জন্য সহজ ও প্রতারণা বিহিন পারিশ্রমিক প্রাপ্তি ও অধিকারের জন্য (Online) নিবন্ধিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

(৪) শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। এছাড়াও দ্রব্যের মূল্যহ্রাস, সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় ভারসাম্য ও সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

---

৭৪. প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

(৫) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সময়োপযোগী পদক্ষেপ : সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, ভিজিডি প্রোগ্রাম, হত দরিদ্রদের দশ টাকা কেজি দরে চাল প্রদান, ফকির-মিসকিনদের পুনর্বাসন, ভুমিহীনদের জমি ও গৃহ প্রদান, প্রতিবন্ধীদের সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ ও কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান ছাড়াও আছে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ।

(৬) শিক্ষার মান উন্নয়ন : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড– 'Education is the backbone of a Nation, no Nation can prosper without education.' এ মূলমন্ত্রকে সামনে নিয়ে শিক্ষার অগ্রগতিতে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ জাতিকে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও জাতীয়করণ, ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, প্রতিটা উপজিলায় অন্তত একটা করে স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ, বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নতি করণের লক্ষ্যে উন্নত পাঠদান পদ্ধতি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থাকরণ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এছাড়াও আছে সামগ্রিকভাবে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড।

বস্তুত স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর স্বাদ পেয়ে যাওয়া বাঙালি জাতি এখনও সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ করতে না পারলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা দূর করে জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য বাংলাদেশ সরকার সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। একটা সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ আজ প্রতিশ্রুত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং বাংলাদেশকে মোটামুটি একটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যুক্তিযুক্ত। আর সুনাগরিক গঠনে সুরা আল-হুজুরাতের শিক্ষা ও সামগ্রিক বিধি-বিধান কাজে লাগিয়ে পরিপূর্ণ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বাস্তব রূপদান করা সম্ভব। কুরআনের আদর্শ ও নির্দেশনায় নৈতিক চরিত্রকে বলিয়ান করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করলে এর প্রকৃত সুফল পাওয়া সম্ভব হবে যেটা প্রমাণিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুনাগরিক গঠনে ব্যক্তিগত করণীয়

কথায় আছে– 'আপন ভাল তো জগৎ ভাল, নিজে সুন্দর তো পৃথিবী সুন্দর।' নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি যত্নশীল হয়ে অপরের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ ইসলামী আদবের দিক নির্দেশনা' গ্রন্থে ড. মারওয়ান ইবরাহিম আল-কায়ামি কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামি সমাজের কতিপয় বিধিবিধানের উল্লেখ করছেন। যার দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক সুন্দর ও সমন্বিত হতে পারে এবং একটা সুষ্ঠু পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, প্রথমত: অপরিহার্য ব্যক্তিগত গুণাবলি অর্জন করা, দ্বিতীয়ত: সমাজের মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করা, তৃতীয়ত: ব্যক্তিগত খারাপ দিকগুলো পরিহার করা, চতুর্থত: পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন অটুট রাখা এবং মন্দ কাজ বাদ দিয়ে ভাল কাজের অভ্যাস গড়ে তোলা।

সুনাগরিক গঠনে ব্যক্তিগত করণীয়

(ক) ব্যক্তিগত অপরিহার্য গুণাবলি : সাধারণভাবে বলতে গেলে সচ্চরিত্রের মত কোন ভাল গুণ নেই। সর্বোত্তম লোকেরাই সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবিবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'হে রাসুল! নিশ্চয়ই আপনি উন্নততর চরিত্রের ধারক।'[৭৬]

সচ্চরিত্রের কয়েকটি দিক আছে। কুরআনে এসেছে, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ 'আমি আদম সন্তানকে সম্মান দান করেছি।'[৭৭] তাই একজন মুসলিমের সামাজিক আচরণ হবে নিম্নরূপ :

(১) বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র হতে হবে এবং কোনরূপ গর্ব বা অহংকার করা যাবে না। মহানবী সা. বলেছেন, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 'আমি তো নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধান করতে প্রেরিত হয়েছি।'[৭৮] প্রিয়নবী সা. বলেছেন, إن الصدق بر 'সত্য হল পূণ্য।'[৭৯]

(২) ভাল চরিত্রবান লোক হলে তাদের সাথে মেলামেশা করা। অন্যথা নির্জনতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

(৩) সর্বদা সত্য কথা বলা, সত্য সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা না বলা এবং মিথ্যা পরিহার করা। আল্লাহপাক বলেছেন, وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ 'তোমরা মিথ্যা বলা পরিহার কর।'[৮০]

(৪) মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি স্নেহদৃষ্টি, দয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে।

(৫) ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আসনে থেকে অনাকাঙ্খিত ভুল-ত্রুটির জন্য মানুষকে ক্ষমা করা উচিত।

---

৭৬. আল কুরআন, ৬৮ : ৪

৭৭. আল কুরআন, ১৭ : ৭০

৭৮. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮), হাদিস নং ২৭৪, পৃ. ১৪৮

৭৯. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৬, হাদিস নং ৬৪০০, পৃ. ১৩১-১৩২

৮০. আল কুরআন, ২২ : ৩০

(৬) আচার-ব্যবহারে কোন মানুষ মনক্ষুন্ন হলে, সেজন্য তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(৭) অপরের সৎ চিন্তাকে উৎসাহিত করা ও মূল্য দেয়া উচিত।

(৮) অন্যের প্রতি বন্ধুসুলভ হওয়া এবং তাদের সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করা কর্তব্য।

(৯) চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ বা প্রতারণার মাধ্যমে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ না করা।

(১০) পিতামাতা জীবিত থাকলে তাদের প্রতি পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল হওয়া ও খুশি রাখা।

(১১) আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা ও তাদের হক আদায় করা।

(১২) ওয়াদা অক্ষুন্ন রাখা ও কথা অনুযায়ী কাজ করা বা কেউ পরামর্শ চাইলে আন্তরিকভাবে সুপরামর্শ দেয়া।

(১৩) পিতামাতার অবর্তমানে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ও তাদের অসিয়াত পূর্ণ করা।

(১৪) যারা ইসলামের চর্চা করে, তাদের প্রতি তার সম্পর্কের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

(১৫) সর্বদা ধৈর্যশীল হওয়া এবং রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

(১৬) আগে যার সাথে ঝগড়া হয়েছে, তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে আন্তরিকতা প্রদর্শন করা ও কথা বলা।

(১৭) দূর্বলের প্রতি সদয় এবং পিতামাতা, গুরুজন ও আত্মীয়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

(১৮) মিতাব্যায়ী হওয়া, তবে কৃপণতা নয়। রাসুল সা. বলেছেন, اللهم إني أعوذبك من البخل 'হে আল্লাহ! আমি কৃপণতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।'[৮১]

(১৯) আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হওয়া এবং শুকর গুজারি হওয়া।

(২০) কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা হলে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে কথা বলা।

(২১) দুষ্টু ও মূর্খ লোকদের মুকাবিলায় কৌসুলি হতে হবে ও দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে হবে।

(২২) অন্যের সাথে উপহার বিনিময় করা অর্থাৎ উপহার গ্রহণ করা ও উত্তম উপহার প্রদান করা।

(২৩) যে ভাল কাজ করতে চায় তাকে ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করা।

(২৪) বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থতা করা এবং সুসম্পর্ক গঠনের সহয়তা করা ও তাদের মধ্যে ইনসাফ করা।

(২৫) কাজ সম্পাদনের আগে চিন্তা-ভাবনা করে নেয়া, যেন সেটা কুরআন-হাদিসের পরিপন্থী না হয়।

(২৬) হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য করা, ক্রয়-বিক্রয়ে সৎ থাকা ও মালপত্র ওজনে কম না দেয়া। কুরআনে এসেছে, فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلاً طَيِّبًا 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু পবিত্র ও হালাল রিযিক দিয়েছেন তোমরা তা থেকে ভক্ষণ কর।'[৮২]

(২৭) সর্বাবস্থায় হালাল রিযিক অন্বেষণ করা ও হারাম পরিত্যাগ করা। রাসুল সা. বলেছেন, طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة 'হালাল রিযিক অন্বেষণ করা ফরযের পর আরেকটা ফরয কাজ।'[৮৩]

(২৮) যে দুর্ব্যবহার করছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া, যেন সে ঘনিষ্ট বন্ধুরূপে পরিগণিত হয়।

---

৮১. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈর বুখারি রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, সহিহ, *বুখারি শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারি ২০১১), খ.৯, হাদিস নং ৫৯৩০, পৃ. ৫৮২

৮২. আল কুরআন, ১৬ : ১১৪

৮৩. ইমাম বাইহাকি, *আস সুনানুল কুবরা*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২০০৩), খ.৬, হাদিস নং ১১৬৯৫, পৃ. ২১১

(২৯) প্রফুল্লচিত্তে ও হাসি-খুশি মনে অন্য জনের সাথে সাক্ষাৎ করা ও অন্যের প্রতি সদয় হওয়া।

(৩০) অপচয় না করা কিন্তু দানশীল হতে হবে। অপচয় করা শয়তানের কাজ বলে আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।'[৮৪]

(খ) ব্যক্তিগত পরিহার্য কার্যাবলি : সামাজিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে চাইলে ব্যক্তিগত চরিত্রের কতিপয় নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পরিহার করা এবং একই সঙ্গে কতিপয় ইতিবাচক গুণাবলির চর্চা করতে হবে। নিম্নে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের একটা তালিকা প্রদত্ত হল :

(১) অত্যন্ত ভয় পাওয়া, হঠাৎ উত্তেজিত বা আকস্মিকভাবে ক্ষুব্ধ হওয়ার অভ্যাস পরিহার করা। এ ব্যাপারে রাসুল সা. বলেছেন, وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার নিকট অহি প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা একে অপরের সাথে বিনয় ও ভদ্র ব্যবহার কর।'[৮৫]

(২) অন্যদের সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখা এবং কোন মুসলিমের দূর্ভাগ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

(৩) নিজের সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয় উপযাচক হয়ে কথা বলা বা অন্যের প্রতি অতিমাত্রায় সন্দেহপ্রবণ হওয়া।

(৪) নিজে আত্ম-সমালোচনা না করে অন্যের সমালোচনা করা বা কুৎসা রটনা করা।

(৫) কাউকে অপবাদ দেয়া, সত্য গোপন করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

(৬) স্বার্থপর হয়ে অন্যের কথা না ভেবে নিজস্ব প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি প্রধানত চিন্তা-ভাবনা করা।

(৭) ব্যক্তিস্বার্থে কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে তার প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করা।

(৮) ভিন্ন লোকের বংশধরদের গালি দেয়া ও হেয় প্রতিপন্ন করা।

(৯) প্রাপ্ত মাল নিজের অর্জিত ভেবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করা।

(১০) বংশের মৃত পূর্বপুরুষ অথবা পদস্থ আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে গর্ব করা।

(১১) নিজের প্রশংসা করা অথবা নিজেকে অযাচিতভাবে বড় করে তুলে ধরা।

(১২) কোন মুসলিমের সাথে বিরোধ থাকলে, তিন দিনের বেশি সময় কথা না বলা।

(১৩) সামর্থ থাকার পরও অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে রাখা।

(১৪) পাপিষ্ঠ প্রকৃতির অথবা বিত্তবান বা উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদের প্রতি অনাহুত সম্মান প্রদর্শন করা।

(১৫) কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া বা মাল গুদামজাত করে রাখা।

(১৬) অন্যের সমালোচনা শুনে তৃপ্তি লাভ করা বা প্রতিবাদ না করা।

(১৭) সব সময় অসন্তুষ্ট থাকা ও অভিযোগ করা এবং কোন ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হওয়া।

(১৮) অসদুদ্দেশ্যে গোয়েন্দাগিরি করা বা ছিদ্রান্বেষণ করা। আত্ম-প্রবঞ্চনা বা আত্ম-প্রতারণা করা পরিত্যাগ না করা। আল্লাহপাক বলেছেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'বল, আমার রব যা কিছু হারাম করেছেন তা হচ্ছে, যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ।'[৮৬]

---

৮৪. আল কুরআন, ১৭ : ২৭

৮৫. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৬, হাদিস নং ৬৯৪৫, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

(১৯) অন্যদের হিংসা করা, নিজের বংশীয় বা অর্থের গৌরব করা।

(২০) অন্যায় হতে দেখে এড়িয়ে যাওয়া বা চুপ করে বসে থাকা বা আল্লাহর নি'আমতের শুকরিয়া না করা।

(২১) কারও অগোচরে নিন্দা করা ও অন্যান্য মুসলিমের অকারণে ঘৃণা করা।

(২২) অন্যদেরকে হাস্যস্পদ করা, তাদের প্রতি উপহাস করা বা মন্দ নামে সম্বোধন করা।

(গ) সমাজের মানুষের প্রতি কর্তব্য

(১) মানুষের মুখ কথা বলার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং সামাজিক সম্পর্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সুতরাং কি বলা হচ্ছে এবং কিভাবে বলা হচ্ছে তা খুব বিজ্ঞতার সাথে বিবেচনা করে বলতে হবে।

(২) সততা ব্যক্তিকে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং সামাজিক বন্ধন গড়ে তুলতে ও সহায়তা করে। এটা একজন ভাল মুসলিমের অপরিহার্য গুণ। তাই সততার সাথে অন্যদের সাথে মিশতে হবে।

(৩) কথাবার্তার সময় অমায়িক, দয়াদ্র ও মার্জিত মৌখিক অভিব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অন্যের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যের অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(৪) মানুষের সাথে সর্বদা উত্তম ব্যবহার ও সদাচারণ করা এবং কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা।

(৫) সম্মান ও সহৃদয়তার সাথে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। যার উত্তম পদ্ধতি হতে পারে একে অপরের সাথে সালাম বিনিময়। মহানবী সা. বলেছেন, أفشوا السلام بينكم 'তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও।'[৮৭]

(৬) ওয়াদা করার আগে মুসলিমকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি এ ওয়াদা রক্ষা করতে পারবেন কি–না? অজুহাত দিয়ে এ ওয়াদা খিলাপ করা যাবে না। ভাবলে চলবে না যে, এ অজুহাতই যথেষ্ট।

(৭) কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না দেয়া, অপরের ছিদ্রান্বেষণ না করা, পরচর্চা, পরনিন্দা, গিবত, রাহাজানি, চোগলখুরি, কটুক্তি এক কথায় অন্যের হক নষ্ট হয় এমন কোন কথা বা কাজ না করা।

(৮) কারও সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে তিন দিনের ভিতর তার সাথে আগে সালাম দিয়ে কথা বলা।

(৯) 'যে জনসাধাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।' কারও প্রতি কৃত উপকারের জন্য তাকে ধন্যবাদ দেয়ার উত্তম উপায় হচ্ছে তাকে– 'জাযাকাল্লাহু খইরান' বলা।

(১০) কোন ব্যক্তি হারাম বা অনাকাঙ্খিত কোন বিষয় ছাড়া সাহায্য চাইলে মুসলিমের উচিত তাকে সাহায্য করা। কেউ সহযোগিতা চাইলে তাকে দ্বিধাহীন চিত্তে সাহায্য করা।

(ঘ) সামাজিক বিধি-বিধান জানা ও পালন করা

মার্জিত ও ভদ্র ভাষায় কথা বলা : কথা বলা যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশও বটে। তাই–

---

৮৬. আল কুরআন, ৭ : ৩৩

৮৭. আলাউদ্দিন ইবন হুসামুদ্দিন আল-হিন্দি, *কানযুল 'উম্মাল*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), খ.৯, হাদিস নং ২৫২৪১, পৃ. ১১৩-১১৪

(১) প্রত্যেক মুসলিমের মিতভাষী হওয়া উচিত এবং এটা একটা উত্তম গুণ। হাদিসে বলা হয়েছে, 'কেউ হয়ত ভাল কথা বলবে অথবা নীরব থাকবে।'[৮৮]

(২) যাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে তাদের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানো সৌজন্যের নিদর্শন। রাসুল সা. বলেছেন, 'প্রত্যেকটা সৎকাজই সদকা। তোমার কোন ভাইয়ের সঙ্গে হাসি মুখে মিলিত হওয়া এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত।'[৮৯]

(৩) দ্রুত কথা বলা উচিত নয়। অতি ধীরে বা অতি দ্রুত কথা বলা, অতি উচ্চ বা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা বলা উচিত নয়। যার ফলে শ্রোতারা বিতৃষ্ণা হয়ে পড়ে।

(৪) মুসলিমদের অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং কেউ খুশি হোক বা অখুশি হোক সত্য কথা বলতে হবে। তিক্ত হলেও তাকে সত্য কথা বলতে হবে।

(৫) মুসলিমদের কথা বলার আগে সর্তক চিন্তা করতে হবে এবং এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে তাকে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা চাইতে হয়।

(৬) প্রত্যেক মুসলিম যা বলেছে তার সত্যতা ও নির্ভুলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

(৭) প্রতিটা ঘটনার সাথে একটা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পৃক্ত থাকে। এজন্য আলোচিত বিষয় ও ঘটনার মধ্যে শিষ্টতা ও যথার্থতা থাকতে হবে। শাঁিআতের প্রয়োজনে হিকমত সহকারে অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা।

(৮) বক্তৃতা শ্রবণরত লোকেরা যদি বক্তার বক্তব্য অনুধাবন করতে না পারে এবং বক্তৃতার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়, তাহলে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা ভদ্রতার নির্দশন।

(খ) কথাবার্তায় গ্রহণযোগ্য ভাষা ব্যবহার করা : অযাচিত কথা ও অশালীন শব্দ যতদূর সম্ভব পরিহার করা এবং সহজে বোধগম্য নয়, এমন বিদেশি শব্দ ও পরিভাষা পরিহার করা উচিত। এজন্য উচিত–

(১) প্রত্যেকের উচিত শ্রুতিমধুর, গ্রহণযোগ্য এবং নৈতিক প্রকাশভঙ্গি অর্জন করা।

(২) মুসলিমের পক্ষে কারও প্রতি অভিশাপ দেয়া শোভনীয় নয়।

(৩) প্রত্যেক মুসলিমের অপশব্দ বা আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা অনুচিত। তাকে কর্কশ ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্তক থাকা বাঞ্চনীয়।

(৪) মৃত ব্যক্তিদের গালিগালাজ করা অন্যায় এবং জীবিতদের প্রতি গালিগালাজের ন্যায় তা একইভাবে নিষিদ্ধ। রাসুল সা. বলেছেন, من حسن إسلام الْمرء ما لا يعنيه 'কোন ব্যক্তির ইসলামি সৌন্দর্য ও গুণের অন্যতম হল অনর্থক আচরণ পরিত্যাগ করা।'[৯০]

(৫) নিজের ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করা এবং আল্লাহর প্রতি অবিচার করার অভিযোগ মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত দোষণীয় এবং তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

(৬) নিজের প্রতি, নিজের সন্তানদের প্রতি, গৃহ ভৃত্যদের প্রতি অভিসম্পাত করা নিষিদ্ধ।

(৭) কোন ব্যক্তি থেকে যদি কেউ কিছু জানতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে সালাম-সম্ভাষণ জানাবে, ঐ সময় তিনি কি ধরনের কাজে ব্যস্ত আছেন তা বিবেচনা করবে, তারপর প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলবে।

---

৮৮. আলাউদ্দিন আলি ইবন বলবান আল-ফারিসি, *সহিহ ইবন হিব্বান*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৮), খ.২, হাদিস নং ৫০৬, পৃ. ২৫৯

৮৯. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী র., *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০২), খ.৪, হাদিস নং ১৯৭৬, পৃ. ৩৯৩

৯০. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৩২০, পৃ. ৬০৬

(৮) কোন মুসলিম যে বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট নয়, সে ব্যাপারে না বুঝে কথা না বলাই শ্রেয়।

(৯) কোন মুসলিম অন্য কোন ব্যক্তির সমালোচনা বা গালিগালাজ বা তার দোষ-ত্রুটি বলবে না, যদিও ঐ ব্যক্তি তাকে সমালোচনা বা গালিগালাজ করে এবং তার দোষত্রুটি ধরিয়ে দেয়।

(১০) প্রকৃত মুসলিমের কাজ হচ্ছে, যারা অহরহ অন্যের সমালোচনা করে তাদের থামিয়ে দেয়া।

(১১) কোন মুসলিমকে কাফির, ফাসিক, মুশরিক বলা বা তার ইমান নেই– এ ধরনের কথা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ।

(১২) কোন মুসলিম যখন নবী কারিম সা. সম্পর্কে কথা বলবে অথবা তার সাক্ষাতে নবী কারিম সা.-এর কথা বলা হয়, তখনই সে বলবে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এবং এটা বলা সুন্নাত।

(১৩) অন্যদের সাথে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। এটা একজনের মধ্যে সীমিত রাখাই শ্রেয়।

(১৪) কোন মুসলিম আল্লাহর ইচ্ছার উল্লেখ ছাড়া ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে নির্দেশাত্মক পরিভাষা ব্যবহার করবে না। বলবে, 'ইনশাআল্লাহ' (আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন)।

(১৫) কোন মুসলিম বক্তৃতায় বা কথাবার্তায় অন্যের প্রতি দোষারোপ বা গালিগালাজ করবে না, তেমনি সে নিজের প্রতিও দোষারোপ করবে না; বরং কায়মনোবাক্যে দু'আ করবে। আল্লাহপাক বলেছেন, رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আমাদের রব! পৃথিবীতে আমাদের কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও; আর সর্বোপরি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দাও।'[৯১]

(১৬) কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের আর কোন নারী অন্য কোন নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না এবং তাকে মন্দ নামে ডাকবে না। কারণ ইমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত অপরাধ। যারা এসব পরিত্যাগ না করে কুরআনের দৃষ্টিতে তারা যালিম।

(গ) শারি'আত সম্মত শপথ বা মানত পূরণ করা

(১) যতদূর সম্ভব ভাল কাজের শপথ করা এবং শপথ করে তা পালন করতে এগিয়ে যেতে হবে।

(২) মুসলিমরা শুধু আল্লাহ, তাঁর কোন সিফাতের নামে শপথ করবে। নবী, সালাত, কা'বা অথবা কুরআনের ন্যায় কোন কিছুর নামে শপথ করতে পারে না।

(৩) কথায় কথায় আল্লাহর নামে কসম করা উচিত নয়, খারাপ কাজে আল্লাহর নামে শপথ করা মহাপাপ।

(৪) কোন উদ্দেশ্য পূরণার্থে মানত করার পর যদি সেটা পূরণ হয় তবে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর পুরণ না হলেও মানত আদায় করা উত্তম। না হলে সেটা মিথ্যা হবে। আল্লাহপাক বলেছেন, فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ 'মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিশাপ।'[৯২]

(৫) যদি কোন মুসলিম কোন কিছু সম্পাদনের বা কোন কিছু থেকে বিরত থাকার শপথ নেয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেখে যে, কিছু কাজ করাই উত্তম, তাহলে তার শপথ পূরণ না করা উচিত এবং সে জন্যে কাফফারা আদায় করা উচিত। শারি'আতে বৈধ এমন বিষয় ছাড়া মানত করা যাবে না।

(৬) মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে– শপথ পূরণ করা। সুতরাং শপথ করার আগে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, অঙ্গীকার পূরণের সামর্থ্য তার আছে কি না?

---

৯১. আল কুরআন, ২ : ২০১

৯২. আল কুরআন, ৩ : ৬১

(৭) আল্লাহর নামে মানত করলে তা অবশ্যই পূরণ করবে এবং অন্যের নামে মানত করা হলে তা পূরণের ব্যাপারে মানত এড়িয়ে ইচ্ছা পূরণের সাথে শপথকে সংশ্লিষ্ট করা।

(৮) কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন ব্যবসা বা আর্থিক লেনদেনে মালের গুণ প্রকাশ করে শপথ করা উচিত নয়।

(৯) কোন মুসলিম যদি ইসলাম বিরোধী কোন কাজ সম্পাদন করতে শপথ নেয়, তাহলে তার শপথ পূরণ না করা উচিত কাফফারা আদায় করা কর্তব্য।

(১০) কোন বিশেষ কাজের জন্য মানত করা তবে এটা শুধু শারি'আতে বৈধ ও আল্লাহর নামেই করা যেতে পারে।

(১১) কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন জন্তু মানত করলে, সে যদি প্রাথমিক পর্যায়ে এর গোশত খাওয়ার নিয়ত না করে থাকে, তাহলে এ গোশত খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি।

(ঘ) ধৈর্য সহকারে অন্যের কথা শ্রবণ করা

(১) যতদূর সম্ভব ভদ্রতার সঙ্গে অন্যের কথা বা আলোচনা ধৈর্য্য সহকারে শুনতে হবে।

(২) যে ব্যক্তির সাথে কথা বলা হচ্ছে, তার মুখোমুখি হয়ে কথা বলা উচিত এবং তার বক্তব্য আগ্রহের সাথে শোনা উচিত।

(৩) অন্যরা যখন কথা বলবে, তখন তাদের বাঁধা না দেয়া উচিত।

(৪) যে ব্যক্তির সাথে সে একমত নয়, এমন ব্যক্তির সাথে যুক্তিহীন কথাবার্তায় জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

(ঙ) সঙ্গত কারণ ছাড়া কৌতুকচ্ছলে হাসি-ঠাট্টা বৈধ নয়

(১) অন্যরা হাসছে এ জন্য হাসতে হবে, তা ঠিক নয়। হাসির বৈধ কারণ থাকতে হবে।

(২) আল্লাহ ও রাসুল সা.-এর ভয়ে মুসলিমের জন্য পৃথিবীতে কম হাসা ও বেশি কাঁদার নির্দেশনা এসেছে।

(৩) অট্টহাসির চেয়ে যে হাসিতে দাঁতের কিছু অংশ পর্যন্ত দেখা যায়, সেরূপ মুচকি হাসি উত্তম।

(৪) হাসির উচ্চস্বর নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত; উচ্চ শব্দ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৫) হাসির জন্য হাসা– বিশেষতঃ তা যদি মিথ্যার জন্য হয়– তাহলে মুসলিমদের হাসা অনুচিত।

(৬) উচ্চশব্দে বা অরুচিকর শব্দের হাসি অর্থাৎ অট্টহাসি দেয়া উচিত নয়।

(৭) অন্য ব্যক্তিকে উপহাসের জন্য হাসা নিষেধ; বরং তা গর্হিত অপরাধ।

(চ) বিনা ওযরে কান্নাকাটি করা

(১) ছলনা করে মানুষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কাঁদা উচিত নয়; বরং তা অবৈধ। এটা সচ্চরিত্রের কাজ নয়। রাসুল সা. বলেছেন, إن من خياركم أحسنكم أخلاقا 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যার নৈতিক চরিত্র সর্বোত্তম।'[৯৩]

(২) অসৎ উদ্দেশ্যে বা প্রলাপ করে উচ্চ স্বরে কাঁদা মানুষের জন্য ঠিক নয়।

(৩) আবেগ দমন করা যাচ্ছেনা বলে কাঁদা কাপুরুষের কাজ। তথাপি সংযতভাবে কাঁদা যায়, তবে তা অতিরিক্ত বা উচ্চস্বরে চিৎকার করে নয়। সঙ্গতকারণ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কান্না আসা উচিত।

(৪) নিজের সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে মানুষের জন্য শব্দ না করে কাঁদা জায়িয।

---

৯৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, আগস্ট ২০১৬), খ.৬, হাদিস নং ৩৩০৭, পৃ. ১৭৯-১৮০

(ছ) ঠাট্টা বা তামাশা করা

(১) হাসি-ঠাট্টায় অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না বা তামাশাচ্ছলেও মিথ্যা বলা যাবে না।

(২) হাসি-তামাশার সময় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অভদ্র বা পীড়াদায়ক ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৩) অতিরিক্ত গাম্ভীর্য এবং বেশি হাসি-তামাশা পরিত্যাজ্য; কারণ, এর ফলে আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার এবং অন্যের অনুভূতিতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে।[৯৪]

(৪) অন্যকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে অভিনয় বা কৌতুকের মাধ্যমে কোন কিছু প্রদর্শন করা যাবে না।

(৫) তামাশার সাথে অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি বা শারীরিক কসরত প্রদর্শন না করা।

(৬) তামাশাচ্ছলে অন্যের জিনিসপত্র নেয়া বা গোপন করা যাবে না।

(জ) অন্যদের সাথে সাক্ষাৎকালে আচরণ

(১) অন্য মুসলিমদের সম্ভাষণ জানাতে তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

(২) তাকে হাসতে হবে। কারণ, যে কোন সফল সাক্ষাতের জন্য হাসি অপরিহার্য। তবে শুধু পার্থিব সম্পদের অধিকারী লোকদের দেখে হাসা উচিত নয়।

(৩) ব্যক্তি বা উপলক্ষ যা হোক, সম্ভাষণ জানানোর সময় কারও প্রতি মাথা নত করা যাবে না।

(৪) অন্য লোকদের সাথে সাক্ষাৎকালে এবং সম্ভাষণের পর ডান হাত প্রসারিত করে করমর্দন করতে হবে। এর ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বাড়ে।

(৫) বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়, এমন ব্যক্তির সাথে করমর্দন করা যাবে না।

(৬) যে ব্যক্তি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত তার সাথে করমর্দন করা আবশ্যক নয়।

(৭) দেখা-সাক্ষাৎ শেষ হলে পুনরায় করদর্মন করে বলতে হবে 'আসসালামু আলাইকুম'।

ঝ. সাক্ষাতে সম্ভাষণ জানানোর আদব

(১) সাক্ষাতে সম্ভাষণ জানানোর অভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ফলে বন্ধুত্ব ও পরিচিতি বাড়ে। এটা হৃদ্যতা ও সৌজন্যের কাজও বটে।

(২) যে ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে বা গাড়িতে যাচ্ছেন, তিনি হাঁটারত ব্যক্তিকে, চলমান ব্যক্তি বসা অবস্থার লোককে এবং ছোট দল বড় দলকে সম্ভাষণ জানাবে।

(৩) মুসলিম বা অমুসলিম যেই হোক না কেন, কেউ সম্ভাষণ জানালে তার জবাব দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। অমুসলিম হলে মুসলিমদের পরিভাষায় 'আসসালামু আলাইকুম' বলা যাবে না।

(৪) হাতের আঙ্গুল বা তালু প্রদর্শন করে অথবা মাথা নুইয়ে লোকদের সম্ভাষণ জানানো অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

(৫) যে কোন সম্ভাষণের জবাব একইভাবে বা তার চেয়ে ভালভাবে দেয়া হচ্ছে সৌজন্যের দাবি। যেমন, আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জবাব হচ্ছে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

(৬) মুসলিমদের সম্ভাষণ জানাতে হবে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে। এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ হলে ইমানের দাবি হল, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 'আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক'[৯৫] একথা বলতে হবে।

---

৯৪. আল কুরআন, ৪৯ : ১১

(৭) যদি কেউ একদল লোককে সম্ভাষণ জানায় এবং এ দলের কোন সদস্য তার প্রত্যুত্তর দেয় তাহলে তাই যথেষ্ট; তবে দলের সকল সদস্য জবাব দিলে ভাল হয়।

(৮) কোন মুসলিম যদি মনে করে, কোন কারণে অন্য লোকেরা তার 'সালাম' শুনতে পায়নি, তাহলে তাকে পুনরায় অথবা তৃতীয়বার সালাম দিতে পারে।

(৯) কোন অমুসলিমের কাছে বার্তা পাঠালে তাকে লিখিতভাবে সম্ভাষণ জানান যায়, 'আসসালামু আলা মান ইত্তিবা'আল হুদা' অর্থাৎ যারা হিদায়াতের পথে আছে তাদের প্রতি সালাম।

(ঞ) অপরের বাসগৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি প্রার্থনা

(১) কোন বাড়িতে প্রবেশের আগে অনুমতি চাওয়ার পূর্বে যেই জবাব দিক না কেন, দর্শনার্থীরও উচিত প্রথমে তাকে স্বাগত জানান। ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার ধরন হবে এমন, 'আসসালামু আলাইকুম; আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি?' কমপক্ষে তিনবার। কাউকে স্বাগত জানানোর জন্য দরজা খোলা হলে বা কাউকে খোঁজ নেয়ার জন্য জানালার ফাঁকে গৃহে উঁকি দেয়া নিষিদ্ধ।

(২) অনুমতি না নিয়ে কোন মুসলিমের পক্ষে কারও গৃহে প্রবেশ করা উচিত নয়। পিতামাতার ন্যায় যারা ঘনিষ্ঠজন তাদের কাছ থেকেও অনুমতি নেয়া সৌজন্য বিশেষ। কারণ গৃহে লোকজন এমন কোন পোশাক বা অবস্থায় থাকতে পারে যা তারা অন্যকে দেখাতে রাজি নয়। বিশেষ করে এটা মহিলাদের বেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মহিলাদের কাপড় ঠিক করতে, চুল ঢাকতে সময় দেয়া প্রয়োজন।

(৩) একই পরিবারে পিতামাতার গৃহেও ঢোকার অনুমতি চাওয়া অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে তিন সময়। ফযরের নামাযের সময়, দ্বিপ্রহরে এবং ইশার নামাযের পর।

(৪) দরজা খোলার আগে দর্শনার্থীকে যদি তার পরিচয় বলতে বলা হয়, তাহলে তা অবশ্যই দিতে হবে। শুধু এতটুকু বলা 'এ যে আমি'– এটা ঠিক নয়।

(৫) কারও সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে উত্তম পন্থা হলো– তার দরজার বাইরে অপেক্ষা করা। যতক্ষণ না তিনি নিজ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

(ট) পারস্পরিক সাক্ষাৎ এবং ভাব বিনিময়

(১) কোন মুসলিম তার মেজবানকে তার সফরের ইচ্ছা সম্পর্কে জানাবে। পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি ছাড়া কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে এবং তিনি কোন কারণে তাকে স্বাগত জানাতে অনিচ্ছুক হলে, তার বিষণ্ন হওয়া উচিত হবে না।

(২) মুলাকাতকারী যদি পেশাব-পায়খানা করতে চায়, তাহলে মেজবানকে জানিয়ে স্থান ত্যাগ করবে।

(৩) রাতের বেলা, ইশার নামাজের পর বা দিবসের ঘুমের সময় ছাড়া পরিদর্শন করতে যাওয়া উচিত।

(৪) পূর্ব-নির্ধারিত সাক্ষাৎ অবশ্যই ত্বড়িৎ সম্পাদন করতে হবে। পূর্বে নির্ধারিত সময়সূচি পরিবর্তন করার বা বাতিল করার ন্যায়সংগত কারণ থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের উচিত তা অন্যপক্ষকে জানিয়ে দেয়া।

(৫) মেহমান কখনও মেজবানের সামনে ইমামতি করবে না অথবা তার অনুমতি ছাড়া মেজবানের নির্দিষ্ট স্থানে বসবে না।

---

৯৫. ইমাম আবূ দাউদ রহ., অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবু দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৪), খ.৫, হাদিস নং ৫১০৫, ৫১০৬, পৃ. ৬৩৪

(৬) গৃহকর্তার উচিত মেহমানকে যথোপযুক্ত সম্মানের সাথে আপ্যায়ন ও তার ভাল-মন্দ দেখা শোনা করা।

(৭) যে মহিলার স্বামী বাড়িতে নেই, সেক্ষেত্রে 'মাহরাম' ছাড়া তার বাড়িতে যাওয়া পুরুষদের উচিত নয়।

(৮) পূর্ব-নির্ধারিত হলেও কোন মুসলিম অনুমতি না পাওয়া এবং তাকে সম্ভাষণ না জানানো পর্যন্ত মেজবানের গৃহে প্রবেশ করবে না।

(৯) অন্য পরিবারের সঙ্গে মুলাকাত কালে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ। মেজবানের স্ত্রী সঠিক পোশাকে আবৃত হয়ে মেহমানদের আপ্যায়ন করতে পারে।

(১০) মেহমানকে স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি কারও বাড়িতে গেছেন। গৃহকর্তার অনুমতি সর্বাগ্রে অগ্রগণ্য।

(১১) স্বামী আপত্তি করলে স্ত্রীর উচিত নয় কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া।

(১২) মেজবান কোন কিছু খেতে দিলে চিকিৎসাগত কারণ অথবা রোজা না থাকলে অসম্মতি জানানো অভদ্রতার শামিল। এক্ষেত্রে ক্ষমা চেয়ে প্রত্যাখ্যানের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

(১৩) কোন মুসলিম অন্যের সঙ্গে মেহমান হিসেবে অবস্থানকালে যদি রোজা রাখতে চায়, তাহলে মেজবানকে তার ইচ্ছার কথা জানানো সৌজন্য বিশেষ।

(ঠ) মেহমানকে স্বাগত জানানো

(১) মুসলিমদের উচিত মেহমানকে আন্তরিকতার সাথে এবং সহাস্যে স্বাগত জানানো। মেহমানের প্রতি সম্মান ও আপ্যায়ন করা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যতম কর্তব্য। হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।'[৯৬]

(২) মেজবানের উচিত মেহমানের কাছ থেকে বিরক্তির সকল উৎস দূরে সরিয়ে রাখা।

(৩) মেহমানকে কোন প্রকার কাজ সম্পাদন করতে বলা সমীচিন হবে না; বরং তা অভদ্রতা।

(৪) কোন মুসলিমের কাছে মেহমান সাক্ষাৎ করতে আসলে সামর্থ অনুযায়ী সমাদর করা এবং তাকে উত্তম খাদ্য ও পানীয় দেয়া কর্তব্য।

(৫) মেহমান বাড়িতে এসে অসুস্থ হলে তাকে সর্বোত্তম সেবা দিয়ে সুস্থ্য করে তুলতে হবে।

(ড) লোকদেরকে আপ্যায়ন করানো

(১) কোন মুসলিম তার সাফল্যের গর্ব করার ইচ্ছা না থাকলে অন্যান্য লোকদের আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

(২) অন্যান্যদের দা'ওয়াত দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও ভাল মুসলিমদের আপ্যায়নের জন্য দা'ওয়াত দিতে হবে। মুসলিমদের দা'ওয়াত দেয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৩) আকস্মিকভাবে কোন মেহমান এসে গেলে মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে তার সুষ্ঠু মেহমানদারি করা।

(৪) মেহমানদের পানাহার করতে বলা এবং বিশেষ ধরনের খাবার গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়া করা উচিত নয়।

(৫) শুধু বিশেষ সময়ে আমন্ত্রণ জানানো উচিত নয়। আমন্ত্রণ যে কোন সময় করা যেতে পারে।

(৬) আপ্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রতিবেশীদেরও আমন্ত্রণ জানানো উচিত।

---

৯৬. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারি ২০১৫), খ.১, হাদিস নং ৭৯, পৃ. ১১০

(৭) খাবার দেয়ার সাথে সাথে মেহমানরা খেতে শুরু করতে পারলেও তাদের প্রতি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাবার শুরু করতে বলা উত্তম। রাসুল সা. বলেছেন, بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا 'আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমাদের রিযিকে বরকত দাও।'[৯৭]

(ঢ) কোন ব্যক্তি থেকে আমন্ত্রিত হলে করণীয়

(১) কোন মুসলিমকে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ করা হলে তা গ্রহণ করা উচিত। বিবাহের আমন্ত্রণ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে; যদি সেখানে নিষিদ্ধ কিছু না থাকে।

(২) প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে ভোজ উৎসবের আয়োজন করা হলে এ আমন্ত্রণে সাড়া দেয়া অনুচিত।

(৩) কেউ নফল রোজা রাখা অবস্থায় আমন্ত্রিত হলে রোজা ভঙ্গ করা অথবা এ আমন্ত্রণ রক্ষা করার স্বাধীনতা তার রয়েছে।

(৪) খাবার পরিবেশন করা হলে তাড়াহুড়া করে খাবার টেবিলে যাওয়া ভদ্রোচিত ব্যাপার নয়। উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, তার ডানের ব্যক্তিকে অনুসরণ করা।

(৫) খেতে বসার আগে পবিত্রতা অর্জন ও ইসলাম নির্দেশিত রীতিনীতি মানতে হবে। হাদিসে এসেছে, الطهور شطر الإيمان 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।'[৯৮] এছাড়া হাদিসে আরও এসেছে, كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع 'প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ বলা না হয়, তাহলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।'[৯৯]

(৬) মেহমান দা'ওয়াতের জন্য মেজবানকে ধন্যবাদ দিবেন এবং তার জন্য আল্লাহপাকের রহমত কামনা করবেন।

(ণ) কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া

(১) অসুস্থদের দেখতে যাওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে নিলে ভাল হয়, তবে তা জরুরি নয়। অসুস্থরা হাসপাতালে থাকলে রোগী পরিদর্শনের সময়সূচি মেনে চলতে হবে এবং সেখানে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা থাকলে তাও মেনে চলতে হবে।

(২) অসুস্থদের দেখতে গেলে, তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে হবে, তারা অধিকতর স্বস্তিবোধ করেন।

(৩) কোন মুসলিমের অসুস্থ ব্যক্তিকে তার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। অসুস্থ ব্যক্তি তার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠতাবোধ করলে তার কাছে যখন প্রয়োজন হয় যাওয়া দরকার।

(৪) পরিদর্শনকারীকে রোগীর পাশেই বসতে হবে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

(৫) রোগী পরিদর্শনকালে তার আরোগ্যের জন্য দু'আ করা উচিত। এ অসুস্থতা পাপ মোচনের জন্যও হতে পারে।

---

৯৭. ইমাম আহমাদ মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৯৯৫), খ.২, হাদিস নং ১৩১২, পৃ. ১৪১-১৪২

৯৮. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারি ২০১৫), খ.১, হাদিস নং ৪২৭, পৃ. ২৬৪

৯৯. ইমাম আলি ইবন উমর আদ-দারু কুতনি, *সুনানু আদ-দারু কুতনি*(বৈরুত : দারু ইবন হাজম, ২০১১), কিতাবুস সালাত, পৃ. ১৯১

(৬) কুষ্ঠ রোগী বা এ ধরনের রোগ বা পঙ্গু ব্যক্তির প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকানো উচিত নয়, যদি তারা এতে অপমানবোধ করে। বন্ধু, প্রতিবেশী বা আত্মীয় অমুসলিম হলেও, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতে হবে।

(৭) পীড়িত ব্যক্তির অবস্থা নৈরাশ্যকর অবস্থায় উপনীত হলে বলতে হবে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তার দিকেই ফিরে যাব।'[১০০]

(ত) সামাজিকভাবে একত্রে বৈঠক করা

(১) অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত দু'ব্যক্তির মাঝখানে বসা শোভনীয় নয়, কেননা তারা হয়ত একান্তভাবে আলাপ করছে অথবা কোন গোপন কথা বলছে।

(২) কোন ব্যক্তির বসা অবস্থায় বিনীতভাবে এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বসা উচিত।

(৩) যদি কেউ ফিরে আসে এবং প্রয়োজনে তার আসন ছেড়ে বাইরে যায়, তাহলে এ আসনের অধিকার তারই এবং অন্যদের উচিত নয় এ আসন দখল করা।

(৪) কোন সমাবেশে যোগ দিলে কোন ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত স্থানে আসন নিতে হবে, নতুবা তাকে যে কোন খালি জায়গায় বসতে হবে।

(৫) সমবেত হওয়ার স্থানও মর্যাদাপূর্ণ হওয়া চাই; যেমন, মসজিদ, রাস্তা বা বাজার নয়।

(৬) মেলামেশার সময় কারও শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ বা মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরুলে তাকে এড়িয়ে যেতে হবে।

(৭) অন্যদের কথা শোনা ভদ্রতা বিশেষ এবং বাঁধা দেয়া বা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা উচিত নয়।

(৮) তিনের অধিক মানুষ উপস্থিত থাকলে, এদের মধ্যে দু'জন একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে পারে।

(৯) নিজে বসার লক্ষ্যে কাউকে তার আসন ত্যাগের জন্য বাধ্য না করা।

(১০) কোন সমাবেশে কেউ যোগ দিলে তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সহাবস্থান সকলের জন্য প্রযোজ্য।

(১১) কোন স্থানে তিন ব্যক্তি থাকলে, তন্মধ্যে দু'জন তৃতীয় জনকে বাদ রেখে একান্তে আলোচনা না করা।

(১২) কারও প্রতি পিছন ফিরে বসা উচিত নয় কেউ এটাকে অশ্রদ্ধা বা অসম্মান হিসেবে ধরে নিতে পারে। এমন কাজের পরিবর্তে ভাল ব্যবহার ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিতে হবে। রাসুল সা. বলেছেন, ما من شيء أثقل في الْميزان من حسن الخلق 'মিযান বা দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র।'[১০১]

(১৩) সমাবেশে বেশি লোকজন আসলে যারা পূর্ব থেকে বসা ছিল, তারা নতুনদের জন্য জায়গা করে দিবে।

(১৪) ইশার নামাজের পর শিক্ষামূলক অথবা কোন অতিথির সৌজন্যতা ছাড়া বৈঠকাদি করা অনুচিত।

---

১০০. আল কুরআন, ২ : ১৫৬

১০১. ইমাম আবূ দাউদ রহ., অনূ. ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবূ দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৪), খ.৫, হাদিস নং ৪৭২৪, পৃ. ৪৭৪

(থ) কোন স্থানে বসার নিয়ম

(১) বসার সময় অন্যদের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হওয়া যাবে না। অন্যদের সামনে পা ছড়িয়ে দেয়া অথবা অন্যদের চাইতে উঁচু আসনে বসা উচিত নয়।

(২) কোন স্থানে বসার সময় মার্জিতভাবে ও শরীরের গোপন অংশ ভালভাবে ঢেকে বসতে হবে।

(৩) বসার সময় বাম পা পিছনে ফেলে অন্যের হাতের উপর ঠেস দিয়ে বসা অনুচিত।

(৪) কোন ব্যক্তি তার দেহের একাংশ সূর্যালোকে এবং অপরাংশে ছায়ায় রেখে বসবে না।

(৫) মেঝেতে বসে একত্রে আহার করা উত্তম। অন্যদের দিকে পা দিয়ে বসা উচিত নয়।

(দ) নিজ গৃহের বাইরে মহিলাদের চলাফেরার আদব

(১) যে নারী সুগন্ধী, মেক-আপ অথবা প্রসাধনী ব্যবহার করেছে, মেক-আপ অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রসাধনীর গন্ধ থাকা পর্যন্ত তার গৃহ ত্যাগ করা সমীচীন নয়।

(২) কোন নারী ও পুরুষ 'মাহরাম' না হলে অথবা স্বামী-স্ত্রী না হলে তাদের নিভৃতে থাকার অনুমতি নেই। কারণ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সেখানে শয়তান কাজ করে।

(৩) কোন নারী তার স্বামী অথবা 'মাহরাম' পুরুষ না হলে তার বাড়িতে রাত কাটাবে না। নবী কারিম সা. বলেছেন, أكمل الْمؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 'মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই পূর্ণতম ইমানের অধিকারী যার নৈতিক চরিত্র সর্বোত্তম।'[১০২]

(৪) কোন মহিলার প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি মহিলার হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। আকস্মিক দৃষ্টিপাত অনুমোদনযোগ্য, তবে দ্বিতীয়বার তাকানো নিষিদ্ধ।

(৫) প্রয়োজনে নারীরা ঘরের বাইরে বের হলে তাদের বক্ষদেশে ও লজ্জাস্থানে উত্তম আবরণে ডেকে পর্দা সহকারে বের হবে। লম্বা ও ঢিলেঢালা পোশাক ব্যবহার করবে।

(৬) নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা অথবা সামাজিক আচরণ দু'ধরনের : (ক) এক ধরনের মেলামেশা হচ্ছে প্রকাশ্যে এবং তা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত নয় এবং সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রচলিত। যেমন, রাজপথ, বাজার এবং মসজিদ। এসব ক্ষেত্রে মেলামেশার অনুমতি রয়েছে। তবে উপর্যুক্ত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনে নারীরা যুদ্ধ ক্ষেত্রেও যেতে পারবে। (খ) বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কর্মস্থলের মত বিশেষ সীমিত স্থানসমূহে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা হারাম এবং এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পৃথকীকরণ প্রয়োজন।

(৭) বাড়ির বাইরে বা ঘরের ভিতর থেকে কোন মহিলা পুরুষের সাথে কথা বললে তা আকর্ষণীয় স্বরে বলা উচিত নং; বরং তা হবে যথাযথ এবং সংক্ষিপ্ত।

(৮) পুরুষের জন্য অনুমোদিত সকল ব্যবসা মহিলারা করতে পারেন। বাড়ি এবং পরিবারের কোন মহিলার মূল দায়িত্ব পালনে অসুবিধা সৃষ্টি না হলে, স্বামী রাজি হলে এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশা না করতে হলে মহিলারা চাকুরিও করতে পারেন। যেমন, একজন মহিলা শিক্ষকতা করতে বা ডাক্তার হতে পারেন।

---

১০২. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ., *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, হাদিস নং ২৬১৩, পৃ. ৮৬

(৯) কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বাড়ি ত্যাগ করার আগে ইসলামি পোশাক এবং হিজাব পরার ব্যাপারে মহিলাদের স্মরণ রাখতে হবে সর্বাবস্থায় তিনি শা'আতের বিধি-বিধানের ভিতর আছেন কি-না।

(ধ) উৎসব পালন

(১) উৎসব পালন সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : (ক) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ; (খ) কোন মুসলিম আর্থিকভাবে সচ্ছল হলেও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং অপব্যয় না করা।

(২) নববর্ষ, মাতৃ দিবস ও (Mother's Day), পিতৃ দিবস (Father's Day), বিবাহ বার্ষিকী, জন্ম দিবস– এ ধরনের উৎসবের স্থান ইসলামে নেই এবং এগুলো হচ্ছে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুকরণ। তাই এগুলো বর্জনীয়।

(৩) বাহির থেকে বেশ কিছু উৎসবকে ইসলামে চালু করা হয়েছে, যেমন, নবীর জন্মদিন, মহানবী সা.-এর ইসরা ও মিরাজ। এসব উৎসব ইসলাম সমর্থন করে না; এগুলো বর্জনীয়।

(ন) আত্মীয়-স্বজনের সাথে আচরণ

(১) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়া অত্যন্ত জরুরি। রাসুল সা. বলেছেন, من أحب أن يبسط له في رزقه وينسا له في أثره، فليصل رحمه 'যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক; সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে।'[১০৩]

(২) আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাকাত করার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, তবে তারা যাতে অবহেলিত মনে করতে না পারে, সেজন্যে এসব মুলাকাত যথাসম্ভব ঘন ঘন হওয়া প্রয়োজন।

(৩) আত্মীয়-স্বজনের সাথে যখনই মুলাকাত হবে, তখনই তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে হবে।

(৪) মুসলিমদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তার দায়িত্ব রয়েছে। এ জন্য মাঝে-মধ্যে তাদের সহযোগিতা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّه 'তোমরা আত্মীয়-স্বজনের হক বা প্রাপ্য দিয়ে দাও।'[১০৪]

(৫) মুসলিমদের উচিত খালার সাথে তাদের মায়ের মতই এবং চাচার সাথে পিতার মতই আচরণ করা।

(৬) আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে তাদের মুলাকাতের অপেক্ষা না করে নিজেদেরই যাওয়া উচিত।

(৭) পুরুষ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলারা বসতে পারে যদি– (ক) শিষ্টাচার বজায় রেখে তারা আচরণ করে ও (খ) কোন আত্মীয়ের সাথে একা কথা বলা বা আলোচনা না করে।

(৮) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথেও সম্পর্ক বজায়ের চেষ্টা করতে হবে। রাসুল সা. বলেছেন, لا يدخل الجنة قاطع رحم 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১০৫]

(৯) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক ও অধিকার আদায়ে দায়িত্বশীল হতে হবে। এটা ইমানের দাবি।

---

১০৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, হাদিস নং ৫৫৬০, পৃ. ৩৯৭

১০৪. আল কুরআন, ১৭ : ২৬

১০৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, হাদিস নং ৫৫৫৮,পৃ. ৩৯৬

(প) প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

(১) নবী কারিম সা.-এর শিক্ষা অনুসারে প্রতিবেশীর প্রতি উদার হওয়া দরকার। প্রতিবেশীকে মাঝে মধ্যে খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানানো এবং খাবার পাঠানো উচিত। কেউ যেন ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন না করে সে বিষয়ে বিশেষ খোঁজ-খবর রাখা উচিত।

(২) কারও প্রতিবেশী যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে আর সে যদি পেট পুরে খায় বা খোঁজ-খবর না রাখে তবে সে মু'মিন হতে পারবে না। নবী কারিম সা. বলেছেন, من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহপাকও তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন।'[১০৬]

(৩) প্রতিবেশী যদি আত্মীয় হয়, তাহলে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রতিবেশীর বাড়িতে গমন গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে জন্ম, মৃত্যু, অসুস্থতা ও বিবাহের ন্যায় বড় বড় ঘটনায় প্রতিবেশীর কাছে যাওয়া, সাহায্য ও সুপরামর্শ দেয়া প্রয়োজন।

(৫) মহিলা প্রতিবেশীর সাথে সুম্পর্ক বজায় রাখা বিশেষ করে গৃহবধুর দায়িত্ব।

(৬) প্রতিবেশী ও তার পরিবারের বিশেষ অধিকার রয়েছে মুসলিমদের উপর। বিপদ-আপদের সময় তাদের সাহায্য করা হচ্ছে ইসলামি সামাজিক আচরণের দাবি।

(৭) প্রতিবেশীর গোপন কথা গোপন রাখতে হবে অথবা এমন কথা যা বাইরে থেকে শুনেছে, তাও গোপন রাখতে হবে। বিপদে-আপদে সর্বদা তার পাশে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

(৮) শুধু নিকটবর্তী প্রতিবেশীর সঙ্গেই সসুম্পর্ক বজায় রাখলে হবে না; বরং দূরের প্রতিবেশির সঙ্গেও তা রাখতে হবে; অন্তত ৪০ ঘর পর্যন্ত। তিনি মুসলিম বা অমুসলিম, আত্মীয় বা অনাত্মীয় যেই হোক।

উপহার আদান প্রদান : ব্যক্তির মধ্যে উপহার বিনিময়কে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে এজন্য যে, এর ফলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কোন মুসলিম আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে, সে তার বন্ধু-বান্ধাব ও আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দেয়ার চেষ্টা করবে।

(১) অন্যদের উপহার দেয়ার চেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) উপহার পাওয়ার পর মুসলিমদের উচিত তা খুলে দেখা এবং সন্তোষ প্রকাশ করা; সম্ভব হলে দা'ওয়াত জানিয়ে, পত্র লিখে অথবা মৌখিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা।

(৩) সন্তানদের উপহার দানের ক্ষেত্রে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

(৪) কেবলমাত্র বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেই শুধু উপহার ক্রয় ও বিতরণ করা উচিত। কেননা রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر 'তোমরা পরস্পরে হাদিয়া আদান-প্রদান কর, তাতে তোমাদের অন্তরের শত্রুতা, ঘৃণা দূর হয়ে যাবে।'[১০৭] উপরোক্ত বিষয়াবলির সব নির্দেশনা মূলত কুরআন ও হাদিসের অনুসরণে বিবৃত হয়েছে। যা সমাজ জীবন নির্বাহের জন্য পালনীয় ও একান্ত কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত।

---

১০৬. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, হাদিস নং ২২৮০,পৃ. ২৪৩

১০৭. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪, হাদিস নং ২১৩৩, পৃ. ৪৮৫

মহান আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতিপালক। সারা বিশ্বের মানুষ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উম্মত। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 'আমাকে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।'[১০৮] হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রা.-কে রাসুলুল্লাহ সা.-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, كان خلقه القرآن 'তাঁর চরিত্র হল আল-কুরআন।'[১০৯] কেননা, আল্লাহর দেয়া বিধানসমূহকে রাসুল সা. বাস্তব জীবনে রূপায়ন করেছেন। আল্লাহপাক নির্দেশিত তাঁর প্রতিটা কর্মতৎপরতাই ইসলামি জীবন বিধানের অপরিহার্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁর এবং মহান আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব। অন্য কোন মত ও পথের অনুসরণের মাধ্যমে তা সম্ভব তো নয়ই; বরং তা হবে জাহিলিয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ '(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তবে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন।'[১১০] কুরআন মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশ্ব মানবতার জীবন দর্শন। এটা বৈজ্ঞানিক ও সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থায় কোন অপূর্ণতা নেই। আর এ জীবন বিধান রাসুল সা. বিশ্ব মানবতার আশীর্বাদ স্বরূপ আমাদের এনে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেছেন, إِنَّه لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ 'নিঃসন্দেহে এ কিতাব একজন সম্মানিত রাসুলের আনীত। এটা কোন কবির কাব্যগ্রন্থ নয়।'[১১১] এজন্য পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করার অর্থই হল ইসলামি শারি'আতের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। আর এ কথাটার প্রতিধ্বনি আল্লাহপাক কুরআনে করেছেন, يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً 'হে মু'মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভিতরে প্রবেশ কর।'[১১২] ইসলামে পরিপূর্ণরূপে সমাসীন হওয়ার মধ্যেই মানব জাতির সফলতা নিহিত। আর আলোচ্য সুরা আল হুজুরাতে মানুষ হিসেবে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে সমাসীন হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটা নাগরিককে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান অনুসরণ ও রাসুল সা.-এর অনুকরণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাই আবদেল অদুদ মুস্তফা মুরসি বলেছেন,

> 'The Noble Quran has commanded observing justice with those who adopt another religion, seventhly, guaranty of the social solidarity. The most important assurance that Islam povides to the non Muslim Who live in the Muslim society is including them within the system of Islamic Social Solidarity.'[১১৩]

---

১০৮. আলাউদ্দিন ইবন হুসামুদ্দিন আল-হিন্দি, *কানযুল 'উম্মাল*, প্রাগুক্ত, খ.১১, হাদিস নং ৩১৯৬৯, পৃ. ৪২০

১০৯. প্রাগুক্ত, খ.৭, হাদিস নং ১৮৩৭৮, পৃ. ১৩৭

১১০. আল কুরআন, ৩ : ৩১

১১১. আল কুরআন, ৬৯ : ৪০-৪১

১১২. আল কুরআন, ২ : ২০৮

১১৩. Abdel Wadoud Moustafa Moursi El-Scoudi, *Rights of Non Muslims in the Muslims Society*(Selangor : University Kebangsaan Malaysia, 2012), p. 796

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। তিনি একদিকে গোত্রীয় বা সাম্প্রদায়িক আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধর্ম-বর্ণের অহমিকা ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়ার রীতিনীতি পরিহার করেন, অপরদিকে সকলের সাথে সহাবস্থান ও অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেন। খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগেও একই নীতি অনুসৃত হয়। অষ্টাদশ শতকের দিকে মুসলিম শাসনের পতন ঘটায় এবং মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় হওয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটতে শুরু করে। কুরআনের আইন বাস্তবায়ন না থাকায় দিনের পর দিন নিত্য নতুন আঙ্গিকে এর অবনতি ঘটছে। মানুষ নীতি নৈতিকতা হারিয়ে পশুত্বের আদলে আচরণ করছে।

প্রকৃতপক্ষে সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, সংহতি স্থাপন করাই ছিল পবিত্র কুরআন নির্দেশিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য। তিনি মক্কা-মদিনাকে কেন্দ্র করে আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। কালক্রমে এ সমাজব্যবস্থার মডেল আরব বিশ্বসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় সংবিধান পুরোপুরি কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক না হলেও এর সমাজ ব্যবস্থা অনেকটাই কুরআন-সুন্নাহর প্রভাবে প্রভাবিত। উপরোক্ত বিধানাবলি কুরআন-হাদিস ও ইসলামি শারি'আহ নির্দেশিত। তারা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে আইয়ামে জাহিলিয়াতের[১১৪] কুহেলিকা থেকে মুক্ত করে মহৎ জীবন লাভ করেছিলেন। এক কথায় মুহাম্মদ সা. ও সাহাবিগণ সমাজে বসবাসরত মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে শান্তি, সংহতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এগুলো পালনের সাথে সাথে পবিত্র কুরআনের সুরা আল-হুজুরাতের শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গঠন করে পৃথিবীর কোন জনপদে খুলাফায়ে রাশিদিনের আদলে কল্যান রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে ন্যায্য অধিকার লাভ করবে। ইতিহাস তার স্বর্ণোজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

---

১১৪. 'আইয়্যাম' আরবি শব্দ। যার অর্থ– কাল, যুগ বা সময় এবং 'জাহিলিয়া' অর্থ- তমসা, অজ্ঞতা, মূর্খতা, বর্বরতা, অনাচার, পাপাচার, অন্ধকার, গভীর কালো আবরণ, কুসংস্কার, বিপর্যয় বা অরাজকতা ইত্যাদি। সুতরাং 'আইয়্যামে জাহিলিয়া' অর্থ– কুসংস্কার বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। মূলত যে যুগে আরবদের কোন প্রকার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি বা চেতনা ছিল না সে যুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়া' বলা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত ইসা আ.-এর মহাপ্রস্থানের পর হতে ইসলামের অব্যবহিত পূর্বযুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়া' বলে। ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন, 'ইসলামের আবির্ভাবকালের পূর্ববর্তী এক শতাব্দী কালকে আইয়্যামে জাহিলিয়া যুগ বলে।' Philip Kourie Hitti বলেছেন, 'সাধারণভাবে জাহিলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাত

ইসলামই একমাত্র জীবনদর্শন যাতে সমাজ উন্নয়ন, সুনাগরিক গঠন ও মানব কল্যাণের চূড়ান্ত রূপরেখা বিদ্যমান। একটা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে রাষ্ট্রের বহুবিধ দায়িত্ব রয়েছে ঠিক তেমনি নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির ও রয়েছে ব্যাপক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর যেহেতু নাগরিক সমষ্টি কর্তৃক রাষ্ট্র গঠিত হয় তাই এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যই সর্বাধিক। নিজেকে প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন প্রত্যেকটা বিষয় নির্ভর করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মূল্যবোধ এবং এর ভিত্তিতে সৃষ্ট যোগ্যতা ও দায়িত্বানুভূতির উপর। ইসলাম মানুষের চিন্তা, কর্ম, জীবন ও জীবনোদ্দেশ্যকে কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে বিশেষ প্রশিক্ষণের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত করে দেয়, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, মালিক ও নিয়ন্তা। ফলে মু'মিনগণের মনেপ্রাণে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে স্থায়ীত্ব লাভ করে যে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে মানুষ এক চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান জীবনের কর্মফল হিসেবে মানুষকে পুরষ্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। নাগরিকগণের এ অনুভূতিই হচ্ছে ইসলামি সমাজে মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের ভিত্তি। তাই ইসলাম তার কাঙ্খিত ও কল্যাণকর সমাজ তথা রাষ্ট্র বিনির্মাণে নাগরিকদের উন্নত ব্যক্তিত্ব, নৈতিক চরিত্র, পরকালে বিশ্বাস ও নিজেকে আত্মশুদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

সুনাগরিক গঠনে সুরা আল হুজুরাত

ইসলামি রাষ্ট্র তার নাগরিকের উপর কতিপয় অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব অর্পণ করে যা পালন ও বাস্তবায়ন করা যেমন একদিকে আল্লাহতা'আলার নির্দেশ এবং তাঁরই ইবাদাত অপরদিকে সেটা নাগরিকগণের সামাজিক দায়িত্বও বটে। বাস্তবে ইসলাম তার নিজস্ব সমাজনীতি এবং নৈতিক চরিত্রে বলিয়ান নাগরিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ, সুখী, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে তার তুলনায় বিকল্প সমাজ রাষ্ট্র দর্শনের অন্বেষণ একেবারেই অর্থহীন। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সমাজ ছাড়া মানবজীবনের কল্পনা করা যায় না।[১১৫] আল্লাহ বলেছেন, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটামাত্র ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি তাদের সমন্বয়ে বহু সংখ্যাক নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।'[১১৬] ইসলামের আলোকে সাদা-কালোর মর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই, নারী-পুরুষ একের উপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে মর্যাদা ও ফলাফল প্রাপ্ত হবে।

আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করবে নর কিংবা নারী, সে যদি মু'মিন অবস্থায়ই তা সম্পাদন করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের উপর বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না।'[১১৭] মূলত আদর্শ সমাজের তিনটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া,

---

১১৫. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮), খ.৪, পৃ. ১২১

১১৬. আল কুরআন, ৪ : ১

১১৭. আল কুরআন, ৪ : ১২৪; ২ : ২২৮; ৩৩ : ৩৫

(২) সমাজে পারস্পরিক সম্মান, হৃদ্যতা, সৌহার্দ, অধিকার রক্ষা ও সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা এবং (৩) পিতামাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও সকল পর্যায়ের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকা।[১১৮] ইসলামি সমাজে একজনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, সম্পদ ও সম্মান অন্যর নিকট পবিত্র অমানত।[১১৯] এ সমাজে এমন নির্মল পরিবেশ বিরাজ করবে যে, একে অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে, কোন অন্যায় বা অপরাধ দেখলে সম্মিলিত প্রয়াসে তা দূর করবে এবং প্রত্যেকের অনুভূতি হবে এমন, 'আল্লাহর নিকট মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি ইমান বা উন্নত চরিত্র।[১২০] হিংসা-বিদ্বেষ, কুৎসা রটনা, পরশ্রীকাতরতা, সন্দেহ পোষণ ও কষ্টদায়ক আচরণ ইসলামি সমাজে সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। আর এ সব কিছুর শিক্ষা আলোচ্য সুরা আল হুজুরাতের অন্তর্ভুক্ত।

এ সমাজে এমন একটা সাবলীল পরিবেশ বিরাজ করে যেখানে মানুষের উপর মানুষের কোন প্রভূত্ব থাকে না, সকল মানুষই এক আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। এ সমাজের নাগরিকগণ সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ও আমানতদারির সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটা স্তরে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বাছাই করবে, আর যালিমের অত্যাচার থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর আইনের সীমার মধ্যে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক আনুগত্য করবে। প্রত্যেক নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত থাকবে, থাকবে সুশৃঙ্খল আর ঐক্যবদ্ধ। আর রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় মানুষ নিজের স্বাভাবিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধনের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ লাভ করবে।

ইসলামের আলোকে নাগরিক : ইসলামি সমাজব্যবস্থায় নাগরিক বলতে কেবলমাত্র সে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকেই বুঝানো হয়, যারা সে সমাজে বসবাসরত এবং বিদ্যামান সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত। ইসলামি সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে, 'আল্লাহর অনুগত, নেক ও সৎ বান্দা তৈরি করে মানুষের স্বাভাবিক যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা।

মানুষের মানুষিক, দৈহিক ও কর্মগত নৈতিক দিক থেকে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে এমন উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যেন তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকতে পারে এবং বিশ্বে তাঁর মর্জি মুতাবিক জীবন যাপন করতে পারে। তাছাড়া স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাদের উপর যে সব ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা পুরোপুরি আদায় করে পৃথিবীতে উন্নতি সাধন ও পরকালে আল্লাহর করুণা লাভ করতে পারে।[১২১] এ কারণে ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিক দু'ধরনের। (১) মুসলিম নাগরিক ও (২) অমুসলিম নাগরিক

---

১১৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.), অনূ. আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*(ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সং., ২০০৪), পৃ. ২২৩

১১৯. বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও মান-সম্মান সব কিছুই পরস্পরের জন্য আজকের দিনের মত সম্মানিত ও পবিত্র।' দ্র. যায়নুল আবেদীন রাহনুমা, অনূ. আবু জাফর, *বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স.)*(ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৬০৪

১২০. ইমাম বুখারী, অনূ. মাওঃ মুহাম্মদ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *আল আদাবুল মুফরাদ*(ঢাকা : ইফাবা, ৩য় সং., ২০০৪), হাদিস নং ৩০৮, পৃ. ১০৬; 'যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করবে, নর হোক কিংবা নারী, সে যদি মু'মিন অবস্থায় তা করে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের উপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।' দ্র. আল কুরআন, ৪ : ১২৪

১২১. আফজাল হোসাইন, অনূ. অধ্যাপক মোশারফ হোসাইন, *শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ*(ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৩৬

তথা ইসলাম ব্যতীত অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী। ইসলামি পরিভাষায় যাদেরকে বলা হয় 'যিম্মি নাগরিক'।[১২২] ইসলামি নীতি ও আদর্শ হচ্ছে উভয় ধরনের নাগরিক সমান নিরাপত্তা ও সাধারণ নাগরিক অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।[১২৩] ইসলামি সমাজে রাষ্ট্রীয় বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের দায়িত্ব পালন বা নেতৃত্বদানেরও সুযোগ নেই।[১২৪] রাসুল সা. বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তাদের রক্ত আমাদের (মুসলিমগণের) রক্তের ন্যায়, তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের ন্যায় এবং তাদের মান-সম্মান আমাদের মান সম্মানের ন্যায়।'[১২৫] আল্লাহতা'আলার প্রতিনিধি হয়ে এ পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে মানব জীবনের একমাত্র কর্তব্য।[১২৬] ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকগণ রাষ্ট্র ও সমাজের নিকট হতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশকিছু মৌলিক অধিকার লাভ করে থাকে।[১২৭]

আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য : ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষভাবে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলতে প্রথম পর্যায়ের নাগরিক তথা মুসলিমগণকেই বুঝানো হয়। ইসলামের আলোকে সমস্ত মৌলিক অধিকার লাভের পাশাপাশি নাগরিকগণের উপর অনেকগুলো মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। বস্তুত ইসলামি সমাজে নাগরিক অধিকার ও নাগরিক দায়িত্ব দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাষ্ট্র যেমনি নাগরিক অধিকার বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে, ঠিক তেমনি নাগরিকগণও রাষ্ট্রের কল্যাণে যাবতীয় কাজে পূর্ণ সাহায্য এবং সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবেন।[১২৮] নাগরিকগণকে হতে হবে সকল বিষয়ে সৎ, বিশ্বস্ত, সুশৃঙ্খল এবং দায়িত্ববান। ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজ গঠন ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ :

(ক) নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা : নাগরিকগণের ব্যক্তিগত সততা ও যোগ্যতা সুনাগরিক হওয়ার মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আদর্শ সমাজ এবং ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন তাহলো, কাঙ্খিত সমাজ পরিচালনায় উপযুক্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত করে নিজেকে প্রস্তুত করা। ইসলামি

---

১২২. মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*(ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ৮ম সং., ২০০৪), পৃ. ৮১; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.), অনূ. আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*(ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সং., ২০০৪), পৃ. ৩৯০

১২৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.), অনূ. আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*(ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সং., ২০০৪), পৃ. ৩৯১; সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮), খ.১৪, পৃ. ১৭০

১২৪. 'ইসলামী ব্যবস্থায় অমুসলিম নাগরিকগণকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ ও সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র দেশ রক্ষার কাজে ব্যয় নির্বাহে নিজেদের অংশ প্রদানকে তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছে।' দ্র. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.), অনূ. আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

১২৫. আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূ., *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় মুদ্রণ, ২০০২), পৃ. ১০

১২৬. ইবন খালদুনের মতে, ইসলামি জীবন ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং তদানুযায়ী সমাজ সংগঠন ও পরিচলনার নাম হচ্ছে 'খিলাফাত'। বস্তুত মানুষ একা বা সম্মিলিত কোনভাবেই সমাজ ও রাষ্ট্রের মালিক নয়; বরং প্রকৃত মালিক আল্লাহআ'আলার খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*(ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ৮ম সং., ২০০৪), পৃ. ৫৪

১২৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৯), পৃ. ৪১৭

১২৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

সমাজে নাগরিকদের যোগ্যতার প্রধানত দু'টো দিক বিবেচনা করা হয়। তার একটা হলো নৈতিকতার দিক; আর অন্যটা হলো বৈষয়িক যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতার দিক। ইসলামি সমাজে একজন নাগরিকের নৈতিক যোগ্যতা সে এমনভাবে গঠন করবে যে, কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট সে তার মস্তক অবনত করবে না, অন্য কোন বিধান সে গ্রহন করবে না। ইরশাদ হচ্ছে, 'তিনি আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা পৃথিবী ও আখিরাতে। শাসন কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।'[১২৯] কারণ, আল্লাহতা'আলা কেবলমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করার আদেশ দিয়েছেন এবং এটাকে ইমানের শর্তরূপে নির্ধারণ করেছেন।[১৩০] অন্য কারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করবে না।[১৩১] তার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই নিবেদিত এবং সে জানে আল্লাহ তার সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন।[১৩২]

অপরদিকে নাগরিককে তার বৈষয়িক যোগ্যতাও এমনভাবে অর্জন করতে হবে যেন, আল্লাহর সৃষ্টির সেরা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত খালিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন সহজতর হয়। এ জন্য নিজের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা লাভ এবং নেতৃত্ব প্রদানের প্রস্তুতি নিতে হবে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। চেষ্টা, গবেষণা ও অন্বেষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নতি-অগ্রগতির জন্য নিজেকে যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং চিন্তাধারায় সমৃদ্ধকরণ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অপরিহার্য। এক কথায়, নাগরিকগণের আত্মপ্রস্তুতি তথা ব্যক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি সমাজ উন্নয়নের প্রথম শর্ত, যেটা অর্জিত না হলে আদর্শ বা উন্নত সমাজ কল্পনাও করা যায় না। এ সকল শিক্ষার সু-নির্দেশনা সুরা আল হুজুরাতের মধ্যে আল্লাহপাক তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন। যার অনুশীলন সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সহায়ক।

(খ) রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা : রাষ্ট্র পরিচালনা ও সমাজ ব্যবস্থাপনায় নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রীয় আনুগত্য হল সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য মৌলিক অপরিহার্য বিষয়।[১৩৩] নাগরিকগণ যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য না করলে রাষ্ট্র ও সমাজের সার্বিক শৃঙ্খলাই ভেঙ্গে পড়ে। এজন্য ইসলামের বিধান হল– সমাজের প্রতিটা মুসলিম নাগরিক আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর আনুগত্য করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল সা. নির্দেশিত আইন ও বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সরকারের আনুগত্য করবে। আল্লাহপাক বলেছেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে

---

১২৯. আল কুরআন, ২৮ : ৭০; 'আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা কর, তাদের মনের খেয়ালখুশি ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ কর না।' দ্র. আল কুরআন, ৫: ৪৯; 'তারা বলে (শাসনতন্ত্রে) আমাদের এখতিয়ার কিছু আছে কি? হে রাসুল! আপনি বলুন, এখতিয়ার সবটুকুই আল্লাহর।' দ্র. আল কুরআন, ৩ : ১৫৪; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১৩০. হযরত ইমাম গাযযালী রহ., অনূ. আব্দুল খালেক, *সৌভাগ্যের পরশমণি*(ঢাকা : ইফাবা, ৭ম সং., ২০০৫), খ.৪, পৃ. ২৮২; 'তোমরা যদি মু'মিন হও তবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।' দ্র. আল কুরআন, ৫ : ৩; ৬৫ : ২৮

১৩১. 'আমরা একমাত্র তোমারই গোলামি করি, আর সাহায্য প্রার্থনা করি শুধুই তোমারই নিকট, আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নি'আমত দান করেছ।' দ্র. আল কুরআন, ১ : ৪-৭

১৩২. আল্লাহতা'আলা বলেন, 'তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের ফায়সালা করে দিবেন; তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।' দ্র. আল কুরআন, ৬০ : ৩

১৩৩. সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৬৮

যে দায়িত্বশীল বা শাসক তার আনুগত্য কর।'[১৩৪] রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যারা আমিরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল।'

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য অব্যশই নিরংকুশ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের শর্তাধীন। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার আল্লাহর অনুগত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের আনুগত্য করাও প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ফরয।[১৩৫] আর সরকার আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ বা অস্বীকার করলে তার আনুগত্য ত্যাগ এবং নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতা করে আল্লাহর অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করা ও প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ফরয।[১৩৬] ইসলাম অনুমোদিত কারণ ব্যতীত রাষ্ট্রের আনুগত্য ত্যাগ করে পৃথিবী ও পরকালে শাস্তিভোগ করার সাহস দেখানো উচিত নয়। ফলে ইসলামি সমাজে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সব ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করা তথা দেশকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়া নিজেদের উপর আল্লাহপ্রদত্ত আমানত ও দায়িত্ব মনে করেন।

(গ) দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা : নাগরিকের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও আইন মানা অত্যাবশ্যকীয়। তাই ইসলামি সমাজে জনসাধারণের জন্য আইনের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল থাকা তথা আইন পালনে অভ্যস্ত হওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সকল আইন ও বিধি-বিধান জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী সজাগ ও সচেতন থেকে সর্বাত্মকভাবে তা প্রতিপালন করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যানের জন্য, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ।'[১৩৭]

অপরদিরকে আইন বাস্তবায়নে প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। রাষ্ট্র ও সরকার জনগণের সর্বজনীন স্বার্থ, সার্বিক নিরাপত্তা, সামাজিক শৃঙ্খলা ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই আইন প্রনয়ণ ও জারি করে থাকে। এ আইন জনগণ কর্তৃক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে পালিত না হলে সমাজ ও রাষ্ট্র অর্থহীন, বিশৃঙ্খল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।[১৩৮] ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত নাগরিকগণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আইন পালনই যথেষ্ট মনে করেন না; বরং কেউ যেন আইন ভঙ্গ না করে সেদিকেও সচেতন থেকে সামাজিক এবং ইমানি দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

---

১৩৪. আল কুরআন, ৪ : ৫৯; ইমাম বুখারী, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪), খ.১০, হাদিস নং ৬৬৫২, পৃ. ৪০৫; 'আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারির তাবারি, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *তাফসীরে তাবারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৬), খ.৭, পৃ. ৩৪৮

১৩৫. 'তোমাদের মধ্যে হোক এমন একটা দল, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম।' দ্র. আল কুরআন, ৩ : ১০৪

১৩৬. হযরত আলি রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, 'গুনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে।' দ্র. ইমাম বুখারী, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪), খ.১০, হাদিস নং ৬৪১০, পৃ. ৩২৬

১৩৭. আল কুরআন, ৩ : ১০৪; 'তোমাদের যে কেউ কোন অন্যায় দেখবে সে তার হাত (শক্তি প্রয়োগ করে) দিয়ে বাঁধা দিবে। এটা ইমানের প্রাথমিক (দূর্বলতম স্তর)' দ্র. 'আল্লামা ইয্দুদ্দীন মালিক রহ., অনূ. হাফিজ মাওঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল, *মিনহাজুস সালেহীন*(ঢাকা : ইফাবা, ২য় সং, ২০০৮), খ.১, পৃ. ৪৫৩

১৩৮. 'ইসলামি সমাজে কোন আইন নাগরিকদের পছন্দ হোক বা না হোক, সহজসাধ্য হোক বা কষ্টসাধ্য হোক তা মান্য করা ও পালন করা সকলের জন্যই অপরিহার্য।' দ্র. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.), অনূ. আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*(ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সং., ২০০৪), পৃ. ২৩৯

(ঘ) সরকারের বিরোধিতায় ভারসাম্য রক্ষা করা : ইসলামের আলোকে গঠিত রাষ্ট্র সর্বাবস্থায় আল-কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক সকল আইন-কানুন প্রণয়ন ও পরিচালনা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে রাসুল সা.! যা আপনার প্রতি আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ রয়ে গেলেন।'[১৩৯] মু'আজ ইবন জাবাল রা. রাসুল সা.-এর প্রশ্নের জবাবে তাঁর সম্মুখে বলেন, 'আমি বিচার করব আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদে যা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে, তাতে পাওয়া না গেলে আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতের ভিত্তিতে, আর তাতে যদি না পাই, তাহলে আমি আমার 'রায়' দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং কোন কাজে কুণ্ঠিত হব না বা ত্রুটি করব না।' এ কল্যাণময় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারি পর্যায়ের প্রতিটা স্তরে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর নিকট দায়ি থাকবেন এরং সাধারণ জনগণের নিকট স্বচ্ছতার সাথে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। সরকার জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেললে তাকে পদচ্যুত করে অন্য আস্থাভাজন সরকার নির্বাচিত করে প্রকৃত জনপ্রতিনিধির নিকট খিলাফাতের দায়িত্ব অর্পণ করা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব।[১৪০] সরকারের বিরোধিতা, সমালোচনা, পুনঃনির্বাচনের দাবিতে প্রচারণা, বিবৃতি এবং জনমত সৃষ্টি ইত্যাদি দায়িত্ব পালন নাগরিকগণ অবশ্যই করবে। এরূপ পরিস্থিতিতে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সরকার ক্ষণস্থায়ী হলেও রাষ্ট্র স্থায়ী, সরকার কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হলেও রাষ্ট্র সকলের।[১৪১] মোটকথা, ইসলামের আলোকে সুনাগরিক গঠনের অপরিহার্য উপাদান হল, শারি'আহ সম্মত কারণে সরকারের বিরোধিতার প্রয়োজন হলে অবশ্যই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

(ঙ) রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত ও কর প্রদান : অর্থনৈতিক শক্তি ও সামর্থ ছাড়া কোন সমাজ ও রাষ্ট্রই কাঙ্খিত উন্নতি সাধন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সক্ষম নাগরিকগণ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে পারে কেবলমাত্র ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এ বিষয়ে সুবিচারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে উন্নত, সমৃদ্ধ ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের নজির পৃথিবীতে স্থাপন করেছে। ইসলামি শারি'আহ সম্পদের জন্য নির্ধারিত হারে যাকাত,[১৪২] উশর ও খারাজ ইত্যাদি প্রবর্তন করে এর ব্যয়ের খাতও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা পালন করা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত এবং একই সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। ইসলাম এ বিষয়ে কোনরূপ ফাঁকি দেয়া বা গড়িমসি করা মোটেই সমর্থন করে না; বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ

---

১৩৯. আল কুরআন, ৪ : ৬৭

১৪০. রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমাদের উপর এমন সব লোকেও শাসনকার্য চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা বৈধ ও অনেক কথাকে অবৈধ পাবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে' সে দায় মুক্ত হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে সেও বেঁচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তার আনুগত্য করবে সে পাকড়াও হবে।' দ্র. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.), অনূ. আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

১৪১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

১৪২. 'যাকাত' অর্থ– পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। নিজের অর্থ সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ, আল্লাহপাক নির্ধারিত অভাবী ও মিসকিনসহ আটটি খাতে দান করে দেয়াকে যাকাত বলে। এ কাজটাকে যাকাত এজন্য বলা হয় যে, এভাবে যাকাত দাতার অর্থ সম্পদ এবং তার নিজের আত্মা পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া অর্থ-সম্পদ থেকে আল্লাহর বান্দাদের অধিকার বের করে দেয় না, তার সম্পদ অপবিত্র থেকে যায়। আর সে সাথে তার আত্মাও থেকে যায় অপবিত্র।

হিসেবে গণ্য করে।[১৪৩] এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও আমানতদারির সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের উপর অবশ্য কর্তব্য।[১৪৪] যাকাত বা কর অস্বীকার করা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল। ইসলাম নাগরিকগণকে বিভিন্ন প্রকার দান যেমন– ফিতরা, সাদাকাহ, ওয়াকফ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে; যাতে ধনীদের অংশগ্রহণে দরিদ্ররা ধীরে ধীরে সচ্ছল হয়ে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন।

(চ) যে কোন গোপন ও দূরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকা : মত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ, স্বচ্ছ ও উন্মুক্তভাবে মতপ্রকাশ এবং বিরোধিতার ক্ষেত্রে আইন ও বিধান মেনে চলা আদর্শ সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান উপকরণ। একটা আদর্শ ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণের জন্য সরকার এবং নাগরিক পরস্পরের প্রতি অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। ইসলামি সমাজে নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল, তারা হবেন শতভাগ বিশ্বস্ত, কল্যাণকামী এবং স্বচ্ছ আচরণের অধিকারী। আর এটা একজন নাগরিকের সুনাগরিক হয়ে উঠার মাধ্যমেই সম্ভব। সরকার কোন বিষয়ে ভুল করলে বা বাড়াবাড়ি করলে নাগরিকগণ তা জনসম্মুখে তুলে ধরে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারেন।[১৪৫] তবে উক্ত ভিন্নমত অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মৌলিক ও স্থায়ী আদর্শ বা ইসলামি খিলাফাত বিরোধী হতে পারবে না। কোন অপপ্রচার, বল প্রয়োগ বা সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়া যাবে না। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না। সরকারের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য হতে হবে অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যার দিকে তিনি জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছেন। সরকার বিরোধী পক্ষের বক্তব্য প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারবে না। বিরোধী পক্ষ ও রাষ্ট্র পক্ষ সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারবেনা এবং কোন জবরদস্তিও করতে পারবে না। একটা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য ইসলামই তার অনুসারীদেরকে এরূপ শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং ইসলামি আদর্শে উজ্জীবিত একজন নাগরিকের মাধ্যমেই তা সম্ভব। কেননা, ইসলাম মানুষকে কোন কাজে বাধ্য করে না, ভাল-মন্দ, নীতি ও নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে।

(ছ) ন্যায় কাজের সাহায্য ও সমর্থন : সমাজের প্রতিটা নাগরিকের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা, পূর্ণ আন্তরিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণ করতে প্রত্যেক নাগরিককে ন্যায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হতে হবে আর অন্যায়ের মুকাবিলায় হতে হবে ঐক্যবদ্ধ ও সাহসী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সৎ ও পরহেজগারির যাবতীয় কাজে সহযোগিতা কর।'[১৪৬] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং আহ্বান করে সবরের।'[১৪৭] ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিককে হতে হবে আন্তরিক, সাহসী ও আপোষহীন। মু'মিন, মুশরিক, বন্ধু বা শত্রু, এমনকি স্বজাতি বা অন্যজাতি সকলের ব্যাপারেই ন্যায়-নীতির অনুসরণ করতে হবে একেবারেই

---

১৪৩. যাকাত আল্লাহর ইবাদাত যা অন্যান্য মৌলিক ফরয ইবাদাতের মতই এবং একই সাথে এটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। এটা চিরস্থায়ী নীতি ও নিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অধিকার কারও নেই। অপরদিকে সরকার আরোপিত কর কোন অবস্থাতেই যাকাতের মর্যাদা লাভ করতে পারে না সত্য; কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও উন্নতির এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ বিষয়েও কোন ধরনের গড়িমসি বা ফাঁকি-ঝুঁকি ইসলাম সমর্থন করে না।

১৪৪. আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় সং., ২০০২), পৃ. ২৮৪

১৪৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

১৪৬. আল কুরআন, ৫ : ২

১৪৭. আল কুরআন, ১০৩ : ১

সমতার ভিত্তিতে। ইসলামি নীতি মানুষের গোত্রীয়, বংশীয়, ধার্মিকতার গোঁড়ামি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে এক উদার, গণমুখী ও সর্বজনীন সামাজিক সাম্য বিশ্বমানবতার সামনে পেশ করেছে। যা চন্দ্র বিজয়ের এ যুগেও পাশ্চাত্য সভ্যতা কল্পনা পর্যন্ত করতে অক্ষম।[১৪৮]

(জ) সঠিক নেতা বা নেতৃত্ব নির্বাচন : কোন সমাজ বা জাতিকে উন্নতি ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য সুনাগরিক তথা সৎ, যোগ্য, দক্ষ, আমানতদার ও ইমানদার নেতা[১৪৯] নির্বাচিত করা নাগরিকদের জন্য অপরিহার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আমানত আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যক্তির উপর সমর্পণ। বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী নির্বাচনের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহল ভোটাধিকার প্রয়োগ।[১৫০] ইসলামে রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী তথা নারী বা পুরুষ, বৃদ্ধ বা যুবক, পথিক বা নিজ বাড়িতে উপস্থিত সকলেরই ভোটাধিকার রয়েছে। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থাই প্রকৃত গণ-অধিকারের প্রতীক, এখানে প্রাপ্ত বয়স্ক ও চেতনাশীল প্রতিটা মানুষই আল্লাহর খালিফা বা প্রতিনিধি। দূর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, ওয়াদা ভঙ্গকারী, সন্ত্রাসবাদী, ভীতু বা দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম এমন ব্যক্তিকে কোনভাবেই নেতা নির্বাচন করা যাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসিহত কবুল করে থাকে।'[১৫১] যিনি হবেন আল্লাহর খিলাফাতে পরিপূর্ণ আস্থাশীল, আল্লাহপাক আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছ এবং সৎকর্ম করেছ, তাদের সাথে আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা করবেন, যেমন তিনি খলিফা করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে।'[১৫২] যিনি সমাজের কল্যাণ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখেন, যিনি সত্যাশ্রয়ী এবং আমানতদারির মানদণ্ডে শতভাগ উত্তীর্ণ, তিনিই নেতা হওয়ার যোগ্য। যিনি সাহসী, ধৈর্যশীল, ইবাদাতকারী ও ন্যায়নিষ্ঠ কেবলমাত্র তিনিই নেতা বা দায়িত্বশীল হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। এ ব্যাপারে নাগরিকগণ অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিলে সমাজ পাপ-পঙ্কিলতা, দূর্নীতি, চাঁদাবাজি ও অন্যায়-অনাচারে ভরে যাবে। সার্বিক অবক্ষয় সমাজকে অশান্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে ফেলবে। সুতরাং সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বই পারে সমাজকে আধুনিক,

---

১৪৮. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, অনূ. মাওলানা কেরামত আলী নিয়ামী, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*(ঢাকা : ইসলামীয়া কুরআন মহল, ৪র্থ সং., ২০০২), পৃ. ১২০

১৪৯. 'নেতা' ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে- Leader; guide; conducto; headman; chief commander; pioneer. দ্র. মোহাম্মদ আলী ও অন্যান্য, *বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশোনারি*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৩তম সং., ২০০৭), পৃ. ৩৮৪; শব্দটা (Lead) শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ, to show the way by going first, প্রথমে অগ্রসর হয়ে পথ দেখানো; to act first, প্রথমে করা; direction, পরিচালনা; chief role, প্রধান ভূমিকা; initiative, স্বতঃপ্রণোদিত প্রথম উদ্যম; to act asa leaderof or take the lead, নেতৃত্ব গ্রহণ করা, আদর্শ স্থাপন করা'। দ্র. জুলিয়া এলিয়ট, *সংসদ ইংলিশ-বেঙ্গালি ডিকশোনারি* (কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ১৫তম সং., মার্চ ২০০৭), পৃ. ৬১৬; বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় নেতা বলতে, জনপ্রতিনিধি ও আইন পরিষদের সদস্য বুঝায়।

১৫০. ভোট (Vote): 'ভোট' শব্দের শাব্দিক অর্থ হল, মত প্রদান করা, সমর্থন করা, সমর্থন প্রত্যাহার করা পছন্দ বা অপছন্দের কথা প্রকাশ করা বা এক কথায় কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি সমর্থন জানানোকে ভোট বলে। দ্র. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৯), পৃ. ৫০৭; যুলিয়া এলিয়ট ও অন্যান্য, *অক্সফোর্ড ডিকসনারি*-৩(নিউইয়র্ক : ২০০৯), পৃ. ৮৬৮; অনুমোদিত বা বিধিসম্মত উপায়ে ইচ্ছা বা মত প্রকাশ, ভোট প্রদান, মত প্রদান। দ্র. *সংসদ ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকসনারি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮০

১৫১. আল কুরআন, ৩৯ : ৯; আল্লাহ বলেন, 'পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী লোক তারা বলে আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি, এ সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে। আর সত্য কথা হল এটা যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে।' দ্র. আল কুরআন, ৩ : ৭

১৫২. আল কুরআন, ২৪ : ৫৫

আদর্শ ও উন্নত করতে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল সা. ও তোমাদের উপর ন্যস্ত আমানতের খিয়ানত কর না, অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জান।'[১৫৩]

(ঝ) রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে জিহাদে অংশগ্রহণ : রাষ্ট্র বা সমাজ কখনও বহিঃশত্রুর আক্রমনের কবলে পড়লে অথবা কোন পক্ষের কারণে রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লে, অথবা কোন বিশেষ গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিমগণ নির্যাতিত বা নিপীড়িত হলে মুসলিমগণকে অবশ্যই সর্বাত্নক জিহাদে[১৫৪] অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা বিধানে জিহাদের কোন বিকল্প নেই এবং এতে কোন অবহেলার সুযোগও নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জিহাদ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, আর তা যদিও তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হচ্ছে, অথচ এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।'[১৫৫] জিহাদের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ (যুদ্ধ হচ্ছে জিহাদের চূড়ান্ত রূপ) করছ না? অথচ দূর্বল-অক্ষম, নারী-পুরুষ আর শিশুরা চৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম সম্প্রদায়ের এ জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নাও। আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক প্রেরণ কর এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।'[১৫৬] সুতরাং জিহাদ ইসলামি সমাজের নিরাপত্তার প্রধান শর্ত এবং প্রত্যেক সুস্থ্য নাগরিকের উপর অবশ্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ কুতুব শহিদ বলেন, 'অসহায় নারী, শিশু আর বৃদ্ধ যারা আত্নরক্ষায় বিশেষত নিজ নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস রক্ষায় অসমর্থ তাদের যাবতীয় নিরাপত্তা বিধান এবং সর্বত্র আল্লাহর আইন ও বিধান মুতাবিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মু'মিনগণের জন্য জিহাদের প্রেরণা।'[১৫৭] ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পদ লাভ, আধিপত্য বিস্তার বা জাতিগত গৌরবের কারণে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বা সন্ত্রাসের স্থান নেই।

(ঞ) নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর বিষয় হতে বিরত থাকা : সুনাগরিক হতে প্রত্যাশী প্রত্যেক নাগরিককে অবশ্যই কবিরা গুনাহ তথা নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সমাজ থেকে উক্ত ক্ষতিকর কার্যাবলি দূরীকরণে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সকল ধরনের কলুষমুক্ত রাখা উন্নত সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট না করা ও যিনা-ব্যভিচারের মত জঘণ্য পাপাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। সুদের কারবার থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ সুদ জঘণ্য সামাজিক অবিচার ও যুলুম, এটা অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, মনুষ্যত্বকে গলাটিপে হত্যা করে এবং শোষিতের অন্তরে দ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত করে সমাজে এক মহাসংকট তৈরি করে। প্রত্যেককে মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর

---

১৫৩. আল কুরআন, ৫৯ : ১৮

১৫৪. আল কুরআন, ৪ : ৭৫; 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর এবং যুদ্ধাপযোগী ঘোড়া সর্বদা প্রস্তুত রাখ যাতে আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের শংকিত ও সন্ত্রস্ত রাখতে পার।' দ্র. আল কুরআন, ৮ : ৬০; জিহাদ অর্থ– ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, যুদ্ধ, প্রচেষ্টা, সাধনা, চূড়ান্ত চেষ্টা, যথাসাধ্য সাধনা ইত্যাদি। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৩য় সং., ২০০৬), পৃ. ৩১৫; জিহাদ, সংগ্রাম, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম, দ্র. 'বল তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা..' দ্র. আল কুরআন, ৯ : ২৪; গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত, *আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬), খ.১, পৃ. ৭৬০

১৫৫. আল কুরআন, ২ : ২১৬

১৫৬. আল কুরআন, ২ : ২১৬

১৫৭. আহসান হাবীব, *হযরত আলির (রা.) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৩), পৃ. ১৫৭

অভিশাপ।'[১৫৮] রাসুল সা. বলেন, 'মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর সাথে শিরক সমতুল্য অপরাধ। একথাটা তিনি তিনবার বলেছেন।'[১৫৯] আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'মিথ্যা তারাই বলে, যারা আল্লাহর আয়াতে ইমান রাখে না।'[১৬০] মহানবী সা. বলেছেন, 'তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।'[১৬১] আল্লাহপাক বলেছেন, 'বরং যারা কুফরি করে, তারাই মিথ্যা বলে।'[১৬২] আল্লাহর সাথে শিরক করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা শপথ করা, ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, মিথ্যা দাবি করা, নবী কারিম সা.-এর উপর মিথ্যারোপ করা, কাউকে বিদ্রুপ করা, অশ্লীল কথা বলা, ফাসিকের প্রশংসা করা এবং যে অভিশাপের উপযুক্ত নয়, তাকে অভিশাপ দেয়া এ সবই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।[১৬৩]

নাগরিকগণকে চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাই এবং ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকতে হবে। রাসুল সা. ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন।[১৬৪] ঘুষ গ্রহীতা কেবলমাত্র নিজে কিছু অতিরিক্ত পাওয়ার জন্য সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। আর মানুষের কিছু অংশ জেনে শুনে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের সামনে ঘুষ পেশ কর না।'[১৬৫] রাসুল সা. বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটা; যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, সে অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে আর তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হলে সে তা খিয়ানত করে।[১৬৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার যারা ইমান গ্রহণ করেছ শোন; তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং তোমাদের পরস্পর গচ্ছিত দ্রব্যেও খিয়ানত কর না।[১৬৭] প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসুল সা. বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! ঐ ব্যক্তির ইমান নেই? প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসুলুল্লাহ সা.! কার ইমান নেই? তিনি বলেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়।'[১৬৮] আল্লাহপাক বলেন, 'তোমরা সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আহলে কিতাবগণের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে না।'[১৬৯]

---

১৫৮. আল কুরআন, ৩ : ৬১

১৫৯. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮৯০২; আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৫৬০

১৬০. আল কুরআন, ১৬ : ১০৫; ৮৪ : ২২

১৬১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৪৫২; মহানবী সা. বলেন, 'সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।' তিনি আরও বলেন, 'যখন কোন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন তার দূর্গন্ধের কারণে ফিরিশতারা পর্যন্ত তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।'

১৬২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*(ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৮ম সং., ২০০৭), খ.৪, পৃ. ২২

১৬৩. আল কুরআন, ২২ : ৩০

১৬৪. আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানিপথি রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *তাফসীরে মাযহারী*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৮), খ.৩, পৃ. ৩০৪

১৬৫. আল কুরআন, ৭ : ২৬

১৬৬. ইমাম হাফিজ শামসুদ্দিন যাহাবী রহ., অনূ. আবু সাদেক মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, *কিতাবুল কাবায়ের*(ঢাকা : ইফাবা, ২য় মুদ্রণ, ২০০৫), পৃ. ২৬৪

১৬৭. আল কুরআন, ৭ : ৩৬

১৬৮. সাইয়িদ কুতুব শহিদ, অনূ. হাফেজ মুনীর উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৫২; মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.), অনূ. সম্পদনা পরিষদ, *তাফসীরে উসমানী*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪), খ.৪, পৃ. ৪১০

১৬৯. আল কুরআন, ২৯ : ৪৬

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলাম নাগরিকগণকে তাদের উপর অর্পিত সমস্ত ইতিবাচক আচার আচারণ অপরিহার্য করে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি; বরং সার্বিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফলপ্রসূ অনুশীলনেও অভ্যস্ত করে দিয়েছে। ফলে একটা আদর্শ সমাজকাঠামো বিনির্মাণে ইসলামের প্রকৃত অনুসারীগণ সর্বাবস্থায় সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম সমাজের প্রত্যেক নাগরিক আত্মশুদ্ধি ও আত্মসমালোচনা এবং ব্যক্তিগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি ইসলামি নীতি ও আদর্শ মুতাবিক সমাজের প্রত্যেকটা বিষয়ে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করেন। আলোচ্য সুরা আল-হুজুরাতের সামাজিক বিধি-বিধান ও নির্দেশনা পালন একজন সাধারণ নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে বাস্তবতার নিরিখে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সুনাগরিকের সম্মিলিত শক্তি, সামর্থ ও প্রচেষ্টাতেই একটা উন্নত ও আদর্শ সমাজ কাঠামো বিনির্মাণ করা সম্ভব। সুরা আল-হুজুরাতের সমুদয় বিধি-বিধান নাগরিক জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠা তাই সম্ভব ও বাস্তবসম্মত বলে মনে করা যেতে পারে।

উপসংহার

উপসংহার

বাংলাদেশ একটা অতি প্রাচীন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল থেকে এখানে ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে একই সমাজে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হয় যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ধর্মপরায়ণ ও সহজ-সরল স্বভাবের। ক্ষেত্রবিশেষ এর দু'একটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলেও সামগ্রিক চিত্র প্রায় এক ও অভিন্ন। সমাজব্যবস্থা প্রতিনিয়ত আধুনিক হলেও অধিকাংশ মানুষ গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে বসবাস করে বিধায় গ্রামের সহজ-সরল প্রকৃতির বন্ধনে তারা বেড়ে উঠে। তার সামগ্রিক গতি-প্রকৃতি সহজ-সরল, অনাড়ম্বর, অহিংস, অসাম্প্রদায়িক, পরধর্মসহিষ্ণু ও ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে প্রস্তুত হয়। পবিত্র কুরআনের সুরা আল হুজুরাত মহান আল্লাহপাকের সামাজিক বিধি-বিধান সম্বলিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সুরা। যার প্রতিটা নির্দেশনা একজন নাগরিকের সুনাগরিক হিসেবে সমাজে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বসবাসের একান্ত নিয়ামক। যার সুষ্ঠু প্রতিপালন একজন সাধারণ নাগরিককে যেমন ইমানের বলে বলিয়ান করে সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, ঠিক তেমনি সমাজে তার অধিকার আদায় ও ভোগ করার পাশাপাশি অপরের অধিকার পালন ও প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে। সুরা আল-হুজুরাতের আলোকে প্রত্যেক নাগরিক যেন নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং সে অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

'তোমরাই (পৃথিবীর) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে, তোমরা সব মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।'[১৭০] এটাই ইসলামের সুস্পষ্ট ও সামগ্রিক বিধান।

আলোচ্য সুরা আল-হুজুরাতের সামগ্রিক বিধি বিধান পালনের মাধ্যমেই তার বাস্তবে রূপদান সম্ভব। তাই আদর্শ সমাজ গঠন করার জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামি নীতি-আদর্শ মুতাবিক জীবন-যাপন পদ্ধতি ও সমাজ গঠন বিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষাবিদগণ, ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ আলিমগণ এবং দেশের প্রবীণ নাগরিকগণের যেমনি এগিয়ে আসা দরকার তেমনি রাষ্ট্র এবং সরকারকেও আন্তরিকভাবে সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। একজন নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে তখনই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে যখন সে কুরআনের আদর্শে উজ্জীবিত হবে। বিশেষ করে যদি কেউ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সুরা আল-হুজুরাতের নির্দেশাবলি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে তবে সে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচনে অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিবে না; বরং ক্ষেত্র বিশেষ সে নিজে নেতৃত্ব দিতে তৈরি থাকবে। আদর্শ ও উন্নত সমাজ

---

১৭০. আল কুরআন, ৩ : ১১০

বিনির্মাণের জন্য ইসলামের আলোকে সুনাগরিকগণের চিন্তা, চেতনা ও অভ্যাস গঠন এবং সে আলোকে সামাজিক বিন্যাস বর্তমান আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্বব্যবস্থায় আরও বেশি অপরিহার্য। ব্যক্তি নিজে অথবা সঠিক নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারে। আর মানুষের কল্যাণ সাধন করার পুরষ্কার ও সুসংবাদ আল্লাহপাক দিয়েছেন এভাবে,

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهٰرُ.

'যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (হে নবী!) আপনি তাদের সুসংবাদ দিন জান্নাতের।'[১৭১] যেমনটা সুনাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে একজন নাগরিকের নিকট থেকে রাষ্ট্র প্রত্যাশা করে। যেটা আলোচ্য সুরার নির্দেশিত শিক্ষা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুনাগরিক গঠনে সুরা আল-হুজুরাতের শিক্ষা সামগ্রিকভাবে প্রতিটা নাগরিকের জন্য সময়োপযোগী ও অনস্বীকার্য, আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ বলে আশা করা যায়। একটা সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনের জন্য অবশ্যই কুরআনের শিক্ষার বিকল্প অনুসন্ধান করা অনভিপ্রেত ও সময়ের অপচয় মাত্র।

ইসলামি শারি'আতের মূল চারটা উৎসের মধ্যে প্রধান উৎস হল দু'টো। একটা কুরআনুল কারিম অপরটা রাসুলুল্লাহ সা.-এর হাদিস তথা সুন্নাহ। এ দু'টো বিষয় পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলার ঐশী বাণী। এটা হল মৌলিক নীতিমালা, আর রাসুল সা.-এর হাদিস হল তার ব্যাখ্যাদাতা। কুরআনুল কারিমের সার্বিক নীতিমালা বাস্তবে রূপায়ন করে নবী কারিম সা. দেখিয়েছেন কত সুন্দর, সুশৃঙ্খল, নিয়মানুবর্তী, মার্জিত ও আনুগত্যকারী মহৎ জীবন গঠন সম্ভব। পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করে তিনি প্রমাণ করেছেন শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করেই মানুষকে নিয়ম পালনে বাধ্য করা যায় না। কুরআনের আলোয় উদ্ভাসিত বিবেকের দংশন দ্বারা তাকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের ভয়াবহ শাস্তির এ আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণই মানুষকে মহৎ মানুষে পরিণত করতে পারে। আর একমাত্র ইসলামের মূলমন্ত্র দ্বারাই তা সম্ভব। ইসলাম নির্দেশিত শান্তি সংস্থাপন সর্বাত্মক, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। শান্তি হল ইসলামের মর্মবাণী, শান্তি ইসলামের তাৎপর্য। এ শান্তি হল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, মানুষের প্রতি পরম প্রীতি, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধ, ইতর প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সদাচরণ। বস্তুত ইসলাম সর্বব্যাপী শান্তির ধর্ম। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবিব রাসুলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে তাঁর মনোনীত জীবনব্যবস্থার পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। আল্লাহপাক বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের ধর্মব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।'[১৭২] তাই মহানবী সা. পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়িম করেছিলেন আইয়ামে জাহিলিয়াতের সে মানুষগুলোকে দিয়ে, যারা ঐশী নুরের

১৭১. আল কুরআন, ২ : ২৫
১৭২. আল কুরআন, ৫ : ৩

আলোকে পরিশুদ্ধ হয়ে নিজেরা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। যারা হয়েছিলেন গ্রহ-নক্ষত্র, ও মণি-মুক্তার মত স্বমহিমায় চিরভাস্কর। একজন মানুষ বা নাগরিক রাষ্ট্রে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার মূলমন্ত্রই হল আল্লাহর কুরআন ও রাসুল সা.-এর হাদিসের অনুশীলন। কুরআনের নীতিমালা ও রাসুল সা.-এর অনুশাসন দ্বারা সুষ্ঠু-সুন্দর জীবন পরিচালনা করে পরিশীলিত ও সুশৃঙ্খল জীবন গঠন করা সম্ভব। কারণ, পৃথিবীতে আল্লাহর অনুগত বান্দা ও খলিফা হিসেবে যার যার অবস্থানে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের সুশিক্ষা থেকে বিমূখ হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে আজ চরম নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে। মানুষে মানুষে ভালবাসা আর মমত্ববোধ হারিয়ে কলুষিত ও অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। হাহাকার, মারামারি-হানাহানি, খুন, সন্ত্রাস, প্রবঞ্চনা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, কুৎসা রটনা করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, মন্দ নামে আহ্বান করা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত থাকা, নেতাকে সম্মান না করা ও মিথ্যার ব্যাপক প্রসার ইত্যাদি নিন্দনীয় ও অবশ্য পরিত্যাজ্য চরিত্রগুলো সমাজের সর্বত্র আজ পরিব্যপ্ত হওয়ায় নাগরিকগণ দারুণভাবে হতাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বন্যা যেমন নদীর দু'কুল ছাপিয়ে নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে সর্বত্র প্লাবিত করে দেয়; যার ফলে মানুষের ঘর-বাড়ি, গাছপালা ধ্বংস করে তাদেরকে রিক্ত ও নিঃস্ব করে ফেলে। ঠিক তেমনি উল্লিখিত নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য গুণাবলি মানুষের নৈতিক ও মানসিক ঐশ্বর্য বিনাশ করে তাদেরকে রিক্ত ও নিঃস্ব করে দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে নাগরিকদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সুনাগরিক হওয়ার জন্য মুক্তির রাজপথ ঐশী বাণী আল কুরআন ও রাসুল সা.-এর আদর্শের নিচে অবনত মস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তাই **সুনাগরিক গঠনে সূরা আল হুজুরাত-এর প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা কর্ম গ্রহণ ও সম্পন্ন করে কুরআনের সুরা আল হুজুরাতের নির্দেশনার আলোকে নাগরিক জীবন বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি এ গবেষণার ফসল থেকে ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক সর্বোপরি সকল শ্রেণি ও পেশার নাগরিকগণ সামান্যতম হলেও উপকৃত হন তবেই এ পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

১. মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কোরআন*, ঢাকা : আল বালাগ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬

২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী, ২০১১

৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনূ. মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব/ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, *তাফহীমুল কুরআন*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২

৪. কাজি নাসির উদ্দিন বায়জাভি, *আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল*, দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৯৫

৫. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ., অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, মদিনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

৬. মাওলানা শিব্বির আহম্মদ ওসমানী, অনূ. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, *তাফসীরে ওসমানী*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৬

৭. আল্লামা আলুসি, *রুহুল মা'আনি*, বৈরুত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি, তা.বি.

৮. সানাউল্লাহ পানিপথী, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *তাফসীরে মাযহারী*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০২

৯. আশরাফ আলী থানভী, অনূ. সম্পাদনা বিভাগ, *তাফসীরে আশরাফী*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬

১০. হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দীন ইবন কাসীর রহ., অনূ. ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, ঢাকা : হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ২০১০

১১. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারি, *আল-জামি আস-সহিহ আল বুখারি*, দামেশক : দার ইবন কাছির, ১৯৮৭

১২. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহিহ মুসলিম*, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৯৮৫

১৩. আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা ইবন সুবাহ, *সুনানুত তিরমিযি*, রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ দুওয়ালিয়া, ১৯৯৯

১৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, মিসর : দারুল হাদিস, ১৯৯৫

১৫. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, অনূ. ড. রশীদুল আলম, *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম*, ঢাকা : আয়েশা কিতাব ঘর, জুলাই, ২০০২

১৬. এ.কে.এম শওকত আলী খান, মো: ওবায়দুর রহমান, *অপরাধ বিজ্ঞান*, ঢাকা : গ্রন্থ কুটির, জুন, ২০০৯

১৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনূ. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক রুপরেখা*, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, নভেম্বর, ১৯৯২

১৮. মোঃ আবদুল ওদুদ, *ধর্ম দর্শন*, ঢাকা : মনন পাবলিকেশন, মার্চ, ২০০৭

১৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫

২০. আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮০

২১. হাসান আইউব, অনূ. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪

২২. সাইয়েদ কুতুব, অনূ. আকরাম ফারুক, *ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি*, ঢাকা : স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০০

২৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭

২৪. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫

২৫. সাইয়েদ কুতুব, *ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১

২৬. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬

২৭. আবূ সলীম মুহাম্মদ হাই, *রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা : নাকীব পাবলিকেশন্স, ২০০১

২৮. শামসুল হক, *বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪

২৯. ড. মোঃ মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রুপরেখা*, রাজশাহী : বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯৯৬

৩০. মাওলানা আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪

৩১. মাওলানা আবদুর রহীম, *আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫

৩২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪

৩৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা*, ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিচার্স একাডেমী, ১৯৯৪

৩৪. আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭

৩৫. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *আল-কাওসার*, ঢাকা : মদীনা পবলিকেশন্স, ১৯৮৯

৩৬. গবেষণা বিভাগ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০১

৩৭. ড. মারওয়ান ইবরাহিম আল-কাইমি, অনূ. শেখ এনামুল হক, *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ ইসলামী আদবের দিকনির্দেশনা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০

৩৮. শামছুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬

৩৯. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : কবির পাবলিকেশন্স, ২০১০

৪০. মাওলানা আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭

৪১. আবদুল গণি, *কল্যান সমাজ ও অকল্যান সমাজ*, ঢাকা : মাসিক মদীনা, বর্ষ-৩৭, সংখ্যা-২, মে ২০০১

৪২. আল্লামা ইউছুফ ইসলাহী, *আদাবে জিন্দেগী*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭

৪৩. ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, *আল্লামা ইউসূফ বিননূরী রহ. : ইলমুল হাদীসে তাঁর অবদান*, ঢাকা : এইমস ডিজাইন ওয়ার্ল্ড, জানুয়ারি ২০১৩

৪৪. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, বর্ষ-১৬, সংখ্যা-১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

৪৫. ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী ও মোঃ মফিজ উদ্দীন, *মদীনার সনদ : পর্যালোচনা*, ঢাকা : ইফাবা পত্রিকা, বর্ষ-৩৬, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৭

৪৬. আব্দুল খালেক জোয়ারদার, *বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও ইসলাম* ঢাকা : মাসিক মদিনা, বর্ষ-৩৪, সংখ্যা-৮, নভেম্বর ১৯৯৮

৪৭. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯২

৪৮. মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী, *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩

৪৯. আবু তাহের মেসবাহ, *আল মানার*, ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০

৫০. আহমদ শরীফ, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬

৫১. হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯২

৫২. অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *কুরআনের আয়নায় বিম্বিত রসূল (স:)*, চট্রগ্রাম : কামরুল প্রকাশনী, ১৯৯৮

৫৩. আবু রিফাত *মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভ্রাতৃত্ববোধ* ঢাকা : মাসিক মদিনা, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, বর্ষ-৩৬, সংখ্যা-৩, জুন ২০০০

৫৪. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, *জীবন সৌন্দর্য*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫

৫৫. অধ্যক্ষ আবদুর রজ্জাক, *ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭

৫৬. মুহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, *মহাগন্থ আল কুরআন : অনুবাদ ও তাফসীর*, ঢাকা : মাসিক মদিনা, বর্ষ-৩৮, সংখ্যা-৭, অক্টোবর ২০০২

৫৭. আবু বকর ইবন আরাবী, *আহকামুল কোরআন*, বৈরুত : ৫৩৪ হি.

৫৮. মোল্লা আলী কারী, *শাহরুল ফিকহিল আকবর*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবি

৫৯. আল্লামা জামাল আল বাদাবি, অনূ. আবু খালদুন আল মাহমুদ ও শারমিন ইসলাম, *ইসলামের সামাজিক বিধান*, ঢাকা : প্রকাশ, ১৯৯৯

৬০. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫

৬১. মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯২

৬২. ইমাম আয যাহাবি রহ., অনূ. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, *কুরআন সুন্নাহর আলোকে গীবত*, চট্রগ্রাম : শাহ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমী, ২০০৮

৬৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯০

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০

৬৫. শাইখ লিয়াকত আলী সবুর, অনূ. ইকবাল হোসাইন মাসুম, *ইসলাম অনন্য জীবন দর্শন*, ২০১০

৬৬. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০২

৬৭. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, *তাফসীরে ইবন আব্বাস*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪

৬৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনূ. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০২

৬৯. ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *আল কুরআন ও সুন্নার আলোকে মানুষ ও সৃষ্টির সেবা*, ঢাকা : পপুলার লাইব্রেরী, ২০০২

৭০. শায়খ লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর, *ইসলাম অনন্য জীবনদর্শন*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০

৭১. বেগম আয়েশা বাওয়ানী, *ইসলাম, ১ম ও চূড়ান্ত ধর্ম*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪

৭২. সাইয়েদ কুতুব, *ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার*, ঢাকা : শিরিন পাবলিকেশন্স, ২০০১

৭৩. আলাউদ্দিন খান, *রাষ্ট্র ও খিলাফত*, ঢাকা : মাসরো প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, ১৯৯৫

৭৪. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী, *পবিত্র কোরআনের সারকথা*, ঢাকা : এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারী প্রেস, ২০১৪

৭৫. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, অনূ. আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী, *নবীয়ে রহমত স.*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭

৭৬. মোনায়েম সরকার, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জীবন ও রাজনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮

৭৭. মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাশেম গাজী, *বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদিস সংকলন-১*, ঢাকা : পিস পাবলিকেশন্স, ২০১১

৭৮. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জাকারিয়া, *আল কোরআনের বিষয় ভিত্তিক অভিধান*, ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ২০১০

৭৯. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১১

৮০. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০২

৮১. ড. এ. কে.এম. শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : গ্রন্থ কুঠির, ২০১৪

৮২. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭

৮৩. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, *আওয়ামী লীগ : পাকিস্তান সমর্থক থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগঠনকে রূপান্তর*, ২৪ পরগণা : উদার আকাশ, ২০১৩

৮৪. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স

৮৫. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা : ১৯৯৫

৮৬. ড. হারুন-অর-রশিদ ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন ইতিহাসে ও উত্তর প্রভাব*, ঢাকা

৮৭. মোঃ মকসুদুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৫

৮৮. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড*, ঢাকা : চারুলিপি প্রকাশনী, ২০১০

৮৯. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনূ. মাওলানা কেরামত আলী নিয়ামী, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, ঢাকা : ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০২

৯০. প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, *অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ১৯৯৭

৯১. 'আল্লামা ইয্দুদ্দীন বালিক রহ., অনূ. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, *মিনহাজুস সালেহীন*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮

92. Syed Sharifuddin Pirzada (ed.), *Foundation of Pakistan : All India Muslim League Documents*, 1906-1947

93. Raunaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, New York : Columbia University Press, 1972

94. Allama Muhammad Ridha Al-Muzaffar *Doctrine of the Right of Brotherhood Between Muslim,* lran : Mahjubah, March 2001

95. Thomas Lecmann, *The Problem of Religion in modern socity*

96. Gisbert, *Fundamentals of Sociology*, London : 1960

97. G.W.Chowdhury, *Islam and the contemporary world*, Dhaka : Academic Publishers, 1991

98. W.G.East, *The Geography Behind History*, London : 1965

99. O.H. Spate. A. T. A. Learmonth & B. H. Farmer, *India, Pakistan and Ceylon, The Regions,* London : 1972

100. *Journal of the Asiatic Society of Bangal* (J A S B), 1913

101. J. H. Ryley (ed). *Ralph Fitch*, London : 1899
102. J. Rennel, *Memoirs of a Map of Hindoostan*, London : 1783
103. H. S. Jarrett, *Ain-i-Akbari*, revised by J. N. Sarkar, Calcutta : 1948-1949
104. Sir Jadunath Sarkar, *Commemoration Volume,* Hasiarpur : Punjab University, 1959
105. S. M. Ali, *The Geography of the Puranas*, New Delhi : 1966
106. M. Harunur Rashid, `Bangladesh-A Profile in the light of Recent Archaeological Discoveries, *Bangladesh Historical Studies*, Dhaka : 1978
107. R. C. Majumdar (ed), *History of Ben*gal, (HB-I), vol. I, Dacca : 1943
108. Zillur Rahman Siddiqui, *English-Bangali Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 1st ed., August 1993
109. George H. Sabine, *A History of Political Theory*, New Delhi : Oxford and IBH Publishing, 1973
110. Alan Ball, *Modern Political and Governmen*t, London : Macmillan Press, 1977
111. Talukder Moniruzzaman, *Group Interests and Political Changes*, New Delhi : 1982